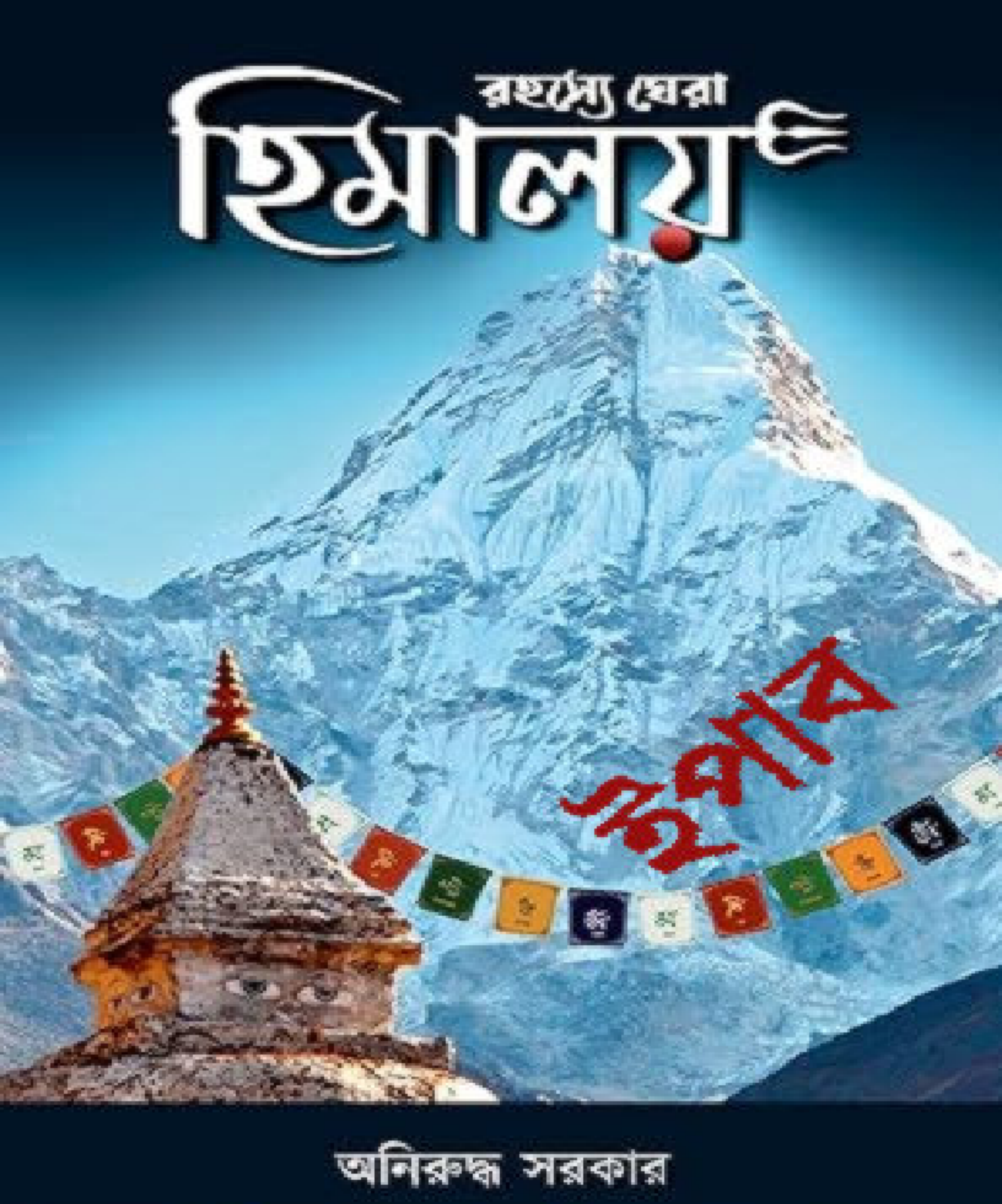
রহস্যে ঘেরা
হিমালয়
২ পর্ব
অনিরুদ্ধ সরকার

রহস্যে ঘেরা হিমালয়

অনিরুদ্ধ সরকার

অনিরুদ্ধ সরকারের জন্ম ২৫ আগস্ট, ১৯৮৭ সালে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেন। পরে সাংবাদিকতা এবং সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। অ্যাকাডেমিক শিক্ষাকে নিয়ে যেমন খুব একটা মাথা ঘামান না, তেমনি নিয়ম মাফিক চাকরিকেও খুব একটা পাত্তা দেন না। বিশ্বাস করেন, ঠাণ্ডা ঘরে বসে মানুষের কথা লেখা যায় না। প্রথাগত নিয়ম ভেঙে বরাবরই অন্য ভ্রমণে আগ্রহী। ভালোবাসেন ডকুমেন্টারি বানাতে, বই পড়তে, ছবি-আঁকতে, আড্ডা দিতে এবং দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে।
সাহিত্যজগতে প্রবেশ আনন্দবাজার পত্রিকার শনিবারের পাতা ও রবিবাসরীয় হাত ধরে। ব্লগ লেখেন টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার 'এই সময়' ব্লগে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'কেদার থেকে বেঁচে' বইটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এছাড়া 'বীর বৈরাগ্য কথা', 'এবং কলিকাতা', 'দেশ বিদেশের গুপ্তধন', 'সেই সব বাঙালিরা' পাঠক মহলে সমাদৃত। লেখকের তথ্যসমৃদ্ধ দু'খানি ভ্রমন কাহিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। লেখক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত।

পঞ্চকেদার, জ্ঞানগঞ্জ, মহাবতার বাবাজি, ওম মণিপদ্মে হুম্, অঘোরী, মাউন্ট এভারেস্ট, ইয়েতি, শেরপাদের গ্রাম খমজুং, পাগলা মধু, মিশন নন্দাদেবী, আলেকজাণ্ডারের বংশধরদের গ্রাম মানালা, রূপকুণ্ডর কঙ্কাল হ্রদ, মহাভারতের স্বর্গের সিঁড়ি, বারাণাবত, চুম্বক পাহাড় –হিমালয়ে একদশক ধরে এই সবেরই খোঁজ করেছেন লেখক।

আমার কাছে ‘মা’ হিমালয়ের সমান

হিমালয় ও কিছু কথা...

হিমালয়। ধ্যানমগ্ন মহাদেব। ২০১৩ কেদার বিপর্যয়ের পর আমার জীবনে দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল হিমালয় ও শিবকে আরও গভীর ভাবে জানা। এক নিরন্তর অনুসন্ধান করা। দীর্ঘ একযুগেরও বেশি সময়ের গবেষণার ফসল—"রহস্যে ঘেরা হিমালয়"। হিমালয় মানেই শিব আর এই 'শিব' জগতের সব কিছুর আধার। 'সব' থেকে 'শব' অবধি 'সব কিছুতেই শিব' বিরাজমান। 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে অসাধ্য সাধন হয়। শিব মানেই ধ্যানমগ্ন হিমালয়। আর হিমালয় মানে এক অদ্ভুত রহস্যের হাতছানি।

আমার ঠাকুরদা ইংরেজ আমলে রেলে চাকরি করতেন। চাকরির সুবাদে এদিক-সেদিক যেতে হত। একবার হিমালয়ের এক সাধু ঠাকুরদাকে একমাসের জন্য সঙ্গে নিয়ে যান এবং হিমালয় দর্শন করান। যোগ শেখান। ঠাকুরদা ফিরে আসেন। খুব সম্ভবত ঠাকুরদা জ্ঞানগঞ্জ গেছিলেন। মহাবতার বাবাজির দর্শনও পেয়েছিলেন। তখন শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জমানা। ঠাকুরদা নিজের ঘরে বসে সেই যোগসাধনা করতেন। দাদু একবার ভুলবশত ঘরে প্রবেশ করে চমকে যান ও দেখেন ঠাকুরদা মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে 'শূন্যে অবস্থান করছেন। হিমালয়ের এটাই রহস্য। মানুষ আজও সেই জ্ঞানগঞ্জের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিমালয়ে। আর এই জ্ঞানগঞ্জের পথ ধরে হিমালয়ের এক অদৃশ্য ক্ষমতাবান যোগীর নাম পাওয়া যায়, 'মহাবতার বাবাজি'। অবাক হয়েছিলাম এটা জেনে যে দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্ত লুকিয়ে উত্তরাখণ্ডে এই মহাবতার বাবাজির গুহায় যান।

হিমালয় এক অপার রহস্যের হাতছানি। হিমালয়কে মানুষ তিনভাবে খোঁজে—প্রথমত আধ্যাত্মিক ভাবে, দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে আর তৃতীয়ত বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও অ্যাডভেঞ্চারের টানে। আর এই তিনকে বাদ দিয়ে একশ্রেণির মানুষের কাছে হিমালয় এক অনন্ত রহস্য, যার খোঁজও অনন্ত—অসীম।

ইয়েতি থেকে পাগলা মধু। বৌদ্ধদের রহস্যময় মন্ত্র "ওম মণিপদ্মে হুম", শেরপাদের গ্রাম খুমজুং থেকে রূপকুণ্ড হ্রদের কঙ্কাল কিংবা রহস্যে ঘেরা মানালা গ্রাম থেকে মহাভারতের সেই 'স্বর্গের সিঁড়ি'—এসবেরই খোঁজ রয়েছে হিমালয়কে ঘিরে।

হিমালয়ের কথা শুরু করলে তাই শেষ হতে চায় না কারণ এর ব্যাপ্তি, বিশালতা আর বিশ্বাস। সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত বিচিত্র সাধনক্ষেত্র হিমালয়। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসেবে হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। পাহাড়ের কোলে গড়ে তুলেছিলেন বেদান্তচর্চার আশ্রম—মায়াবতী। আজও দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক, পণ্ডিত, জ্ঞানী মানুষ হিমালয়ের প্রেমে পড়ে, অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় হিমালয় আসেন। তাই হিমালয় আজও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান – এক অনন্ত বিশ্বাসের প্রতীক।

-অনিরুদ্ধ সরকার

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

রহস্যে ঘেরা পঞ্চকেদার পরিক্রমা

'কেদার থেকে বেঁচে' ফেরার পর সেই অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করার পর হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আস্তিক-নাস্তিক উভয়পক্ষের কাছ থেকেই। নাস্তিকরা বলেছেন, যোগাযোগ প্রভাব এসবের জন্য বেঁচে ফিরে এসেছি তো আস্তিকদের কেউ কেউ এখনও বিনা কারণে আমায় প্রণাম জানায় কিংবা শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার জানায়।

আমার বেঁচে ফেরার কারণ কিংবা আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও একটা বড়ো বিষয় আমি আজও ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি এবং তা হল অন্যকে সহায়তা করা, বিনা কারণে অন্যের সমালোচনা না করা, নিজের ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে ঊর্ধ্বে গিয়ে ভাবা, স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে বের হয়ে বৃহত্তর স্বার্থে কিছু ভাবা আর সর্বোপরি নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরকে স্মরণ....

'শিব' জগতের সব কিছুর আধার, সব বা সমস্ত থেকে শব বা শবদেহ সবেতেই শিব বিরাজমান। শিব এক অদ্ভুত শক্তি।

'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রে অসাধ্য সাধন হয় তা অনেকেই জানেন। আর শিব মানেই হিমালয়। আর হিমালয় মানে এক অদ্ভুত রহস্যের হাতছানি। হিমালয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আলোচিত জায়গা হল পঞ্চকেদার। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত হাজারো কষ্ট, প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে এই পঞ্চকেদার পরিক্রমা করেন ও লাভ করেন এক বিচিত্র অলৌকিক অভিজ্ঞতা। পঞ্চকেদার মানে—

- কেদারনাথ
- তুঙ্গনাথ
- মদমহেশ্বর
- রুদ্রনাথ
- কল্পেশ্বর

কেদারনাথ

প্রথমেই কেদারনাথের কথা।

"জয় শ্রী কেদারেশ্বর ভগবান কি জয়" এই মন্ত্র যারা কেদারনাথ তীর্থযাত্রা করেন তারাই উচ্চারণ করেন।

কেদারনাথ মহাদেব শুধু একটি মন্দির নিয়ে গঠিত এমনটা নয়। এখানে মহাদেবের মূর্তি পাঁচ ভাগে পাঁচ জায়গায় বিভক্ত। যাদের একসঙ্গে পঞ্চকেদার বলে। আমরা এই পঞ্চকেদার পরিক্রমা করব।

পুরাণ বলছে, শিবের বয়স যত, কেদারখণ্ড ততটাই প্রাচীন। বেনারসের কাশী বিশ্বনাথের পরই কেদারের স্থান। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই কেদারনাথ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণ-বধজনিত পাপ ও আত্মীয়হত্যার জন্য অনুতাপে ভুগতে থাকেন পঞ্চপাণ্ডব।

সেই পাপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি বেদব্যাসের পরামর্শে হিমালয়ে গেলেন মহাদেব দর্শনে। কেদারখণ্ডে রয়েছে তার বিশদ বর্ণনা, কিন্তু মহাদেব ঠিক করলেন তিনি পাণ্ডবদের দর্শন দেবেন না। পাণ্ডবদের ব্রহ্মহত্যার যে পাপ তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মহাদেব গেলেন পালিয়ে। এদিকে পাণ্ডবরা নাছোড়বান্দা। শিবের পিছু নিলেন পাণ্ডবরা। শিব দেখলেন মহা বিপদ। শেষে আর কোনো পথ না পেয়ে শিব নিলেন ছদ্মবেশ। মহিষের রূপধারণ করে লুকিয়ে রইলেন হিমালয়ে। একদিন সেই মহিষরূপী শিব দেখে ভীম চিনে নেন। ব্যস! শিব আর পারলেন না নিজেকে লুকিয়ে রাখতে। মহাদেব কিছু বোঝার আগেই তাকে জাপটে ধরে ফেললেন ভীম। ভীম যখন শিবকে জাপটে ধরেন মহিষের মুখ তখন ছিল পৃথিবীর দিকে এবং পশ্চাদভাগ ছিল কেদারের দিকে। ভীম মহিষের কুঁজ সহ পশ্চাদভাগ ধরে ফেলেন। শিব থেকে গেলেন কেদারে। মহিষের কুঁজ-রূপী অংশ তাই পূজিত হয় কেদারেশ্বর রূপে। অন্যদিকে মহিষের নাভি প্রতিষ্ঠিত হল মদ-মহেশ্বরে। মহিষের বাহু প্রতিষ্ঠিত হল তুঙ্গনাথে, মহিষের মুখ প্রতিষ্ঠিত হল রুদ্রনাথে আর মহিষের জটা প্রতিষ্ঠিত হল কল্পেশ্বরে।

হিমালয়ের এই পাঁচ পুণ্যভূমি 'পঞ্চকেদার' নামে পরিচিত। কথিত আছে, কেদারে এসে পঞ্চকেদার দর্শন না করলে নাকি কেদার-দর্শনের পুণ্য সম্পূর্ণ হয় না। একদা ভগবান নরনারায়ণ মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে পুজো করেন শিবের। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন শিব। তারপর থেকেই তিনি কেদারে বাস করতে শুরু করেন। সেই থেকে কেদারে বাস দেবাদিদেবের।

শীতকালে প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে কেদারনাথের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে দেয়ালির পর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দির। আর মন্দির খোলা হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। মূল মন্দির মোটামুটি ছ'মাস বন্ধ থাকে। লোকালয় স্তব্ধ হয়ে যায়। পুরোহিতরা নেমে আসেন গুপ্তকাশী কিংবা উখিমঠে। কিন্তু দেবতার পুজো বন্ধ থাকে না, ভগবান কেদারনাথও নেমে আসেন ওইসময়। তখন তার অস্থায়ী ঠিকানা হয় উখিমঠ। এখানে কিছুদিন থেকে আবার শীত শেষে ছ'মাস পর তিনি ফিরে যান কেদারনাথে। পালকিতে চড়ে শিবের এই অবরোহণ এবং আরোহণের নাম 'ডোলিযাত্রা'। শিবের নামা এবং ওপরে ওঠাকে কেন্দ্র করে উৎসব পালিত হয় এখানে। তবে ডোলিযাত্রা দেখার ভাগ্য সবার হয় না।

কেদারনাথ মন্দিরের দ্বার খোলার পর ভিড় উপচে পড়ে। উখিমঠ থেকে শিব ফিরে যান স্বস্থানে। তবে ২০১৩ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কেদারনাথের ডোলিযাত্রার পথ পালটে গিয়েছে। ধ্বংসলীলা যতই হোক, কেদারনাথের মন্দিরটি অক্ষতই ছিল। মন্দিরে থাকা হাতে গোনা কয়েকজনই সেদিনের সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে যায়। কেদারনাথকে চোরাবালিতাল লেকের ওই বিপুল জল থেকে বাঁচিয়ে দেয় একটি প্রস্তরখণ্ড। যার নাম হয়ে যায় দেবশিলা। এই শিলাতেই ওই বিপুল জলধারা দুভাগে ভাগ হয়ে যায় ও মন্দির এবং মন্দিরের ভেতরে থাকা ভক্তদের বাঁচিয়ে দেয়।

কেদারনাথের এই মন্দিরটির নির্মাণকর্তা আদি শঙ্করাচার্য। কেদারনাথ মন্দিরের প্রথম নির্মাতা পাণ্ডবরা। তারা পাথর দিয়ে কেদারনাথের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পুরাণের নানা দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে সাজানো মন্দির। মন্দিরের দরজায় নন্দীর বড়ো একটি মূর্তি রয়েছে। কথিত আছে, নন্দী নাকি শিবের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। পাহাড়ের অন্য দিকে আছেন ভৈরবনাথ। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ পুজোর জন্য আগাম বুকিং নেওয়া হয়।

বিপর্যয়ের পর কেদার আর আগের মতো নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর অনেক কিছু চেনা যায় না। শোনপ্রয়াগে একটা চেকপোস্ট রয়েছে, যেখানে যাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড পরীক্ষা করা হয়। কার্ড ছাড়া পুণ্যার্থী বা ভ্রমণার্থীদের কেদার যাওয়ার এখন আর অনুমতি দেওয়া হয় না। এটা উত্তরাখণ্ড সরকারের নতুন নিয়ম বিনায়ক চতুর্থী এবং দেয়ালিতে খুব জাঁকজমক করে উৎসব হয় এখানে। শ্রাবণ মাসে রাখিপূর্ণিমার ঠিক আগে অন্নকূট মেলা হয়।

কেদারনাথ বেড়ানোর সবচেয়ে ভালো সময় হল গ্রীষ্মকাল। মানে মে মাসে মন্দির খোলার ঠিক পর পরই। কারণ তারপরই বর্ষা চলে আসে। সাইট সিয়িং এবং ট্রেকিংয়ের জন্য আদর্শ সময়। বর্ষাকালে সাধারণত কেউ যায় না কেদারে এবং শীতকালে প্রায় ছ'মাসের কাছাকাছি কেদারনাথ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। স্থানীয় লোকজনও থাকেন না ওইসময়। শিব তখন থাকেন গুপ্তকাশী বা উখিমঠে।

কেদারনাথের মতো বরফ খুব কমই দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগে শোনপ্রয়াগ থেকে যাত্রা শুরু করে গৌরীকুণ্ড, জঙ্গল চটি, চিরবাসা ভৈরব ভীমবলি, রামওয়াড়া, গোরুর চটি হয়ে কেদারনাথ পৌঁছোতেন যাত্রীরা। ২০১৩-র বিপর্যয়ে ধুয়ে-মুছে গিয়েছে রামওয়াড়া থেকে বাকি পথটা। এখন ভীমবলি থেকে লিঞ্চোলি, বদিয়ার পুছ হয়ে কেদারনাথ মন্দিরে পৌঁছোতে পারেন দর্শনার্থীরা। আবার লিঞ্চোলি থেকে বদিয়ারপুছ পুরো রাস্তাই বরফের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। হেলিপ্যাডও রয়েছে এখানে। দু'ধারে দশ-বারো ফুট দেয়াল মাঝে বরফের ওপর চলার পথ। শুধু বরফ আর বরফ, সঙ্গে অপরূপ মোহময়ী রহস্যঘেরা প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য। তীর্থস্থানের স্নিগ্ধ বাতাবরণে এক ঐশ্বরিক পরিবেশ, নিমগ্ন হিমালয়ের গাম্ভীর্য—সবমিলিয়ে কেদারনাথ এক বিস্ময়কর দেবভূমি।

হাওড়া থেকে প্রথমে ট্রেনে হরিদ্বার। দুন এক্সপ্রেস, কুম্ভ এক্সপ্রেস, উপাসনা এক্সপ্রেস-এ যেতে পারেন হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে গাড়ি নিয়ে সীতাপুর, সেখান থেকে রাত্রিবাস করে শোনপ্রয়াগ পৌঁছোন। শোনপ্রয়াগে চেকপোস্ট আছে। মেডিকেল চেক-আপ হয়। তারপর চার কিলোমিটার দূরে গৌরীকুণ্ডর যাত্রা শুরু। এই পথে সরকারি শেয়ার জিপের ব্যবস্থা আছে। হেঁটেও গৌরীকুণ্ড পৌঁছোনো যায়। গৌরীকুণ্ড থেকে সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরে ভীমবলি। এখানে মন্দাকিনীর ওপর একটা ব্রিজ তৈরি হয়েছে। ব্রিজ পেরিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার গেলে লিঞ্চোলি। লিঞ্চোলি থেকে কেদার পাঁচ কিলোমিটার। হরিদ্বার থেকে বাসে রুদ্রপ্রয়াগ চলে যেতে পারেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি যাচ্ছে কেদারনাথ, অন্যটি যাচ্ছে বদ্রীনাথ। অপূর্ব এই বাসযাত্রা। বিমানে হরিদ্বারের কাছে জলিগ্রান্ট এয়ারপোর্টে নেমে আধঘণ্টা সফরে হৃষীকেশ পৌঁছোতে পারেন, তারপর জোশীমঠ। উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে হেলিকপ্টারেও কেদার পৌঁছোনো যায়।

তুঙ্গনাথ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার ‘হিমালয়ের পথে পথে’ গ্রন্থে গাড়োয়ালকে বাঙালিদের কছে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। যে যুগে এই পথ ছিল দুর্গম সে-যুগে যেমন পর্যটক আসার কোনো খামতি ছিল না, এ-পথে এ-যুগেও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নেই। পঞ্চকেদারে প্রথম কেদারের পথে আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা যাব তুঙ্গনাথের পথে। তুঙ্গনাথ ‘তৃতীয় কেদার’ বলে পরিচিত। উখিমঠ থেকে গাড়িপথে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে চোপতা পৌঁছে যাবেন। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার। চোপতা থেকে সাড়ে চার কিলোমিটারের হাঁটা পথ তুঙ্গনাথ। প্রায় ৮,৮০০ ফুট উচ্চতার চোপতাকে অনেকে উত্তরাখণ্ডের মিনি সুইৎজারল্যান্ড বলেন। কারণ, সবুজ বুগিয়াল, “বুগিয়াল” অর্থাৎ মাঠ। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি, পাখির ডাক, চারপাশের পাহাড় মন ভরিয়ে দেবে আপনার। চোপতা, উখিমঠ, সারিগ্রাম, গোপেশ্বর এই এলাকাগুলির প্রকৃতি আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেবে। তুঙ্গনাথ পুণ্যভূমি। তুঙ্গনাথ উত্তরাখণ্ড রাজ্যের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত।

গবেষকদের মতে তুঙ্গনাথ পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতায় শিবমন্দির। পঞ্চকেদার পরিক্রমার অন্যতম মন্দির এই তুঙ্গনাথ। এর উচ্চতা ১২,০৭৩ ফুট। পঞ্চকেদার গুলি হল কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, কল্পেশ্বর, রুদ্রনাথ আর তুঙ্গনাথ। পঞ্চকেদার নিয়ে একটা জনশ্রুতি আছে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধর পর পাণ্ডবরা যখন পাপের আগুনে পুড়ছেন তখন তারা ঠিক করেন যে ভ্রাতৃহত্যার পাপ মোচন করতে তারা শিবের পুজো করবেন। সেই ইচ্ছায় শিবের সন্ধানে তারা বারাণসীতে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু মহাদেব এই পাপীদের হাতে ধরা দিতে রাজি হলেন না তাই তিনি একটি মহিষের রূপ ধারণ করলেন আর হিমালয় পর্বতমালার, উত্তরাখণ্ডের গুপ্তকাশীতে চলে যান। পাণ্ডবরাও তাকে নানা জায়গায় খুঁজতে খুঁজতে উত্তরাখণ্ডে এসে হাজির হলেন আর এদিকে শিবও এ-পাহাড় ও পাহাড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন; পেছনে পেছনে ধাওয়া করলেন পাণ্ডবরা। যেখানে যেখানে পাণ্ডবরা মহিষরূপী শিবকে ধরেও ধরতে পারেনি মানে কোথাও লেজ ধরেছে কোথাও শিং ধরেছে, কিন্তু শিব তবু পিছলে পালিয়ে গিয়েছেন সেই স্থানগুলিই পঞ্চকেদার নামে পরিচিত হয়। তুঙ্গনাথকে তৃতীয় কেদার বলা হয়।

তুঙ্গনাথেরও ওপরে ১৩,১২৩ ফুট উচ্চতায় এই পাহাড়ের চুড়োয় আছে চন্দ্রশিলা, যেখান থেকে হিমালয়ের ৩৬০ ডিগ্রি কোণে চারপাশের বরফে ঢাকা শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, কামিট, পালকি, নীলকণ্ঠ, সুদর্শন, মেরু-সুমেরু, শিবলিঙ্গকে দেখুন প্রাণভরে। চন্দ্রশিলার চুড়োয় একটা ছোট্ট মন্দির রয়েছে, গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে নিবেদিত। গাড়োয়াল ভ্রমণের এক অন্যতম অংশ এই তুঙ্গনাথ-চন্দ্রশিলা যা বাঙালিদের অতি পরিচিত

স্থান।

মদমহেশ্বর

উখীমঠ থেকে গাড়ি চেপে চলুন মনশুনা, যোগাসু ও ওনিওনা ছাড়িয়ে রাঁশির কাছাকাছি। সুন্দর হাঁটাপথে পৌঁছে যান রাঁশি গ্রামে। রাশি থেকে আরও ঘণ্টা দুয়েক হাঁটলেই গৌণ্ডার। গৌণ্ডার থেকে এক কিলোমিটার দূরে বানতোলি। মার্কণ্ডেও গঙ্গা ও মদমহেশ্বর গঙ্গার সংগমস্থলের নিকটে এই ছোট্ট সুন্দর জায়গাটিতে চাইলে কিছুটা সময় থাকতে পারেন। রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে কঠিন চড়াইপথ শুরু। বড়ো বড়ো গাছপালার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ। ক্রমে মদমহেশ্বর গঙ্গাকে দূরে রেখে পৌঁছে যান খাডোরা চটিতে। বড়ো বড়ো ঘাস আর গাছে ঢাকা পাহাড়ের ঢাল ধরে উঠতে থাকুন। প্রায় কিলোমিটার দশেক খাড়া পথ ধরে উঠে এবার নিশ্বাস ফেলুন। চার হাজার ফুট উচ্চতায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে মদমহেশ্বরের অপার্থিব সৌন্দর্য।

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট মদমহেশ্বর মন্দিরটি অসাধারণ। এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ধীরে ধীরে চলুন বুড়ো মদমহেশ্বেরের মন্দিরে। ছোট্ট মন্দির, কিন্তু অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। এখান থেকে চারপাশের দৃশ্য অপূর্ব। চৌখাম্বা ও মান্দানি শৃঙ্গমালাকে খুব কাছ থেকে দেখা যায়। ছোট্ট জলাশয়টি দেখে ফিরে যান মদমহেশ্বরে। একই পথে একটানা নামতে শুরু করুন। পৌঁছে যান বানতোলিতে। বানতোলি থেকে আবার রাঁশি। রাকেশ্বরী মন্দিরটি দেখে নিন। আর এই মন্দিরকে ঘিরে থাকা গ্রামে একটা রাত কাটাতেই পারেন।

রুদ্রনাথ

আবার চোপতার পথে চলুন। বাসে বা ছোটো গাড়ি করে ২৮ কিমি দূরে মণ্ডলে পৌঁছে যান। তারপর সেখান থেকে অনুসূয়া গ্রাম। জাগ্রত অনুসূয়া মায়ের মন্দিরটি দেখে নিন। ছোট্ট গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ।

তারপর ওই চড়াই পথ ধরে চলুন অত্রিমুনির আশ্রম। মন্দির দর্শন শেষে ঘনবনের মধ্য দিয়ে একটানা চড়াই পথে উঠতে থাকুন। একসময় দেখবেন গাছপালা বেশ কমে আসবে। এরই মধ্যে দিয়ে উঠে আসবেন রুদ্রনাথওয়ালা গিরিশিরার ওপরে অবস্থিত নওলা পাস। সেখান থেকে নন্দাদেবী সহ একাধিক শৃঙ্গমালা দেখা যায়। তারপর ওই পথের উত্তর-পূর্বদিক ধরে হাঁটতে থাকুন পৌঁছে যাবেন রুদ্রনাথ মন্দিরে। নির্জন পরিবেশে এ জায়গাটি ভালো লাগবে। মহিষরূপী শিবের মস্তক অংশটি এখানে পূজিত হয়।

কল্পেশ্বর

বুগিয়ালের মধ্য দিয়ে নেমে আসবেন পানার বুগিয়ালে। এখান থেকে দু'টি পথ। আপনি ধরবেন বাঁদিকের পথটি। পৌঁছোন কালাপানি নালা নামে একটি জায়গায়। নালাটি পেরিয়ে আরও খানিকটা চলার পর পৌঁছে যাবেন দুমক গ্রামে। দুমক থেকে দেবগ্রাম পৌঁছে যাবেন। দেবগ্রাম থেকে সহজপথে এক কিলোমিটার দূরে কল্পগঙ্গার ওপর পুল পেরিয়ে কল্পেশ্বর মন্দির। নদীর বামতটে পাথরের নীচে অন্ধকারের মাঝে এই মন্দিরটি। মহাদেবের জটা অংশটি রয়েছে এখানে। দর্শনের শেষে একই পথে ফিরে চলুন দেবগ্রামে।

সালনা থেকে হেলাং গাড়ি পথ ধরে চলতে পারে না। চামোলী-যোশীমঠ বাসরাস্তার উপর অবস্থিত হেলাং পঞ্চকেদার পদযাত্রার শেষ পর্যায়। হেলাং থেকে গাড়ি পথে চামোলী হয়ে হরিদ্বার ফিরে যেতে হয়।

আপনারা কেদারনাথ ঘুরতে গেলে পঞ্চকেদার অবশ্যই যাবেন। কথায় বলে, কেদারনাথ হল মুক্তির, পাপ প্রায়শ্চিত্তের একটা জায়গা। এখান থেকে পঞ্চপাণ্ডব মহাদেবের দর্শনের পর স্বর্গলাভ করেছিল। কোটি কোটি মানুষ সাধু-সন্ত-মহাত্মা তাই যুগের পর যুগ ধরে হিমালয়কে আবিষ্কার করে চলেছেন বিশ্বাসের সঙ্গে আস্থার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে...

- লেখক ২০১৩ সালের কেদার বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

অ্যাডলফ হিটলারের ঘনিষ্ঠ শেন হেডেন চলেছেন তিব্বত। নাৎসি বাহিনীর গুপ্তচরেরাও হিমালয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা একটা কিছু খুঁজছেন। হিমালয়ের সাধু সন্ত মহাত্মাদের কাছে নানান প্রশ্ন করছেন। সাধারণ মানুষদের ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু কেউই নাৎসিদের মুখে আশার আলো ফোটাতে পারছেন না। কী খুঁজছে হিটলারের নাৎসি বাহিনী? শুনলে হয়তো অবাক লাগতে পারে নাৎসি বাহিনী হিমালয় জুড়ে খুঁজে চলেছিল জ্ঞানগঞ্জ।

জার্মান সর্বাধিনায়ক অ্যাডলফ হিটলার অতিন্দ্রীয়বাদে খুব বিশ্বাস করতেন। তিনি এক বৌদ্ধ লামার কাছে শুনেছিলেন জ্ঞানগঞ্জের কথা। এই জ্ঞানগঞ্জ বা শাম্ভালার খ্যাতি সম্পর্কে বেশ অবগত ছিলেন হিটলার।

শাম্ভালা নামক এই অলৌকিক দেশটি সম্পর্কে শুনে তাঁর বেশ আগ্রহ তৈরি হয় এবং তিনি এতটাই উৎসাহিত হন যে ডেকে পাঠান বিখ্যাত অভিযাত্রী শেন হেডিনকে। হিমালয়ে বেশ কয়েকবার অভিযানে পাঠানোর পর হেডেনকে সাহায্য করার জন্য হিটলার হিমালয় ও তিব্বতে শাম্ভালার সন্ধানে নাৎসি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রহস্যময় দেশের খোঁজ পাননি তিনি। হিটলারের কাছে জ্ঞানগঞ্জ অধরাই থেকে যায়।

কৈলাস সংলগ্ন সবচেয়ে রহস্যময় এবং মানুষের চোখে অদৃশ্য মঠ এই জ্ঞানগঞ্জ। কেউ কেউ বলেন জ্ঞানপীঠ। হিমালয় বিশেষজ্ঞদের কথায় হিমালয়ে অবস্থিত এই জ্ঞানগঞ্জ আশ্রম সাংগ্রিলা, শাম্ভালা এবং সিদ্ধাশ্রম নামেও পরিচিত। এই অলৌকিক স্থানটি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে এখানে সবার ভাগ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হিমালয়ে অবস্থিত এই জায়গাটির সঠিক স্থান সম্পর্কে কেউ জানে না। শুধুমাত্র ভারতই নয়, তিব্বতেও এই স্থানটি বিখ্যাত। সাধু মহাত্মারা বলছেন, শুধুমাত্র সিদ্ধ পুরুষগণই সেখানে যেতে পারবেন। এখানে সাধারণ মানুষের যাওয়া সম্ভব নয়। সিদ্ধ পুরুষ অর্থাৎ যিনি দীর্ঘদিন সাধনার মধ্যে আছেন, সাধনার কোনো একটি পর্যায়ে সিদ্ধিলাভ করেছেন সেরকম মানুষজনই একমাত্র পৌঁছোতে পারবেন জ্ঞানগঞ্জ।

জ্ঞানগঞ্জ বড়ো অদ্ভুত জায়গা যেখানে কারওর মৃত্যু হয় না। সেখানে বসবাসকারী সিদ্ধ সন্ন্যাসীদের বয়স বাড়ে না। কালচক্র সেখানে গতিহীন। পুরো জ্ঞানগঞ্জই এক আশ্রম। যে আশ্রমে সময়কে স্থির করে দিয়েছেন সন্ন্যাসী মহর্ষি মহাতপা। যিনি সত্যযুগ থেকে অবস্হান করছেন রাজরাজেশ্বরী মঠে। মহর্ষি মহাতপা কলির শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ধ্যানমগ্ন হয়ে যান যাতে এই সৃষ্টি বজায় থাকে। তাঁর ওপর আশীর্বাদ ছিল ধ্যান করার জন্যে। যেদিকে তিনি যাবেন সেদিকে পথের সৃষ্টি হতে থাকবে। তিনি যেখানে ধ্যান করেছিলেন সেই স্থানের নাম মহাতপা বিল।

পুরাণে আছে মহাতপা বিলে আজও অনেক মহর্ষি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন কীটপতঙ্গ রূপে, শৈবাল রূপে, বাদুড় রূপে কিংবা অন্য কোনো প্রাণী রূপে। মহাতপা বিলে গিয়ে ধ্যান করলে জন্মজন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হিমালয়ের অনেক প্রবীণ সাধুর কথায়, “আজকের বারণাবতই অলৌকিক জ্ঞানগঞ্জ।”

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এর যেহেতু কোনো সঠিক অবস্থান নেই তাই স্যাটেলাইটেও এই স্থানটি দেখা যায় না। এই জায়গাটি কোনো বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির জন্য নয়।

জেমস হিলটনের বই ‘লস্ট হরাইজন, সাংগ্রি-লা হারানো রাজত্ব’ বইতে এই স্থানটির সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতেও জ্ঞানগঞ্জের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে এই স্থানের নাম দেওয়া রয়েছে সিদ্ধাশ্রম বলে।

আবার বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবনের শেষ সময়ে কালচক্র সম্পর্কে জেনে গেছিলেন। তাই মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি যে সমস্ত ব্যক্তিদের জ্ঞান দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাজা সুচন্দ্র। তিনি যখন এই জ্ঞান নিয়ে তাঁর রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন তখন থেকে তিব্বতে এই স্থানটি ‘শাম্ভালা’ নামে পরিচিত হয়।

এই স্থানটি আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বার্ধক্য একটি রোগ। ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়ার মতো দেশে, দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে যদি শরীরে নতুন কোষ নির্মিত হয় এবং অরগ্যানগুলি যদি সবসময় সুস্থ থাকে তাহলে মানুষ এক হাজার বছরেরও বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। যাঁরা ভারতীয় আধ্যাত্মবাদ নিয়ে গবেষণা করেন তারা মনে করেন সাধারণ এই জায়গাটি কোনো বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির জন্য নয় এখানে এক বিচিত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা, যা সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার একেবারে বাইরে।

১৯৪২ সালে একজন ব্রিটিশ অফিসার এলপি ফ্রল এই জায়গাটির সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি একটি চিরকুট রেখে যান, যেখানে তিনি লেখেন, জ্ঞানগঞ্জ আশ্রম তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চল থেকে আনুমানিক ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই প্রাচীন আশ্রমটির সংস্কার ও নির্মাণ করেছিলেন পরমহংস জ্ঞানানন্দ। এর বেশি তথ্য তিনি দিয়ে যেতে পারেননি।

এবার আসি একটা বইয়ের কথায়। বইটির নাম 'দ্য লস্ট হরাইজন', লেখকের নাম জেমস হিলটন। ১৯৩৩ সালে ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেমস হিলটনের উপন্যাস 'লস্ট হরাইজন' প্রকাশিত হয়। কী আছে এই লস্ট হরাইজন বইটিতে? বইটির কাহিনি শুরু হচ্ছে এভাবে, চারজন যাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ডের একটি ট্রাভেলস বিমান আকাশে ওড়ে। তারপর তা হঠাৎ করে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়।

এদিকে অনেক খোঁজখবর করেও যখন হারানো বিমানটির কোনো হদিস মিলল না তখন সবাই ভাবল হয়তো বিমানটি চারজন যাত্রীসহ চিরতরেই হারিয়ে গেছে। অন্যদিকে তিব্বতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়ে বিমানটি। আফগানিস্তান-পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বে ও তিব্বতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি দুর্গম ভ্যালি বা উপত্যকায় ওই চারজন গিয়ে পৌঁছোয়, চারজন যাত্রী অক্ষত থাকলেও মারা যায় পাইলট। যাত্রীরা জানতে পারে না তারা কোথায় এসে পৌঁছেছে। আর তারা এটাও বুঝতে পারেন না যে কত দূরে লোকালয় বা জনবসতি রয়েছে।

আহতরা কোনোভাবে বিমান থেকে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। তাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় এক বৌদ্ধ লামার। নাম চ্যাং। যাত্রীদের চ্যাং লামা নিয়ে যান একটি বৌদ্ধমঠ। যার নাম সাংগ্রি-লা।

যেখানে বসবাসকারী মানুষেরা সকলেই অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী। যেখানে রয়েছে স্বর্ণখনির মতো মূল্যবান সম্পদের ভাণ্ডার। সাংগ্রি-লা-র বিশাল একটি লাইব্রেরিতে সঞ্চিত রয়েছে পৃথিবীর সকল যুগের সকল বিষয়ের আপ্ত জ্ঞান। সেখানে বসবাসকারী মানুষের মাঝে নেই কোনো দুঃখ-কষ্ট, রোগ-বালাই, শোক-তাপ, হিংসা-বিদ্বেষ। সকলে সুশৃঙ্খলভাবে একটি বৌদ্ধ মঠের প্রণীত নিয়ম-কানুন মেনে জীবন পরিচালিত করে, যার নাম সাংগ্রি-লা।

এই সাংগ্রি-লা পৃথিবীর মানুষের কাছে অদৃশ্য, শুধুমাত্র তারাই এর অবস্থান জানতে পারে যাদেরকে সেখানকার অধিবাসীরা নিজ উদ্যোগে সেখানে নিয়ে যায়। এটি এমন একটি পর্বতের কোলে অবস্থিত, যেটিকে এক লেখক বর্ণনা করেছেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর উঁচু পর্বত হিসেবে, যার নাম মাউন্ট কারাকাল। চারদিকের সুউচ্চ পর্বতমালা এই ছোট্ট উপত্যকাকে বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।"

ধারণা করা হয়, সভ্য পৃথিবীতে একদিন এক মহাযুদ্ধ হবে। যে যুদ্ধে মানবসভ্যতার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেদিন মানবসভ্যতার শেষ নিদর্শন হিসেবে সাংগ্রি-লা একমাত্র অঞ্চল হিসেবে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের উত্তাপ সাংগ্রি-লা-কে একেবারেই স্পর্শ করবে না। আর সেই স্থানটিই হবে পৃথিবীর মানুষের আশা ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল।

১৯৩৩ সালে জেমস হিলটনের এই উপন্যাস প্রকাশের পর পরই পাঠকদের কাছে

ব্যাপক সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করে বইটি। চারিদিকে হই হই পড়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আশঙ্কার মাঝে এই উপন্যাসে বর্ণিত পৃথিবীর বুকে এরকম স্বর্গরূপ স্থানের উপস্থিতির ধারণা সমগ্র ইউরোপের পাঠককুলের মাঝে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলে।

শুধু ইউরোপ, ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানিই নয়, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটক—অভিযাত্রীরা বের হয়ে যান সাংগ্রি-লার খোঁজে। হিমালয় ও তিব্বত জুড়ে আলোড়ন পড়ে যায়। নানান দেশের অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের আখড়া হয়ে ওঠে হিমালয়। কিন্তু কেউই শাম্ভালার খোঁজ পাননি।

এখন প্রশ্ন হল, ঔপন্যাসিক জেমস হিলটন কি শুধুমাত্র নিজের কল্পনার জায়গা থেকে এই কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন? নাকি বাস্তবে কিছুটা হলেও তার এই কল্পনার ভিত্তি রয়েছে? আমরা এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

'শাম্ভালা' পৃথিবীর বুকে রহস্যময় এক অঞ্চল। অনেকের চোখে শাম্ভালা হচ্ছে পৌরাণিক এবং ঐন্দ্রজালিক রহস্যে ঘেরা এক দেশ। সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভূত 'শাম্ভালা', যার অর্থ 'শান্তিময় স্থান'। এশিয়ার মানুষের কাছে এটি শান্তালা, শাম্বাল্লা বা সাংগ্রি-লা নামে সর্বাধিক পরিচিত। অঞ্চলটিকে আগার্থা নামেও ডাকা হয়ে হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, যেমন—প্রাচীন কালচক্র তন্ত্রে কিংবা তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের জ্যাংজুং সংস্কৃতির পুরোনো গ্রন্থেও এই শহরের নাম পাওয়া যায়।

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে শাম্ভালা এক অপার রহস্যের নাম। কারও কাছে এটি নিষিদ্ধ ভূমি। কারও মতে এটি পবিত্র জমি, যেখানে প্রবাহিত হয় স্বর্গ থেকে নেমে আসা জলের স্রোতধারা। যে জল বড়োই পবিত্র। কারও মতে আবার এটি আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। কারও মতে সাধনার উর্বর জমি। কেউ কেউ ভাবেন, এটি ঈশ্বরের আবাসভূমি। হিন্দুদের অনেকেই মনে করেন তাদের কাছে আর্যদের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র রাজ্য এই শান্তালা। আবার চিনাদের কাছে এই রাজ্য 'হেসি তিয়ান নামে পরিচিত। পশ্চিমা জগৎ শাম্ভালাকে চেনে 'হোসি ওয়াং মু' নামে।

জ্ঞানগঞ্জকে এককথায় অনেক পণ্ডিত জ্ঞানপীঠ বলে থাকেন। আগেই জানিয়েছি হিমালয়ে অবস্থিত এই 'জ্ঞানগঞ্জ' সাংগ্রি-লা, শান্তালা এবং সিদ্ধাশ্রম নামেও পরিচিত। অনুমান করা হয় এখানে সবার ভাগ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হিমালয়ে অবস্থিত এই জায়গাটির সঠিক স্থান সম্পর্কে কেউ জানে না।

শুধুমাত্র ভারতেই নয়, তিব্বতেও এই স্থানটি বিখ্যাত। তিব্বতে এরকম রহস্যময়, পৃথিবীর দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা একটি রাজ্যের উপস্থিতির ধারণাটি আজকের নয়। সম্রাট আকবর তার ধর্মদর্শন দিন-ই-এলাহি প্রতিষ্ঠার জন্য মতামত নেওয়ার লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা ধর্মের ধর্মশিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করতেন। এদের মাঝে হিন্দু, যোগী, সন্ন্যাসী যেমন ছিলেন, তেমনি খ্রিস্টান যাজকেরাও ছিলেন। এরকমই একজন যাজক সেখানে একটি নিবন্ধের সন্ধান পান, যার সঙ্গে একটি মানচিত্র যুক্ত ছিল। মানচিত্রটি ছিল হিমালয়ের উত্তরের কোনো এক এলাকার, যাতে শুধুমাত্র মানস সরোবর ছাড়া আর কোনো কিছুই চিহ্নিত ছিল না। সেই নিবন্ধে দাবি করা হয়, মানচিত্রের ওই স্থানে খ্রিস্টানরা বসবাস করে।

এর দীর্ঘ সময় আর একজন পর্তুগিজ মিশনারি, যার নাম আন্তোনিও আন্দ্রাদে, মানচিত্রে বর্ণিত স্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যোগী ও তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বহু কষ্টে হিমালয় পাড়ি দিয়ে অবশেষে এক অসম্ভব সুন্দর ও ধনী রাজ্যের সন্ধান লাভ করেন, কিন্তু সেটি শাম্ভালা নয়।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের কাছে কালচক্র বা কালাচক্র তন্ত্র একটি পরিচিত নাম।

এই মতবাদে একটি রাজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, যেটি 'শাম্ভালা' নামে পরিচিত। এই রাজ্য হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত একটি উপত্যকা। এর চারপাশে সুউচ্চ পর্বতমালা এমনভাবে

একে বেষ্টন করে রেখেছে যেন ওপর থেকে দেখলে এ রাজ্যকে একটি পদ্মফুলের মতো দেখায়। এই দেশ মানস সরোবরের কাছেই অবস্থিত।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের জ্যাংজুং সংস্কৃতির প্রাচীন পুথি থেকে জানা যায়, তিব্বতের বরফে ঢাকা পাহাড়গুলোর আড়ালে রহস্যময় শাম্ভালা নামক রাজ্যটি অবস্থিত, যেখানে জ্ঞানী রাজারা বৌদ্ধধর্মের গূঢ় শিক্ষাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছেন। পৃথিবী যখন অন্যায়-অবিচার, লোভ-লালসা আর যুদ্ধ-বিগ্রহে জর্জরিত হয়ে পড়বে, ঠিক তখনই শাম্ভালা রাজ্যের রাজা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করবেন।

আবার প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী, শাম্ভালার রাজা সুচন্দ্র একদা ভারতে এসে শাক্যমুনি বুদ্ধের কাছ থেকে কালচক্র তন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী, তিনি বৌদ্ধধর্মের এই গোপন শিক্ষা শাম্ভালা রাজ্যে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছেন।

হিন্দু ধর্মের বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখ রয়েছে, বিষ্ণুর অবতার কল্কির জন্মস্থান এই শাম্ভালা।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, শাম্ভালা পৃথিবীর বুকে এমন এক স্থান, যেখানে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আত্মার ব্যক্তিরা বাস করে থাকেন। এটি স্বর্গীয় এক স্থান। প্রেম, ভালো বাসা আর জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত এই দেশ। এখানে কোনো কষ্ট নেই, জরা নেই। বয়স এখানে চিরদিনের মতো থমকে আছে। এই দেশে শুধুই আনন্দ, কোনো দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। এখানকার অধিবাসীরা নানা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রযুক্তি, শিল্প, বিজ্ঞান —যে-কোনো বিষয়ের জ্ঞানে তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

শাম্ভালা নিয়ে বৌদ্ধধর্মে এক ভবিষ্যদবাণী প্রচলিত রয়েছে, এই কল্পনগরীতে নাকি বত্রিশজন রাজা রয়েছেন। প্রত্যেক রাজা একশো বছর ধরে রাজ্যটি শাসনের দায়িত্বে থাকবেন। যখন তাদের শাসনকালের অবসান ঘটবে, ঠিক তখনই বাইরের পৃথিবী জুড়ে নানা অরাজকতার সৃষ্টি হবে। পাপে পূর্ণ হয়ে উঠবে এই ধরিত্রী। মানুষের লোভ-লালসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশ ছোঁবে। যুদ্ধ, নৃশংসতা আর নিষ্ঠুরতায় এই পৃথিবীর মাটি রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে। পৃথিবীর সব নিষ্ঠুর এবং অন্ধকার জগতের মানুষরা এক শয়তান রাজার অধীনে একজোট হবে। আর ঠিক তখনই এই পাপিষ্ঠদের বিনাশ এবং পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বরফে ঢাকা পাহাড়ের কুয়াশা সরে গিয়ে শাম্ভালা আত্মপ্রকাশ করবে। যখন সেই শয়তান রাজার সৈন্যবাহিনী শাম্ভালার ওপর আক্রমণ চালাবে, বত্রিশতম শাম্ভালার রাজা রুদ্রন জাঁপো ভয়াবহ যুদ্ধে তাদের হারিয়ে দেবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সেই রাজা আর তার অনুচরেরা।

তবে কালচক্রের ভবিষ্যদবাণীর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার একধরনের বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধধর্ম কোনো সহিংসতা পছন্দ করে না। তাই কালচক্রে যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতই মনে করেন কালচক্রে তা প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কালচক্রে যে রিপুগুলোর কারণে মানুষ তার মানবিক গুণাবলি হারিয়ে ফেলে, সেই রিপুগুলো দমনের কথাই বলা হয়েছে।

প্রেম আর অবারিত জ্ঞানের ভাণ্ডার, কুয়াশার চাদরে মোড়া রহস্যময় দেশ শাম্ভালার অবস্থান জানার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন। অনেক গবেষকের ধারণা, আলো-ছায়ায় মোড়া দুর্গম তিব্বতের প্রকৃতিতেই রয়েছে আশ্চর্য এই প্রহেলিকা।

এমনিতেই তিব্বতের নামটা শুনলে অনেকেই মনে করেন এ যেন কত রহস্যে ঘেরা দূরের কোনো দেশ। পাথরে আড়ালে কুয়াশায় ঢাকা দুর্গম বরফের প্রান্তর, আধো ছায়া বৌদ্ধগুহা, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি, লামা সন্ন্যাসীদের গম্ভীর শিঙার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে অনবরত প্রতিধ্বনি তুলছে। তাই দেশটিকে নিয়ে অনেকেরই মনে একধরনের কুহেলিকা রয়েছে।

কিন্তু এখনও কোনো পণ্ডিত বা গবেষক সঠিকভাবে জানাতে পারেননি শাম্ভালার প্রকৃত

অবস্থান। ধারণা করা হয়ে থাকে, ইউরেশিয়ার কোনো নির্জন উপত্যকায় বা তিব্বতের বরফে ঢাকা পাহাড়ের আড়ালেই নাকি রয়েছে এই রাজ্য।

তবে জ্যাংজুং সংস্কৃতি অনুসারে, পাঞ্জাবের শতদ্রু উপত্যকায় থাকতে পারে এই রাজ্য। আবার আধুনিক বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যাকলিয়ডগঞ্জে হিমালয়ের ধৌলাধর শিখরের কাছেপিঠেই পাওয়া যেতে পারে শাম্ভালা রাজ্যের অস্তিত্ব। আবার মঙ্গোলিয়ানদের ধারণা—সাইবেরিয়ার কোনো দুর্গম পাহাড়ের আড়ালেই রয়েছে এই রাজ্য। তবে শাম্ভালা নিয়ে তিব্বতিদের মধ্যে এমন এক গল্প প্রচলিত রয়েছে, যা থেকে শান্তালা সম্পর্কে একধরনের ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

শাম্ভালার খোঁজে তিব্বতের বিভিন্ন পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এক তরুণ। হঠাৎই একদিন বরফে ঢাকা নির্জন প্রান্তরে সেই তরুণের সঙ্গে দেখা হয় এক সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী সেই তরুণের কাছে জানতে চান, কেন সে একাকী এই নির্জন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার উত্তরে তরুণটি জানায়, সে শাম্ভালা নামের শহরটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্ন্যাসী স্মিত হেসে তরুণটিকে জানায়, "বৃথাই শাম্ভালার খোঁজ করছ। তোমার মাঝেই রয়েছে সেই দেশ। শাম্ভালা মানে শান্তি। আর সেই শান্তি রয়েছে তোমার মনে। প্রতিটি মানুষের অন্তরাত্মাই হল শাম্ভালা।"

আসলে মানুষের মাঝেই রয়েছে লোভ-লালসা আর যথেচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার বাসনা। আর তা থেকেই জন্ম নেয় হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি, এমনকি একে অন্যকে হত্যার চেষ্টাও। তাই মানুষের বিবেক জাগ্রত করে ষড়রিপুকে দমন করতে পারলেই সেই মানুষের মাঝেই পাওয়া যায় শাম্ভালা নামের দেশটির অস্তিত্ব। এখন সে-কথা সবাই মানতে রাজি হয়। কিছু তো আছে জ্ঞানগঞ্জে, আর তা ভেবে সবাই বাস্তবসম্মত শাম্ভালাকে খুঁজে পেতে আরও বেশি তৎপর হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে ১৯৮৫ সালে চতুর্দশ দালাইলামা বৌদ্ধগয়ায় এক ধর্মীয় আলোচনা সভায় বলেন, "শাম্ভালা সাধারণ কোনো দেশ নয়। বিশেষ আত্মিক ও কর্মযোগে পরিচালিত ব্যক্তিই তার সন্ধান পেতে পারে। এটি কোনো দৃশ্যমান দেশ নয়, যা আমরা সহজেই খুঁজে পেতে পারি। আমরা শুধু বলতে পারি যে, এটি একটি বিশুদ্ধ ভূমি, মানব রাজ্যের পরিশুদ্ধ জগৎ। সাংসারিক জীবনে ব্যস্ত একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সেখানে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।"

পশ্চিমাদের চোখে শাম্ভালা নিয়ে রয়েছে অপার মুগ্ধতা। কালচক্রকে ঘিরে রচিত হওয়া নানা গল্পগাথা পশ্চিমা বিশ্বের গবেষক, পণ্ডিতদেরকে বারবার মোহিত করেছে। এছাড়া তিব্বত দেশটি নিষিদ্ধ ভূমি হওয়ায় পশ্চিমাদের কাছে তাই শান্তালা হয়ে উঠেছে কুয়াশাঘেরা রহস্যময় এক স্থান। তাদের ধারণা, শাম্ভালার সন্ধান পাওয়া গেলে পৃথিবীর অনেক অজানা তথ্যই জানা সম্ভব হবে। জোয়াও ক্যাবরাল এবং এস্তেভো ক্যাসেলা নামের দুই ক্যাথলিক মিশনারির কাছ থেকে পশ্চিমা বিশ্ব প্রথম শাম্ভালা সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু তারা প্রথমদিকে মনে করেছিলেন, চিনের আর একটি নামই হচ্ছে শাম্ভালা।

১৬২৭ সালে একদল গবেষক যখন তিব্বতের তাসিল হুন-পো-য় যান, সেখানকার মঠের প্রধান পাঞ্চেনলামার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন। ১৮৩৩ সালে সান্দর কোরোসি সিসমা নামের এক হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত উত্তরের ৪৫ ডিগ্রি থেকে ৫০ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে এই রহস্যময় অঞ্চলটির অবস্থান আছে বলে জানান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হেলেনা পি ব্লাভ্যাস্কি শাম্ভালাকে পৌরাণিক রাজ্য হিসেবে অভিহিত করেন।

সমগ্র শান্তালা উপত্যকা একটি অনিন্দ্যসুন্দর শ্বেতশুভ্র পর্বতের ছায়ায় অবস্থান করে। এই রাজ্যের রাজা স্বয়ং শাক্যমুনি বুদ্ধের কাছ থেকে মহাযান শিক্ষা লাভ করেন। এখানকার মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে পরিচিত নয়। এখানে কোনো রোগ-শোক, মহামারি, অস্থিরতা, দুঃখ-দুর্দশা, হিংসার অস্তিত্ব নেই। এ রাজ্যের মানুষ পরম শান্তিতে মহান বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শন অনুযায়ী জীবনধারণ করে। সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যখন বস্তুবাদী দর্শন আধ্যাত্মিকতাকে

অপসারণ করবে, পৃথিবী যখন স্বেচ্ছাচারিতা ও সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে, তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে কুয়াশায় ঢেকে থাকা শাম্ভালা রাজ্যের ওপর থেকে কুয়াশার চাদর অপসারিত হবে; পৃথিবীবাসীর কাছে এ রাজ্য দৃশ্যমান হবে। এখান থেকেই শুরু হবে পরবর্তী শান্তিপূর্ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

কাজেই দেখা যায়, সাংগ্রি-লা নগরীর কাহিনি তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এই ধরনের নগরের উপস্থিতির ধারণাটি অনেক পুরাতন। এই কিছুদিন আগেও তিব্বত ছিল পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নিষিদ্ধ এক দেশ; যে দেশের বহু স্থানে পরিচিত পৃথিবীর কোনো মানুষের পা পর্যন্ত পড়েনি। প্রাকৃতিক দুর্গমতা আর বৈরী পরিবেশের কারণে যে দেশের অনেক কিছুই ছিল আমাদের অজানা। তাই হয়তো আমরা প্রশ্ন করি, শাংগ্রি-লা কি সত্যিই আছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউ জানি না। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি, হানাহানি ও অশান্তির এ পৃথিবীতে শাংগ্রি-লা নগরের ভাবনা আমাদের ভবিষ্যতের এক শান্তিময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তাই প্রশ্নটি বরং আমাদের এভাবে করা উচিত, 'সাংগ্রি-লা কি নেই?'

শাম্ভালার কথা হচ্ছে যখন তখন বরফানি দাদাজির গল্প হবে না তাও আবার হয় নাকি। গল্পের শুরুয়াত এলাহাবাদ কুম্ভে। রাতে মেলা ঘুরছি। হাজারো টেন্টে নানান প্রবচন হচ্ছে। কোনো কোনো টেন্টে ঢুকে পড়ছি। দেখছি কী হচ্ছে। কুম্ভের এটাই মজা। সারা ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের দিকপালদের আপনি পাবেন একজায়গায়।

অনেক নাগাবাবা ঘুরছেন দেখলাম এদিক-সেদিক। তা একজায়গায় বেশ ভিড়। একটা হোর্ডিংয়ে দেখলাম লেখা আছে বরফানি দাদাজির আখড়া। ঢুকে দেখলাম প্রচুর ভক্তমাঝে বসে আসেন এক প্রবীণ সাধু। বুঝলাম তিনিই দাদাজি। তার চরণতলে মৌমাছির মতো ভক্তরা বসে আছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব নির্বিশেষে প্রচুর সাধক মহাত্মার ভিড় আখড়া জুড়ে। তাদের মধ্যে অনেক গুরুস্থানীয় প্রবীণ সাধুও রয়েছেন। গুরুরা অনেকেই শিষ্যদের উপদেশ দিতে ব্যস্ত। আর সেইসব গুরু ও সাধকদের গুরু দাদাজি বেশ কিছুটা দূরে সিংহাসনে ধ্যানে বসে আছেন। বিচিত্র পরিবেশ। কান পেতে দু-একজন শিষ্যের আলোচনা শুনে বুঝলাম, দাদাজি মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ও পবনপুত্র বজরঙ্গবলীর উপাসক। ইষ্টদেব মানেন ভগবান শিবকে।

উপস্থিত গুরু-শিষ্যদের আলোচনা শুনে বুঝলাম দাদাজির বয়স অনুমান করা যায় না। একশো কিনা তা নিয়ে দুজন গুরু-শিষ্যের মধ্যে জোর বচসা চলছে। তবে উনাকে দেখে বোঝা কঠিন যে উনার বেশ বয়স হয়েছে।

এক শিষ্যের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে শুনলাম দাদাজি নাকি জ্ঞানগঞ্জ গেছেন। আগ্রহ বাড়ল। শুনলাম দাদাজি তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন বই আকারে। আরও বেশ কিছু মানুষ এই দাদাজি মহারাজের নানা কথা তাঁদের বিভিন্ন বইয়েও স্থান দিয়েছেন।

শিষ্যের সঙ্গে আলাপ জমাতেই শুরু হল নানা প্রসঙ্গ। শিষ্যেকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম দাদাজির জ্ঞানগঞ্জের অভিজ্ঞতা নিয়ে সে কী কী জানে? শিষ্য জানাল, দাদাজি তাদের বিভিন্ন সময়ে জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে অনেক গল্প করেছেন যেমন, জ্ঞানগঞ্জ যাত্রাপথে দাদাজির কাছে বাবাজি মহারাজ, গণেশলামা ও ফুলেরীবাবা-তিনজনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁরা একসময় যখন বুঝতে পারলেন দাদাজি আর বেশিদিন তাঁর স্থূলদেহ ধরে রাখতে পারবেন না তখন দাদাজিকে বেশ কিছু উপদেশ দিলেন তখন দাদাজি বললেন, "মৃত্যু হয় হোক, কিন্তু ইষ্টের ধ্যান ছাড়তে পারব না"। তখনই ফুলেরীবাবা দাদাজিকে উচ্চমার্গের একটি ধ্যানের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষাদান করলেন। শিক্ষান্তে দাদাজিকে ধাক্কা মেরে একটি গর্তের ভেতর ফেলে দিলেন। সেখানেই দাদাজি ধ্যানস্থ হলেন। এইভাবে কতদিন, কত মাস, নাকি কত বৎসর কেটেছিল তা জানা যায় না। দাদাজির ধ্যানস্থ শরীর ধীরে ধীরে বরফে ঢেকে গেল। দেখতে দেখতে দাদাজির দেহকঙ্কাল কেবল চর্মদ্বারা আবৃত হয়ে পড়ল। দেহে মাংসের আর বিন্দুমাত্র চিহ্নমাত্র নাই। এমতাবস্থায় যখন দাদাজির দিন কাটছে তখন বাবাজি

মহারাজ, গণেশলামা ও ফুলেরীবাবা—এই তিন সিদ্ধমহাত্মা দাদাজিকে বরফের স্তূপ থেকে উদ্ধার করেন। তারপর যোগবলে দাদাজির দেহে মাংসের সংযোজন করেন। তারা দাদাজির নামকরণ করলেন, 'বরফানী' নামে। সেই থেকে বরফানী নামটি প্রচলিত হয়ে গেল।

শুনলাম, আখড়ার এক মহাত্মা একবার জ্ঞানগঞ্জ ও তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন দাদাজির কাছে। দাদাজি সে-কথা শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেই চোখ বুজে কিছুক্ষণ পরে বলেছিলেন, "আমার স্বপ্নের মহা আশ্রম, ক্রিয়াযোগ ও সূর্যবিজ্ঞান চর্চার সিদ্ধপীঠ জ্ঞানগঞ্জ।" অসংখ্য মৃত্যুঞ্জয়ী সাধকের সাধনার ছটায় উদ্ভাসিত জ্ঞানগঞ্জ।

কিছুক্ষণের মধ্যে দাদাজির আর এক শিষ্য আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "দাদাজি আমাদের জ্ঞানগঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি কীভাবে গেছেন, কোথায় থাকতেন সব বলেছেন দাদাজি। একেবারে ছবির মত তার বিবরণ।"

দাদাজি একবার বলেছিলেন, "ওই আশ্রমের সঠিক অবস্থানের পাশাপাশি আশ্রমে প্রবেশ করার জন্য কতগুলি গুহাপথ আছে। প্রতিটি গুহাপথের মুখ বরফের চাঁই দ্বারা এরূপ-ভাবে আবৃত যে বাইরের থেকে বুঝবার উপায় নাই। কিন্তু যিনি এ-বিষয়ে অবগত আছেন তিনি অতি সহজেই ওই গুহার মুখ উন্মোচন করিয়া ভেতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। জ্ঞানগঞ্জের এই গুহাগুলি রামগুহা, লক্ষ্মণগুহা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত।"

দাদাজির অন্য শিষ্য বললেন :

দাদাজি জ্ঞানগঞ্জের যে তিনজন সিদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে সবার কাছে প্রকাশ করেন, তাদের মধ্যে আছেন 'গণেশলামা' – যিনি কায়াকল্প বিশারদ, দ্বিতীয়জন 'ফুলেরীবাবা' – যিনি দাদাজিকে ধ্যানের মাধ্যমে সমাধিতে উপনীত হইবার কৌশল শিখিয়েছিলেন। আর তৃতীয়জন হলেন 'মহাবতার বাবাজি' বা বাবাজি মহারাজ। যার সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী। শ্যামাচরণের গুরুদেব মহাবতার বাবা সারা হিমালয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁর বয়স আন্দাজ করা যায় না। এছাড়া দাদাজি আরও একজনের নাম উল্লেখ করেছেন যার নাম 'লেঘুরিয়াবাবা'। এই মহাত্মার সর্বাঙ্গ বড়ো বড়ো লোমে আবৃত হবার কারণে দূর থেকে তাঁকে দেখতে লাগত ভাল্লুকের ন্যায়। তাই জ্ঞানগঞ্জে তিনি লেখুরিয়াবাবা নামেই পরিচিত ছিলেন।

শিষ্যের কথায়, "সহস্র বৎসরকাল পরমায়ু ভোগকারী মহাযোগী গৌরীশঙ্কর মহারাজকে দাদাজি দেখেছেন কিনা, একবার কেউ একজন উনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। উনি শিশুর ন্যায় সরলতামাখা হাসি নিয়ে তাকে বলেছিলেন "ম্যায় উসিকা হি বেটা হুঁ। কেবল দেখা-হি নেহি, নর্মদামাইকী সাথ বাতচিত করতে হয়ে দেখা। উস্ দোনো কে বিচ পিতা অউর বেটিকা রিস্তা থা। হাজার সাল কি উমর মে নর্মদা কিনারে উসনে আপনা শরীর ত্যাগ দিয়া।"

দাদাজির শিষ্য বললেন, "জ্ঞানগঞ্জের অবস্থান থেকে আরম্ভ করে জ্ঞানগঞ্জের আশপাশের বর্ণনা সবই লিপিবদ্ধ করেছেন দাদাজি। অনেক সাধু-মহাত্মারা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন "জ্ঞানগঞ্জ কাঁহা হো?" তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তিব্বতের মানস-সরোবরে অবস্থিত কৈলাস পর্বত। ওই পর্বতের পেছনদিকে ঈশান কোণে বরফাবৃত তিন দিনের হাঁটা পথ। চারিদিকে একাধিক বরফমোড়াশৃঙ্গ। পর্বতে ঘেরা আছে চারপাশ। ২১,০০০ থেকে ২২,০০০ ফিট উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত এই সিদ্ধাশ্রম, জ্ঞানগঞ্জ। যার এক দেড় কিলোমিটারের মধ্যেই আছে পর্বতারোহীদের যাতায়াতের পথ। পর্বতদ্বারা ঘেরা এই সিদ্ধাশ্রমকে আরও সুরক্ষিত করবার জন্য পর্বতগুলির বাইরের দিকে বলয়াকার সৃষ্টি করা হয়েছে আধ কিলোমিটার চওড়া মায়া কুয়াশার পরিবেশ। কারও পক্ষে এসকল ভেদ করে সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। আশ্রমের ভেতরের পরিবেশ অতি মনোরম। যোগবলে আশ্রম প্রাঙ্গণে যেমন ঠান্ডার প্রাবল্য হ্রাস করা হয়েছে, তেমনি এক আরামদায়ক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে বরফদ্বারা নির্মিত দেবী রাজরাজেশ্বরী পূজিত হন। ১৪০০ বৎসর বয়স্ক মহাতপা মহারাজ নিজ হাতে এই মূর্তি বানান। এই মহাযোগীর ললাটচর্ম ঝুলে গেছে। দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সে-কারণে ওনারই ললাটের সঙ্গে একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সেই

ললাটচর্ম বাঁধা থাকে।

দাদাজি জানাচ্ছেন, "জ্ঞানগঞ্জে এরা ছাড়াও আছেন আদি শক্তির অংশ ১৪০০ বছরের ও বেশিবয়স্কা "ক্ষেপাই মা"। পরনে তাঁর কালো মেঘরাশির ন্যায় নিজমস্তকের বিশাল কেশরাশি। সেই কেশরাশিতেই তাঁর সমস্ত শরীর আবৃত। কেবল চরণ-যুগল, হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল অনাবৃত। যেন ষোড়শী তরুণী।"

শিষ্য জানাল, দাদাজি এই জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে খুব একটা বেশি বলেন না। তা একবার আমাদের কায়াকল্প কী এবং কোথায় কীভাবে করা হয় সে বিষয়ে বলেছিলেন দাদাজি। আমরা শুনেছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। দাদাজির কথায়, "জ্ঞানগঞ্জে একটি নদী আছে। জলের পরিবর্তে তাতে গন্ধক প্রবাহিত হয়। ওই নদীর পাড়ে জড়িবুটির সাহায্যে কায়াকল্পের ব্যবস্থা করা হয়। যিনি কায়াকল্প করতে ইচ্ছুক তাঁর সর্বাঙ্গে প্রথমে জড়িবুটির প্রলেপ দেওয়া হয়। দেহ ক্রমে প্রাণহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তিন দিন পর ওই দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হয়, কিন্তু অবয়বগতভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়।"

ক্রিয়াযোগ সম্পর্কেও আমাদের একবার বলেছিলেন দাদাজি। দাদাজির কথায়, "ক্রিয়াযোগের ১০টি ধাপ। খুবই কঠিন। এই যোগে সিদ্ধপুরুষ পার্থিব দেহকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে যেমন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম, তেমনি সমস্ত খণ্ডগুলি একত্র করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারেন তিনি। এসবই তাঁর করায়ত্ত।" দাদাজি বারে বারে জানিয়েছেন ক্রিয়াযোগের অনুশীলন বেশ কঠিন, তাই ক্রিয়াযোগ সম্পর্কে জানলেও ক্রিয়াযোগ মার্গে হাঁটার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়।

শিষ্য বলল, যোগের আসল অর্থ কী তা নিয়েও দাদাজি বিশদ জানিয়েছেন। দাদাজির কথায়,যোগের আসল অর্থ মন্ত্র। তাহলে এই প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক যে আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, নৌলি, ধৌতি, যম, নিয়ম এগুলি তাহলে কী আর মন্ত্র কোথায় পাওয়া যায়? দাদাজির কথায় মন্ত্র বলতে দুপ্রকার মন্ত্র বোঝায় একটি বীজমন্ত্র আর অন্যটি ঈশ্বরমন্ত্র। বীজমন্ত্র দেওয়ার আধিকার আছে একমাত্র গুরুর। আর সাধারণ মন্ত্র বা ঈশ্বরমন্ত্র যে-কোনো ভক্ত তার মতো করে জপতে পারে।

দাদাজির ধ্যান তখনও ভঙ্গ হয়নি। ভোর হয়ে আসছিল। সারারাত মেলা ঘুরে একটু ক্লান্তি আসছিল। তাই দাদাজির দুই শিষ্যকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম টেন্ট থেকে।

এবার আর এক মহাত্মার কথায় আসি, জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে আলোচনা করলে তাঁর নাম আসা স্বাভাবিক। জ্ঞানগঞ্জের সেই সাধকের নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস। পূর্বাশ্রমের নাম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ধমানের বন্ডুলগ্রামে জন্ম ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের। যিনি পরবর্তীকালের যোগীরাজ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস নামে পরিচিত হন। কৈশোরে তাঁকে কুকুরে কামড়ালে গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় চন্দননগরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় চিকিৎসার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতেও কোনো উপকার না পাওয়ায় তিনি হুগলিতে যান। সেখানে একদিন দেখেন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী নিরন্তর গঙ্গার জলে ডুবছেন এবং উঠছেন। সন্ন্যাসীর বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পান ভোলানাথ। সেই সন্ন্যাসী নাকি জ্ঞানগঞ্জের সন্ন্যাসী। নাম, পরমহংস নীমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী শুধুমাত্র স্পর্শ করে ভোলানাথকে সুস্থ করে দেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে এক অলৌকিক উপায়ে জ্ঞানগঞ্জে নিয়ে যান, যেখানে নীমানন্দের গুরু মহর্ষি মহাতপা, যাঁর বয়স ১২০০ বছরেরও অধিক, ভোলানাথকে দীক্ষাদান করেন এবং শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।

এক লেখক তাঁর লেখায় লিখছেন, এই স্থানটি এত গুপ্ত যে সুদীর্ঘকালেও চিন ব্রহ্মদেশ ও আসামের বারোজন ছাড়া আর কেউ এই স্থানের সন্ধান জানতনা। একজন গ্রিক পর্যটক তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে এই মঠ বড়ো অদ্ভুত। এরকম স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। একে 'হেভেন্ অন আর্থ' বলা চলে। অন্যদিকে চিনাদের আগ্রহও কম নয় এই জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে। এর কথা বলেছেন চৈনিক ঐতিহাসিক ফেন গিলিয়ান। তিনি লিখছেন পর্বতবেষ্টিত

একটি উপত্যকার মাঝে সাত-আট মাইল জুড়ে বিস্তৃত এই আশ্রম। যার চতুর্দিকে আছে জলপূর্ণ পরিখা। মাঝেমধ্যে তা বরফ হয়ে যায়। যাতায়াতের জন্য আছে একটি ধনুকের মতো সেতু। আশ্রমটি শিক্ষার ক্রম অনুসারে স্তরে স্তরে সাজানো। এখানে থাকেন ব্রহ্মচারী যুবক, ব্রহ্মচারিণী, বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী এবং মহাশক্তিশালী সিদ্ধ পরমহংসগণ।”

ভারতীয় যোগমার্গে বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অসাধারণত্ব প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ দুটি কারণে—এক দীর্ঘ কুড়ি বছরের নিরলস সাধনার দ্বারা কাশীতে নরমুণ্ডি আসনের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ত সূর্যবিজ্ঞানের জন্য। সূর্যবিজ্ঞান বলতে কিন্তু আজকের সোলার সায়েন্স নয়। এই সূর্যবিজ্ঞান হল জগতে প্রচলিত অতি প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা এবং এই বিদ্যার দ্বারা করা যায় না, এমন কিছু জগতে প্রায় বিরল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের কাছে সূর্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখেছেন। তারা দেখেছেন কীভাবে তিনি এক বস্তুকে আর এক বস্তুতে রূপান্তরিত করছেন। গন্ধের দ্বারা বলে দিতে পারছেন ভবিষ্যৎ। একাধিক ঘটনা চাক্ষুষ দর্শন করে বহু লেখক সাংবাদিক সে-যুগের বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতে এই বিষয়ে লেখালেখি করেন। পরমহংসদেবের ইচ্ছা ছিল একটি সূর্যবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার, যার দ্বারা যে-কোনো রোগের নিরাময় সম্ভব হত। এই কাজে তিনি অনেকদূর এগিয়েও ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর গুরুদের হস্তক্ষেপে তাঁর প্রচেষ্টা অসফল হয়। নরমুক্তি আসনের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও ছিল জগতের হিতসাধন। নরমুণ্ডি আসনের তত্ত্ব অতি গূঢ় এবং বহু বহু অসাধারণ শাস্ত্রবিদদেরও বোধের অগম্য। স্থূল দৃষ্টিতে বলা যায় যে শক্তিদেবীর কাছে নরমুণ্ডির আসনে বসে সকাম ও নিষ্কাম উভয় প্রকার কর্মজনিত প্রার্থনা করলে তাতে সফল হওয়া যায়।

বিশুদ্ধানন্দজীর জীবন ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তিনি যোগমার্গের এক পরিশ্রমী সাধক ছিলেন। তিনি বরাবরই তাঁর শিষ্যদেরও কর্মের ওপর জোর দিতে বলতেন। কর্ম বলতে যোগক্রিয়ার কথাই বলতেন। কর্ম ও কৃপা একে অপরকে আশ্রয় করে থাকে—এই হল শাস্ত্রের অভিমত। কিন্তু বিনা কর্মে কৃপার দেখা মেলে না। ‘অহৈতুকী’ নামে একধরনের কৃপার উল্লেখ আছে শাস্ত্রে, কিন্তু তারও মূলে আছে কর্ম। গুরু আদেশের অমান্যতায় বিশেষ দুর্গতি হয়। তাই বাবাজি আদেশের পরিবর্তে উপদেশ দিতেন। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ অতি বাল্যকালেই তিনি তাঁর পিতাকে হারিয়ে জননী মা রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্নেহে ও মমতায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকেন। বাবাজির চরিত্রের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ মাতৃভক্তি, ঠিক তেমনই অন্যদিকে ছিল তাঁর গুরুবর্গের প্রতি আজীবন প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবার অনন্যসাধারণ প্রয়াস। জ্ঞানগঞ্জের এক অতি প্রাচীন মহাত্মা—মহর্ষি মহাতপা ছিলেন তাঁর দীক্ষাদাতা গুরু। মহর্ষি মহাতপার এক শিষ্য ভৃগুরামের তত্ত্বাবধানে বালক ভোলানাথের যোগশিক্ষা চলতে থাকে এবং জ্ঞানগঞ্জেরই অপর এক পরমহংস শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধানে তাঁর সূর্যবিজ্ঞানের শিক্ষা চলতে থাকে।

বিশুদ্ধানন্দ তীর্থস্বামী অবস্থায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন। তারপর গুরু মহর্ষি মহাতপা পরমহংসদেবের নির্দেশে বিবাহ করে সংসারে মনোযোগ দেন। গুরুবর্গের নির্দেশানুসারে এইসময়ে তিনি সংসার প্রতিপালনের জন্যে চিকিৎসা এবং যাগজ্যোতিষের চর্চা করতেন। বাবাজি তাঁর যোগদৃষ্টিতে রোগের মূল সহজেই বুঝতে পারবার কারণে রোগীদের সকলেই নিরাময় লাভ করতেন। যেসব রোগীর বাঁচার উপায় ছিল না, তাদের চিকিৎসার ভার তিনি গ্রহণ করতেন না। ‘যোগজ্যোতিষ’ জ্ঞানগঞ্জের বহুবিধ প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যে একটি। নির্ভুলভাবে ভবিষ্যতের কথা বলে দেওয়া সম্ভব একমাত্র যোগজ্যোতিষের দ্বারা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তাঁর গুরু মহর্ষি মহাতপা, বাবাজিকে দীর্ঘ সাধনার অন্তে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে আদেশ করেন ও সংসার প্রতিপালনের জন্য চিকিৎসা এবং যোগজ্যোতিষের চর্চা করতে বলেন।

এরকম একের পর এক সাধু যোগী মহাত্মা থেকে আধুনিক লেখক সাহিত্যিক অনেকেই

যুগের পর যুগ ধরে এই জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার গোপনে ব্যবসাও ফেঁদেছেন। সাধুর বেশে জ্ঞানী মহাত্মা সাজিয়ে শাম্ভালার পথপ্রদর্শক সাজিয়ে ট্রাভেল ব্যাবসা চালাচ্ছেন। পাহাড়ের কর্পোরেট যোগী দামি জুতো দামি ঘড়ি পরে সাধক মহারাজ জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে যাচ্ছেন। সবাইকে তিনি গোপনে একই গল্প শোনান, “তিনি গেছেন। বড়ো দুর্গম সে পথ। সারাজীবনে কত কষ্টের ফল তার জ্ঞানগঞ্জদর্শন। উনি আপনাকে নিয়ে গিয়ে কৃতার্থ করছেন।”

তবে দীর্ঘ গবেষণার পর একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে জ্ঞানগঞ্জকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে একটা সময় একদল সাধুর আবির্ভাব হয়েছিল যাদের আদি গুরু ছিলেন মহাবতার বাবাজি আর তাকে ঘিরেই বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস থেকে শ্যামাচরণ লাহিড়ী অনেকের নাম এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে চর্চাকারী সাধকদের বেশিরভাগজনই গৃহী সাধক।

জ্ঞানগঞ্জ থেকে আরম্ভ করে এই স্থান নিয়ে চর্চাকারী সাধকগণ এবং তাঁদের সাধন পদ্ধতির পুরোটাই ধোঁয়াশায় ঘেরা। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের কাছে তাই জ্ঞানগঞ্জ আজও এক অলৌকিক রহস্যে ঘেরা জগৎ। হয়তো তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের সবার মনের মধ্যেই আছে জ্ঞানগঞ্জ। আত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আপনাকে আত্মোপলব্ধির দ্বারা পৌঁছে দিতে পারে জ্ঞানগঞ্জে!

হিমালয়ের এক অদৃশ্য যোগী ‘মহাবতার বাবাজি’

বছরে একবার হঠাৎ করে উধাও হয়ে যান দক্ষিণের সুপারস্টার অভিনেতা রজনীকান্ত। উধাও হওয়া দিনগুলিতে তিনি কোথায় যান কিংবা কোথায় থাকেন তা নিয়ে বিশদ কিছু জানা যায় না। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় বছরের সেই নির্দিষ্ট সময় তিনি নাকি পাড়ি জমান উত্তরাখণ্ডে।

উত্তরাখণ্ড, মানে দেবভূমি। যে পথে পাণ্ডবরা যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। সেই পথ ধরেই যান অভিনেতা রজনীকান্ত। আর রজনীকান্ত উত্তরাখণ্ডের কোথায় যান শুনলে আপনি একটু অবাকই হবেন। সাউথের সুপারস্টার যান একটি পাহাড়ি গুহায়।

সাউথের সুপারস্টার রজনীকান্ত, যাকে ঘিরে সবসময় একটা বিরাট সুরক্ষাবলয় থাকে, তিনি উত্তরাখণ্ডের এক গুহায় কী জন্য যান? এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ পেতে লেগে যান বেশ কয়েকজন। অনেকটা সময় ধরে অনুসন্ধান। তারপর উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

জানা যায়, রজনীকান্ত উত্তরাখণ্ডে যান মহাবতার বাবাজির গুহায়। মহাবতার বাবাজি মানে যাকে ঘিরে কয়েক যুগ ধরে আসছে নানান মিথ। নানান গল্প। হিমালয়ের বুকে সবচেয়ে অলৌকিক সাধক। যাকে সহজে দেখা যায় না। চাইলেই দেখা পাওয়া যায় না। তিনি চাইলেই কেবল দেখা হয়।

অলৌকিক জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে যেমন হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে, কিন্তু আজও সেই রহস্যের কোনো কিনারা হয়নি। আদৌ জ্ঞানগঞ্জ আছে না নেই তা জানা যায় না তেমনি এই মহাবতার বাবাজির গল্পও একই। মহাবতার বাবাজিও জ্ঞানগঞ্জের সাধক।

চলে আসি আবার রজনীকান্তের কথায়। যে গুহায় রজনীকান্ত যান সেই গুহা অবধি গাড়ি পৌঁছোয় না। তাহলে সেই গুহা অবধি কীভাবে যান আমাদের এই সুপারহিরো? মানে হাজারো ভক্তদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। শোনা যায় ছদ্মবেশ নেন সুপারহিরো।

সিনেমার পর্দায় অনেক অবাস্তবকে বাস্তব করেছেন রজনীকান্ত তাই তাঁর অনুরাগীরা সবসময় তাঁদের সুপারহিরোর কাছ থেকে অনেক বেশি স্টান্ট প্রত্যাশা করেন। ব্যক্তিজীবনেও এই সুপারহিরো তাই স্টান্ট দেখাতে পিছপা হন না। হয়তো তাই প্রতিবছর লোকজনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশে এই গুহায় পৌঁছে যান রজনীকান্ত। বিষয়টি মোটেও সহজসাধ্য নয় তা বেশ বুঝতেই পারছেন।

রীতিমতো ট্রেক করে পাহাড় ডিঙিয়ে সেই গুহায় পৌঁছোন সুপারস্টার। শুধু ছদ্মদেশই নয় এই গুহায় পৌঁছোনোর যাত্রাপথে তিনি খুবই সাধারণ আহার করেন। খুবই সাধারণ জীবনযাপন করেন পুরো যাত্রাপথে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, কুমায়ুন হিমালয়ের আলমোড়া জেলায় এক পাহাড়ি গ্রামে কিছুদিন আশ্রয় নেন সুপারস্টার রজনীকান্ত। সেই গ্রামের কাছেই অবস্থিত তাঁর গন্তব্যস্থল।

এতক্ষণ ধরে রজনীকান্তের রহস্যময় গুহায় যাওয়ার কথা শুনলাম। কোথায় আছে সেই গুহা? জানা গেছে গুহাটি আলমোড়ায় অবস্থিত। যে আলমোড়া থেকে সামান্য দূরেই মায়াবতী। বিবেকানন্দের ড্রিম প্রোজেক্ট-মায়াবতী। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বেদান্ত চর্চা কেন্দ্র। বেদান্ত সোসাইটি।

এই আলমোড়ার একটি গ্রামেই আশ্রয় নেন সুপারস্টার রজনীকান্ত। সব ছেড়ে এই আলমোড়ার গ্রামে কী খুঁজতে আসেন রজনীকান্ত। রজনীকান্ত নাকি সেই গুহায় ধ্যানে বসেন। আর এই গুহাতে নাকি থাকেন এক রহস্যময় যোগীপুরুষ। তাঁর সঙ্গে নাকি দেখা করতে যান রজনীকান্ত। কে এই যোগী পুরুষ? এই যোগী পুরুষই কি তাহলে ‘মহাবতার বাবাজি”?

‘মহাবতার বাবাজি’, যিনি অনেক জায়গায় বাবাজি মহারাজ নামেও পরিচিত।

তাঁর পরিচয় কী? আসলে এই সাধকের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষজন খুব কম জানেন।

কারণ তাঁর একাধিক বিষয়ে নিষেধ রয়েছে বলেই জানা গেছে। তাঁর একটি মাত্র ছবি আঁকা হয় যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সহায়তায়।

দুনাগিরির এক পাহাড়ে সমুদ্রতল থেকে ৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত একটি গুহাতেই কখনো সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করছিলেন মহাবতার বাবাজি। যে গুহাতে যান রজনীকান্তের মতো মানুষরা। আর শোনা যায় সেই গুহাতেই নাকি ইচ্ছে হলে তিনি দেখা দেন।

অনেকেই আছেন যারা বিশ্বাস করেন মহাবতার বাবাজির কথা। কেউ বা করেন না। সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে এমন কথাও নেই। যুক্তি-তক্কের দোকান খুলে বসেন বেশ কিছু যুক্তিবাদী মানুষ। কেউ বা একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলেন, "আবার একজন বাবাজিকে নিয়ে বসলেন। অন্য কথা বলুন।" সব কিছুর ঊর্ধ্বে একটা কিছু তো আছেই ওনার মধ্যে যার টানে আজ মহাবতার বাবাজিকে নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। ওনাকে নিয়ে খোঁজের গল্প শোনাতে এলাম। আর কী এমন কারণ যার জন্য আমি না, এত এত মানুষ তাঁর খোঁজ করেন। আমরা তো ছেড়েই দিন, তাঁর গুহায় গিয়ে মেডিটেশনে কেন বসেন দক্ষিণের সুপারস্টার রজনীকান্ত?

মহাবতার বাবাজি যোগসাধক শ্যামাচরণ লাহিড়ি মহাশয়ের গুরু। তাঁর প্রকৃত নাম বা পরিচয়—সবই কিংবদন্তিতে আচ্ছন্ন। পরমহংস যোগানন্দ তাঁর আত্মজীবনী 'অটোবায়োগ্রাফি অফ আ যোগী'-তে তাঁর কলকাতার বাড়িতে বাবাজি মহারাজের অতিলৌকিক অবস্থিতির কথা লিখেছেন।

রজনীকান্তের রহস্যময় যাত্রা প্রসঙ্গে একবার তিনি মুখ খুলেছিলেন। তাঁর কথায়, "১৯৭৮ সালে এয়ারপোর্টের একটি বইয়ের দোকান থেকে পরমহংস যোগানন্দের 'অটোবায়োগ্রাফি অফ আ যোগী' বইটি কিনি। কিন্তু সে-সময়ে আমার ইংরেজি তেমন দুরস্ত ছিল না। ফলে বইটি পড়ে উঠতে পারিনি। পরে আমি গ্রন্থটি পাঠ করি এবং বাবাজি সম্পর্কে পরিচিত হই।"

মহাবতার বাবাজির প্রকৃত পরিচয়ের মতো তাঁর সময়কালও রহস্যাবৃত। পরমহংসের বিবরণ অনুযায়ী, বাবাজি নাকি যীশুখ্রিস্টের সমসাময়িক। অর্থাৎ তিনি ২০০০ বছরেরও আগে জন্মেছিলেন। কিন্তু যুগে যুগে তিনি দেখা দিয়েছেন। তাঁর দেখা পেয়ে ধন্য হয়েছেন অনেক সাধক। শ্যামাচরণ লাহিড়ীর মত মানুষ তাঁর কৃপা পেয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন। মহাবতার বাবাজির কাছে দীক্ষা নিয়েছেন পরমহংস যোগানন্দের মতো ক্রিয়াযোগীরা।

লোকবিশ্বাস, বাবাজি আজও অবস্থান করেন তাঁর গুহায়। ভক্ত রজনীকান্ত তাঁকেই পরম গুরু বলে মানেন। তাই প্রতি বছর কুমায়ুনের গুহায় তাঁর ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রা। মহাবতার বাবাজির গুহায় দীর্ঘ সময় তিনি ধ্যান করেন এবং আত্মমগ্ন হয়ে কাটান।

সাধনার জোরে অমরত্ব লাভ করেছেন এমন নজির খুব কমই আছে জগৎে, মহাবতার বাবাজি এমনই একজন সিদ্ধ যোগী। যুগে যুগে তাঁর অবতরণ করার জন্য তাঁকে মহাবতার বলা হয়।

বলা হয়, মহাবতার বাবাজি গুরুদের গুরু বা জগৎগুরু। আদি শঙ্করাচার্যের পর তিনিই আদি গুরু। তাই তাঁকে মহাবতার বাবাজি বলা হয়। ক্রিয়াযোগের তিনি প্রাণপুরুষ। ধ্যান, আধ্যাত্মিকতা ও আসনকে তিনি এক সূত্রে গেঁথেছেন কয়েক হাজার বছর আগে। পরবর্তীতে তার পথ অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়েছেন তার সুযোগ্য শিষ্যরা যার মধ্যে শ্যামাচরণ লাহিড়ী, যুক্তেশ্বর গিরি, পরমহংস যোগানন্দ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মহাবতার বাবাজি কে তা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গল্প, কিংবদন্তি ও রহস্য। কেউ কেউ মনে করেন ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি সময়কে জয় করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন এবং আশ্চর্যজনক ভাবে হাজার হাজার বছর ধরে স্বশরীরে বিরাজ করছেন এই পৃথিবীতে। একাধিক বার তার সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হয়েছেন একাধিক সাধক।

শোনা যায় হিমালয়ের এক দুর্গম স্থানে শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে দীক্ষা দিয়েছিলেন

স্বয়ং মহাবতার বাবাজি। পরমহংস যোগানন্দ তাঁর 'অটো বায়োগ্রাফি অফ এ যোগী' বইয়ে মহাবতার বাবাজির সঙ্গে তাঁর দর্শনের কথা বলেছেন।

বিভিন্ন মার্গের যোগী একাধিকবার মহাবতার বাবাজির তাঁদের সামনে আসার কথা বলেছেন। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে মহাবতার বাবাজির রহস্যময় উপস্থিতির কথা সবাই স্বীকার করেছেন।

বাবাজির জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে মনে করা হয় তামিলনাড়ুর কোনো এক গ্রামে তার জন্ম। তবে তার সঠিক বয়স নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। কারওর মতে পাঁচ তো কারওর মতে দুহাজার বছরের কিছু বেশি তাঁর বয়স। যোগবলে তিনি তারুণ্যকে ধরে রেখেছেন তাই দেখলে মনে হয় এক যুবক। বাবাজির ইচ্ছে না থাকলে তাকে দর্শন করা যায় না। তিনি ঝড়ের গতিতে প্রকট হন, আবার মহাশূন্যে মিলিয়ে যান। কেউ কেউ বলেছেন আদি শঙ্করাচার্যেরই এক অন্য রূপ মহাবতার বাবাজি। কারণ আদি শঙ্করাচার্যও পূর্বাশ্রমে দক্ষিণের বাসিন্দা ছিলেন। আবার একদল সাধক দাবি করেন গুজরাতের স্বামী নারায়ণই মহাবতার বাবাজি।

লোকবিশ্বাস, হিমালয়ের কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে রয়েছে জ্ঞানগঞ্জ নামের এক স্থান। আর সেখানে আছে একটি রহস্যময় মঠ। যেখানে সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। বাবাজি সেই মঠেই থাকেন, শুধু তাই নয় তিনি জ্ঞানগঞ্জের আচার্য। সূক্ষ্ম দেহে তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন আবার প্রয়োজন হলে নিজ দেহ ধারণ করে প্রকট হন। তবে তাঁর দর্শন অতি দুর্লভ ঘটনা এবং তাঁর দর্শন পাওয়া তাই সৌভাগ্যের। হাতে গোনা কয়েকজন আজ অবধি তাঁর দর্শন করতে পেরেছেন। কিছু রহস্য হয়তো আজীবন রহস্যই হয়ে থেকে যায়, কারণ তার খোঁজ শেষ হয় না। মহাবতার বাবাজিও তেমন একটি খোঁজ।

এবার আমরা একটু মহাবতার বাবাজির সন্ধানে যাব উত্তরাখণ্ডের কুকুছিনা গ্রামে। বেড়ানোর জায়গা হিসেবে কুকুছিনা কোনোভাবেই জনপ্রিয় নয়। অতএব অনেকেই প্রথমবার এই নাম শুনলেন। কুকুছিনার যেটুকু নামডাক আছে তা কিন্তু তার আধ্যাত্মিকতার জন্য। যারা হিমালয়ের অলৌকিক বিষয় তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন তারা এই অঞ্চলের নাম জেনে থাকবেন। হিমালয়ের রহস্য আর আধ্যাত্মিকতা—এই দুইয়ের টানেই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কুকুছিনায় মানুষজন ছুটে আসেন। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কুকুছিনার। পাহাড়-জঙ্গল-ঝরনা-ফুল-পাখি কী নেই। সব যেন কোনো শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মতো। হাজার হাজার বছর আগের জনপদ কুকুছিনা। আজও এই প্রাচীন জনপদ দণ্ডায়মান।

'কুকুছিনা' নামের একটা ইতিহাস আছে। পাণ্ডবরা তখন অজ্ঞাতবাসে। তাঁদের খুঁজে বের করতে চতুর্দিকে ছুটল কৌরব সেনারা। এদিকে পাণ্ডবরা ঘুরতে ঘুরতে উত্তরাখণ্ডের এক প্রান্তিক গ্রামে পৌঁছোল। কৌরবদের ধাওয়া করাই সার হল। পাণ্ডবদের খোঁজ পেল না কৌরবরা। এদিকে পাণ্ডবরা হেঁটে চলেছে পাহাড়ি পথ ধরে। যেতে যেতে তাদের পথ শেষ হল একটা গ্রামে। যে গ্রামের পরে শুধুই দুর্গম পাহাড় আর গভীর অরণ্য। পাণ্ডবরা সেই গ্রামে দেখল নানান অলৌকিক কর্মকাণ্ড চলছে।

সেই রহস্যময় অঞ্চলেই আত্মগোপন করল পাণ্ডবরা। অন্যদিকে কৌরবরাও ছাউনি বানিয়ে শুরু করল পাণ্ডবদের খোঁজ। কৌরবরা তন্ন তন্ন করে পাহাড়ের চারপাশ খুঁজে শেষে নিরাশ হল। কৌরব সেনারা শুরু করল জঙ্গল অভিযান। কিন্তু কোনো লাভ হল না। কেউ-ই হদিশ পেলেন না পাণ্ডবদের।

এই রহস্যময় গ্রামে পাণ্ডবদের ছাউনি থেকে জায়গার নাম হয় কুকুছিনা। ছাউনি শব্দ স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় 'ছিনা" হয়ে যায়। অন্যদিকে স্থানীয় কিছু গাড়োয়ালবাসী বলেন কৌরব ছাউনি থেকেই গ্রামটির নাম হয়ে যায় 'কুকুছিনা।" 'কৌরব' স্থানীয় ভাষায় হয়ে যায় 'কুকু' এবং 'ছাউনি' থেকে 'ছিনা'হয়ে যায়।

যারা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ নিয়ে চর্চা করেন তারা একবার হলেও অতি অবশ্যই ঘুরে দেখুন কুকুছিনা। যারা গতানুগতিক ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন না, হিমালয়কে অন্যভাবে আবিষ্কার

করতে চান তারা দুটো দিন ঘুরে দেখুন কুকুছিনা। কলকাতা থেকে কাঠগুদামের পথে হলদুয়ানি স্টেশনে নেমে সেখান থেকে রানিখেত। ট্রেন পাবেন হলদুয়ানি পর্যন্ত। সেখান থেকে রানিখেত। রানিখেত থেকে দ্বারাহাট। কাছাকাছি পন্থনগর বিমানবন্দরেও প্লেন ওঠা-নামা করে। সেখান থেকেও হলদুয়ানি আসা যায়। তারপর পাহাড়যাত্রা। হলদুয়ানি থেকে রানিখেত ৫৭ কিলোমিটার। রানিখেত থেকে দ্বারাহাট ৩২ কিলোমিটার। দ্বারাহাট থেকে কুকুছিনার দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার। সবমিলিয়ে ১০৩ কিলোমিটার রাস্তা। সরাসরি বাস যায় দিনে একবার। গাড়িও ভাড়া নেওয়া যায়। কিন্তু অর্থের সাশ্রয় ও আকর্ষণীয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পেতে চাইলে তিন খেপে তিন বার গাড়ি বদল করে নিন। চাইলে রানিক্ষেত পর্যন্ত বাস, তারপর দুবার গাড়ি বদল। এই ভাবে বদলে বদলে গেলে একটা আলাদা অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

চারপাশের পাহড়ি গ্রামের কেন্দ্রস্থল দ্বারাহাট। জায়গার নাম শুনেই বুঝতে পারছেন 'দ্বারাহাট' মানে 'হাট' বা বাজার। পাহাড় ডিঙিয়ে প্রায় বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় স্থানীয়দের বাজার করতে। প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিসপত্র কিনতে আশপাশের গ্রামের মানুষ এই দ্বারহাটে আসেন।

ইচ্ছে করলে এই পাহাড়ি গঞ্জে এক রাত কাটিয়ে নিতে পারেন। হোটেল আছে। আগে থেকে যোগাযোগ থাকলে আশ্রয় মিলতে পারে যোগানন্দ আশ্রমে। 'অটো-বায়োগ্রাফি অফ যোগী' বইটা যাঁদের পড়া অথবা পরমহংস যোগানন্দ সম্পর্কে কিংবা 'ক্রিয়াযোগ' বিষয়ে যাঁরা অবগত, তাঁরা এই আশ্রম বিষয়ে অপরিচিত নন। 'মহাবতারবাবা'র কথাও তাঁদের জানা। আশ্রমে থাকলে অনেক অজানা বিষয় জেনে নিতে পারবেন আপনি।

যোগানন্দ আশ্রমে কাটিয়ে যাওয়া যাক কুকুছিনার পথে। দ্বারাহাট থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ধুধৌলিতে একটি সরকারি অতিথিশালা আছে। সেখানে থাকতে পারেন। কুকুছিনা থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে দুনাগিরি মাতার মন্দির। রাস্তা থেকে একটু ওপরে। নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত নানা মাপের শয়ে শয়ে ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টা দেখতে দেখতে ৫০০ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠু পড়ুন। এখানকার মানুষের কাছে দুনা গিরিমা অত্যন্ত জাগ্রত। পুজো দিন। মন্দির থেকে চারপাশ দুচোখ ভরে দেখুন। হিমালয়ের রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবে। মন্দির লাগোয়া হলঘরে দিনভর চলছে ভাণ্ডারা। চাইলে দুমুঠো খেয়ে নিতে পারেন। লুচি, পুরি, সবজি ও হালুয়া। চাইলে অনুদান দিতে পারেন। না দিলেও ক্ষতি নেই। কর্তৃপক্ষের কোনো দাবি নেই। তারা খাইয়েই সন্তুষ্ট।

কুকুছিনাতে থাকার বিখ্যাত জায়গা জোশীজির গেস্ট হাউস। গেস্ট হাউসের ঘর বেশ আরামপ্রদ। সঙ্গে 'ইকোফ্রেন্ডলি'। বিদেশি ধাঁচের কটেজও আছে গেস্ট হাউসে। আপনি এখানে এসে অবাক হবেন এটা দেখে যে হিমালয়ের রহস্য আর আধ্যাত্মিকতার টানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কত মানুষ এসেছেন।

হাতে সময় নিয়ে গেস্ট হাউস ঘুরে দেখুন। গেস্ট হাউসে আছে বিরাট একটি প্রার্থনাকক্ষ। আছে মেডিটেশন রুম সেখানে আপনি চাইলে চুপ করে মেডিটেশন করতে পারেন। নির্দিষ্ট কোনো দেবদেবীর পুজো হয় না জোশীজির প্রার্থনাকক্ষে।

জোশীজির গেস্ট হাউসের দেয়ালে টাঙানো আছে মহাবতার বাবাজির চিত্র। একজন জানালেন চিত্রটি কাল্পনিক। শুধু মহাবতার বাবাজিই নয়, মহাবতার বাবাজির শিষ্য আর তাঁদের শিষ্যদেরও ছবি আছে। জ্ঞানগঞ্জ নিয়ে যারা দীর্ঘ পড়াশোনা বা চর্চা করেছেন তারা মহাবতারবাবাজির অনেক শিষ্য এবং তার শিষ্যদের অনেকের ছবি দেখে চিনতে পারবেন। আছে যিশুখ্রিস্টের ছবি!

গেস্ট হাউসের কর্ণধার গিরিশ জোশীর কথায়, "এখানকার মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী মহাবতার যোগী প্রাচীন ক্রিয়াযোগ চর্চার মাধ্যমে অবিনশ্বর শরীর ধারণ করেছেন। আড়াই হাজার বছর ধরে তিনি এই জঙ্গল, পর্বতের গুহায় অবস্থান করছেন। তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদে ভক্তরা কখনো কখনো তাঁর দর্শন পেয়েছেন বলেও শোনা গেছে।"

জোশীজির অতিথিনিবাসের ঠিক উলটো দিকের পাহাড়ে আছে 'বাবাজি কা গুহা'। হাতে সময় নিয়ে দেখতে যাবেন গুহা। পাহাড়ি ঝরনা ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে তিন কিলোমিটার গিয়ে বাবাজি কা গুফা। যাঁরা ট্রেক করতে ভালো বাসেন, তাঁদের বেশ ভালো লাগবে। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে বাবাজি কা গুফা দেখতে যান। প্রায় ঘণ্টা চারেক সময় নিয়ে বের হবেন। শুকনো খাবার আর জল নেবেন।

আপনি কিছুটা পথ চলার পর দেখবেন একটি পাহাড়ি কুকুর আপনার সঙ্গ নিয়েছে। প্রথমে আপনি অবাক হবেন না, কিন্তু কিছুক্ষণ পথ চলার পর আপনি ভাবতে বাধ্য হবেন। দেখবেন কুকুরটি কিছু একটা দিকনির্দেশ করছে। আপনি সামান্য সময় থেমে যান, তারপর আবার কুকুরটির দেখানো পথ ধরে এগিয়ে চলুন। আপনি ওই কুকুরটির দেখানো পথ ধরে গেলে পৌঁছে যাবেন বাবাজি কা গুফা। আশ্চর্যের বিষয় কুকুরটি আপনাকে পথ দেখাতে দেখাতে কেন বাবাজির গুহার কাছাকাছি পৌঁছে দিচ্ছে? সে জানল কীভাবে আপনি বাবাজি কা গুফা-তেই যাচ্ছেন? আশ্চর্য হওয়া আরও বাকি আছে। কুকুরটি গুহার কাছাকাছি এসেই হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপনি অনেক খুঁজেও আর সেই কুকুরটিকে দেখতে পাবেন না। এ যেন মহাপ্রস্থানের পথে আপনি স্বয়ং যুধিষ্ঠির!

এই মহাভারতীয় অত্যাশ্চর্য দর্শনের জন্য কুকুছিনায় এসে আপনাকে বাবাজি কা গুহা দর্শনে যেতেই হবে। নিজে অনুভব করুন গায়ে কাঁটা দেবে আপনার।

বাবাজি কা গুহা আপনাকে বাইরে থেকে দেখতে হবে। কারণ ভেতরে যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে কারণে যাওয়ার আর উপায় নেই। পাঁচিল তুলে গুহার মুখ পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকবিশ্বাস, এই গুহার ভেতরেই নাকি পাণ্ডবদের যুদ্ধাস্ত্র রাখা আছে। একথা শুনে আপনি চমকে উঠবেন। আর আপনার অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মন গুহার ভেতরে প্রবেশ করার উপায় খুঁজতে থাকবেন। কিন্তু কোনো লাভ নেই। আপনি কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনার সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে মহাবতারবাবাজি মনে মনে হাসবেন।

বাবাজি কা গুহা যে পাহাড়ে তার মাথায় রয়েছে মহাবতারবাবার শিষ্য বলবন্ত গিরির আশ্রম—নাম, 'পাণ্ডব খোলি'। পাণ্ডবরা নাকি সেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বলবন্ত গিরির শিষ্য রাম সিং আশ্রম দেখাশোনা করেন। পাণ্ডব খোলির ওপরে ধীরে ধীরে উঠতে হবে। হাঁটা পথই ভরসা। কুকুছিনা থেকে সকালের দিকে বেরিয়ে হাতে সময় নিয়ে দেখতে যান পাণ্ডব খোলি। কারণ আপনার সবমিলিয়ে সময় লাগবে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। চাইলে আশ্রমে রাত কাটাতে পারেন।

কুকুছিনায় প্রচুর বিদেশি দেখতে পাবেন। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা হয় আর সেই চর্চার জন্য এই কুকুছিনাতেও ছুটে আসেন শয়ে শয়ে বিদেশি। যে জায়গার নাম ভারতেরই প্রচুর মানুষ জানেন না সেই জায়গায় এত বিদেশি এসে ক্রিয়াযোগ শিখছেন শুনলে আপনাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে।

কুম্ভমেলায় যেমন হরেক রকম বাবাজি পাইলটবাবা, যোগীবাবা, গন্ধবাবাদের দেখতে পান, কুকুছিনাতেও আপনি পাবেন হরেক রকম বাবাজি-মাতাজি। দেখা মিলবে 'রাশিয়ানবাবা'র, যিনি সুদূর রাশিয়া থেকে এ-দেশে এসে গেরুয়া ধারণ করেছেন। পাহাড়ে জঙ্গলে আধ্যাত্মিকতার পাঠ নিয়েছেন। আশ্চর্য হবেন তিনি সংস্কৃতে কথা বলছেন কিংবা হিন্দি জানেন। এমনকি চোস্ত গাড়োয়ালি ভাষায় কথা বলছেন। শুধু রাশিয়ানই বা বলি কেন, দেখা মিলবে আমেরিকানবাবা, আফ্রিকানবাবা, ফ্রেঞ্চবাবা, চাইনিজবাবা। এরা সবাই কুকুছিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথবা সাধনা করছেন।

দলে দলে বিদেশিরা আসেন এখানে 'ক্রিয়াযোগ'-এর চর্চা করতে। শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা নিজের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই বিশেষ পদ্ধতিকে এককথায় ক্রিয়াযোগ' বলে। মহাবতারবাবার কাছ থেকে তাঁর শিষ্যরা এই বিদ্যা শিখেছিলেন। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের মাধ্যমে 'ক্রিয়াযোগ' অনেক মানুষের

কাছে পৌঁছোয়। 'ক্রিয়াযোগ'কে অনেক যোগী অনেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইদানীং পাহাড়কে নতুনভাবে আবিষ্কারের প্রবণতা অনেকটাই বেড়েছে। বেড়েছে তরুণ প্রজন্মের হিমালয় প্রেম। একটা অন্য রকম অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিতে তাই বহু মানুষ ছুটে যাচ্ছেন হিমালয়। ক্রিয়াযোগের টানে। আধ্যাত্মিকতার টানে। আর একশ্রেণির ভক্তিপ্রবণ মানুষের জন্য বাড়ছে অধ্যাত্ম-পর্যটন। আর যে পর্যটনের জেরে সংস্থান হচ্ছে স্থানীয় মানুষের রুজিরোজগার।

কেউ যদি এইসব আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহী না হন, তা হলেও কুকুছিনায় এসে তিনি বেশ প্রশান্তি অনুভব করবেন। দু'চোখ ভরে প্রাকৃতিক মাধুর্যকে উপভোগ করতে পারবেন। দেখবেন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত। মন ভরে যাবে।

আর আধ্যাত্মিকতার টানে আসা মানুষ ক্রিয়াযোগের কথা ভাবতে ভাবতে নির্জন পাহাড়ি গ্রামে হারিয়ে যেতে চাইবেন। চমক ভাঙলে দেখবেন নিজের মধ্যে এক অদ্ভুত শূন্যতা গ্রাস করেছে আপনাকে। পাখির ডাক অদ্ভুতভাবে শুনতে শুনতে কেমন যেন অস্থির হয়ে যাবেন। আর ভাববেন বেদান্তের সেই আমোঘ লাইন, "জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা, নাকি জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।"

মহাবতারবাবাজির আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না যদি না শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়েরকথা বলি। শ্যামাচরণ অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের নদিয়া জেলার ঘূর্ণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখন কৃষ্ণনগর শহরের একটি পাড়া সেটি। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবার।

শিশু অবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। শ্যামাচরণের মা ভগবান শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শ্যামাচরণের সম্পর্কে খুব কম জানা যায়। শোনা যায় যখন তার তিন-চার বছর বয়স তখন একদিন তিনি গলা অবধি বালিতে সমাহিত হয়ে ধ্যানে বসেছিলেন। তা দেখে বন্ধুবান্ধবরা চমকে যায়। এইধরনের বিভিন্ন ধ্যান শ্যামাচরণ প্রায়শই করতেন। এদিকে প্রবল বন্যায় শ্যামাচরণের পূর্বপুরুষের বাড়ি গেল নষ্ট হয়ে। শ্যামাচরণের বয়স তখন পাঁচ।

শ্যামাচরণের পরিবার চলে গেল বারাণসীতে। আর প্রাচীন কাশী নগরীতেই শুরু হল নতুন জীবন। জানা যায় তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয় কাশীতেই। কাশীতে বসবাসকালীন শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মসাধনায় বিশ্বাসী তাঁর পিতা গৌরমোহন, যিনি নিজে প্রত্যহ ঋগবেদ পাঠ করতেন, বালক শ্যামাচরণকে বেদজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নাগভট্টের কাছে কিছুকাল বেদশিক্ষার্থী রূপে পাঠান। গঙ্গায় স্নান করে বেদ পাঠ এবং পুজো তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের অংশ ছিল। গৌরমোহন প্রাচীন ধর্ম সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হলেও শ্যামাচরণকে শিশুকাল থেকেই উর্দু এবং হিন্দি অধ্যয়ন করান, পরে সরকারি সংস্কৃত কলেজে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি, ফরাসি এবং ইংরেজি শিখতে পাঠান।

১৮৪৬ সালে শ্যামাচরণের বিয়ে ঠিক হয় কাশীমনির সঙ্গে। তাঁদের দুই পুত্র ছিল, তিনকড়ি ও দুকড়ি। আর ছিল তিন কন্যা, হরিমতি, হরিকামিনী এবং হরিমোহিনী। শ্যামাচরণের দুই পুত্রও সাধনমার্গের পথেই জীবন অতিবাহিত করেন। শোনা যায়, সাধুসন্ত হিসেবে তাঁদেরও বেশ নামডাক ছিল বেনারসে।

১৮৬১ সালে, শ্যামাচরণকে হিমালয়ের পাদদেশে রানিখেতে বদলি করা হয়। একদিন, পাহাড়ের পথে হাঁটছেন শ্যামাচরণ। সেসময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কেউ একজন তাঁকে ডাকছে। প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও কিছুক্ষণ পর তিনি শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। আবার কিছু সময় পর শুনতে পেলেন সেই একই কণ্ঠস্বর। আরও খানিকটা পথ ওপরে ওঠার পর দেখলেন এক সৌম্য পুরুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্যামাচরণ থামলেন। প্রণাম জানালেন সৌম্যকে।

শ্যামাচরণের কথায় এই সৌম্য গেরুয়াধারীই মহাবতার বাবাজি। মহাবতার বাবাজি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দীক্ষা দিলেন। শ্যামাচরণের কথায়, "মহাবতারবাবাজি আমাকে ক্রিয়াযোগের বিভিন্ন কৌশল শেখালেন। আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তারপর আমায় বললেন, বাকি জীবনটি ক্রিয়াযোগের কথা প্রচারের জন্য উৎসর্গ করতে।

আমি ওনার কথামতো বেনারসে ফিরে গেলাম, সেখানে সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াযোগের মার্গ অন্বেষণ শুরু করলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হল। বুঝতে পারছিলাম এএক অদ্ভুত বিচিত্র পথের সন্ধান দিয়েছেন মহাবতারবাবাজি। আমার কাছ থেকে ক্রিয়াযোগ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচুর পরিমাণে লোক আসতে লাগল। লোকজনের চাপে ছোটো ছোটো সভা সংগঠিত করতে শুরু করলাম। এই নিয়ে বেশ চলছিল। কিন্তু পরে আমি উনার অনেক খোঁজ করি ওই পথে, কিন্তু মহাবতারবাবাজির দেখা পায়নি।"

ক্রিয়াযোগ ছাড়াও ভগবত গীতার ওপর শ্যামাচরণ "গীতা সভা"তে নিয়মিত ভাষণ দিতে যেতেন। জাতিগত বৈষম্য সে-যুগে বেশ শক্তিশালী ছিল। সবাই চাইলেই সব কিছু করতে পারতেন না। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান নির্বিশেষে শ্যামাচরণ সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষজনকে উন্মুক্তভাবে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন, "তোমরা এতদিন ধরে যা অনুশীলন করছ তা যেমনভাবে থাকার সেভাবেই থাকবে। তার সঙ্গে ক্রিয়াযোগের কোনো সম্পর্ক নেই। মুক্তপুরুষ হয়ে যোগসাধনা করবে, নিজস্ব ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলা নিজস্ব ব্যাপার।"

১৮৮৬ সালে পেনশনে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি কর্মজীবনে হিসাবরক্ষক ও তাঁর পরিবারের দায়িত্বভারের দ্বৈত ভূমিকা এবং ক্রিয়াযোগের শিক্ষকতাকে অব্যাহত রাখেন।

বহু মানুষ, ভক্ত, সাধক তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। বেশির ভাগ সময় তিনি তাঁর বৈঠকখানা ঘরে থাকতেন। সবার জন্য দর্শন অবারিত ছিল। তিনি মাঝে মাঝেই পরম চৈতন্য সমাধির স্পন্দনহীন অবস্থা প্রদর্শন করতেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি সাধারণ মানুষকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যোগদীক্ষা দেন। মালি, পোস্টম্যান, রাজা, মহারাজা, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণ থেকে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান, পারসি নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষদের দীক্ষা দেন। তাঁর নাম হয়ে যায় "যোগীরাজ"।

সে-সময়ে, একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে সববর্ণের মানুষের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা সহজ ছিল না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও বেশ কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু শ্যামাচরণ তা পেরেছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে পঞ্চানন ভট্টাচার্য, যুক্তেশ্বর গিরি, প্রণবানন্দ, কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং পরমহংস যোগানন্দের পিতামাতা ছিলেন। অন্যান্য যাঁরা শ্যামাচরণের থেকে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন বেনারসের ভাস্করানন্দ সরস্বতী, দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী, বেনারসের মহারাজা ইশ্বরীনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও তাঁর পুত্র।

ডঃ অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বই 'পুরাণ পুরুষ' গ্রন্থে, লাহিড়ীর ২৬টি গোপন ডায়েরির একটি অধ্যায়ের ওপর ভিত্তি করে লেখেন, শ্যামাচরণ শিরডির সাঁইবাবাকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেছিলেন। এ-কথা শুনে অনেকেই চমকে যান।

শ্যামাচরণ তাঁর শিষ্য, পঞ্চানন ভট্টাচার্যকে ক্রিয়াযোগ শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য কলকাতায় একটি সংস্থা চালু করার কথা বলেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয় আর্য মিশন ইন্সিটিটিউশন। সেখান থেকে শ্যামাচরণের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বই, গীতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ নিজে বাংলা ও হিন্দিতে গীতা থেকে উদ্ধৃত অংশ নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করেন। শ্যামাচরণ সে-যুগে গীতার হাজার হাজার কপি বই মুদ্রণ করান ও বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন। সে সময়ে এটি একটি বিরল কাজ ছিল।

১৮৯৫ সালে তিনি তাঁর শিষ্যদের একত্রিত করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারেন যে তিনি শীঘ্রই শরীর ছেড়ে যাবেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি কেবল বলেছিলেন, "আমি বাড়ি যাচ্ছি, সান্ত্বনা পাও, আমি আবার আসব।" এর পর উত্তর দিকে তিনি তাঁর শরীরকে প্রায় তিন বার ঘোরান এবং শরীর ত্যাগ করে "মহসমাধি" নেন। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৯৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন।

শোনা যায় শ্যামাচরণ লাহিড়ী ছবি তুলতে দিতেন না। তিনি একবার মাত্র ছবি

তুলিয়েছিলেন বা কেউ কেউ বলেন আঁকার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর একটিমাত্র ছবিই তাই চিরপরিচিত। সেটিই একমাত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বর্ণনা অনুযায়ীই একবার এক আর্টিস্ট এঁকেছিলেন মহাবতারবাবাজির একটি মাত্র ছবি। যা আজও আমাদের কাছে মহাবতার বাবাজির একমাত্র ছবি বলেই পরিচিত। সেই রহস্যময় মহাবতার বাবাজির ছবির দিকে অনেকটা সময় তাকিয়ে থাকুন তারপর দেখুন কী হয়!

রহস্যে ঘেরা মানস-কৈলাস

ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানেও প্রতিবছর কয়েকশো তীর্থযাত্রী কুমায়ুন হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করে। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় থেকে ৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আসকোট। তারপর চুলা হাইওয়ে ধরে প্রচুলা পর্যন্ত। তারপর বাকি অংশ কৈলাস মানস সরোবর রোডে লিপুলেখ গিরিপথ পর্যন্ত মোট ১৮০ কিমির যাত্রা। গিরিপথ থেকে সরোবরের দূরত্ব ৯০ কিমি।

৬০০ কিমির অধিক দীর্ঘ পথ এটি। আপনি প্রথমে বিমানে দিল্লি থেকে কাঠমান্ডু চলুন। তারপর নেপাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে প্রবেশ করতে পারেন। কৈলাস ও মানস সরোবর পশ্চিম তিব্বতে অবস্থিত।

কৈলাস গ্যাঙ্গডিস পর্বতের চূড়া, যা তিব্বতের হিমালয় পর্বতমালার একটি অংশ। এটি এশিয়ার বৃহৎ সিন্ধু নদী, শতদ্রু নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ প্রভৃতি প্রাচীন নদীগুলোর উৎসস্থান। একে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং 'বন' ধর্ম—এই চারটি ধর্মের তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৈলাস পর্বতের কাছেই তিব্বতের মানস সরোবর এবং রাক্ষসতাল অবস্থিত।

সংস্কৃতে কেলাস বা Crystal শব্দটি থেকে কৈলাস কথাটির উৎপত্তি। কারণ বরফে ঢাকা কৈলাসকে দেখে মনে হয় স্ফটিক। তিব্বতি ভাষায় এর নাম গাঙ্গো রিনপোচে। তিব্বতে বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবাকে বলা হয় রিনপোচে। তাঁর থেকেই নামকরণ হয়েছে কৈলাস পর্বতের। অর্থ হল বরফের তৈরি দামি রত্ন।

এটি অত্যন্ত পবিত্র একটি হ্রদ। বৌদ্ধধর্মানুসারে ত্রিপিটকে বর্ণিত পালি ভাষায়, 'অনবতপ্ত" বা। 'অনোতত্ত' হ্রদ হল মানস সরোবর। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে এই মহাপবিত্র হ্রদের কাছেই মায়াদেবী সিদ্ধার্থকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

কৈলাস পাহাড়ের আবহাওয়ায় এমন কিছু আছে যাতে নাকি মানুষের চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ দ্রুত ফুটে ওঠে। সাধারণভাবে মানুষের নখ-চুল যে হারে বাড়ে কৈলাস পাহাড়ে অন্তত ১২ ঘণ্টা কাটালে নাকি এই বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরকমই হাজারো বিস্ময়ের ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধ্যানস্থ মহাদেবের আবাস কৈলাস পর্বত।

কৈলাস পর্বতকে দেবাদিদেব মহাদেবের আবাস বলে বর্ণনা করেছে হিন্দু পুরাণ। ২২০০০ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট এই পর্বত তার চেহারার দিক থেকেও স্বাতন্ত্রপূর্ণ। তার ওপরে এই পর্বতের সন্নিহিত মানস সরোবরের অবস্থান একে অন্য মহিমা দান করেছে। সবমিলিয়ে কৈলাস এক দুর্লভ তীর্থ। কিন্তু কৈলাসের রহস্যময়তাও কিছু কম নয়। কৈলাস সংক্রান্ত আলোচনায় বার বার উঠে এসেছে এমন কিছু রহস্য, যার সমাধান সম্ভব হয়নি কোনো কালেই।

দেখা যাক কৈলাস-রহস্যের কয়েকটি বিষয়।

এই কৈলাস পর্বতকে মানুষের তৈরি বলেও জানিয়েছেন অনেকেই। কোনো গোপন কাল্টের উপাসনাস্থল হিসেবে তাঁরা কৈলাসকে ব্যক্ত করেন। খুঁটিয়ে দেখলে কৈলাসের আকৃতি যে পিরামিডের মতো তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

পশ্চিম তিব্বতের এই পর্বত কেবল হিন্দুদের কাছেই নয়, জৈন, বৌদ্ধ, তিব্বতের প্রাচীন 'বন' ধর্ম—সব ক'টিই কৈলাসকে পবিত্র বলে মনে করে। কৈলাস পর্বতকে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈনধর্মের পবিত্র স্থান হিসেবে মানা হয়। আর হিন্দুরা মনে করে যে, দেবাদিদেব মহাদেব ওখানেই বাস করেন। বৌদ্ধরা মনে করে—কৈলাস পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা বুদ্ধ, আর জৈনরা মনে করে—তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ এখানেই শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। যে এই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে তারই নাকি মৃত্যু হয়েছে। শোনা যায়—কয়েক শতাব্দী ধরে বেশ কয়েকজন বেপরোয়া পর্বতারোহী কৈলাসে ওঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু অদ্ভুতভাবে তারা উধাও হয়ে যান।

কৈলাস পর্বত সম্পর্কে শোনা যায় এই পর্বতে কেউ নাকি উঠতে পারে না, এটাই এই পর্বতের বিশেষত্ব। অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করা গেলেও কৈলাসে আরোহণ অসম্ভব,

অনেকেই চেষ্টা করেছেন, তবে পারেনি কেউই, কিন্তু কেন?

১৯৯৯ সালে রাশিয়ার ডাক্তার মুলদাশিক কৈলাস পর্বতের রহস্য উন্মোচনের জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে কৈলাস পর্বতের আশেপাশে বেশ অনেকদিন অতিবাহিত করেন। ডাক্তার মুলদাশিফ কৈলাস থেকে ফিরে ফিরে এসে একটি বই লেখেন-'Wheree dowe come from' যেখানে কৈলাস সম্পর্কে অনেক কথা লেখেন তিনি। তিনি লেখেন- কৈলাস পর্বতে প্রাচীন একটি পিরামিড আছে যেটি ছোটো ছোটো আরও অনেক পিরামিড দিয়ে ঘেরা। এটির সূত্র মেক্সিকোর টেওটিহুয়াকান ও গিজা পিরামিডের সঙ্গে যুক্ত।

এক ব্রিটিশ গবেষক মানস কৈলাসের তদন্ত করার পর জানান—পিরামিড দিয়ে তৈরি এই পাহাড়ে রাতের নিস্তব্ধতায় পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি আজব ফিশফিশের শব্দ আসে। কোনো এক রাতে কৈলাস পাহাড়ের ভেতর থেকে পাথর পড়ার আওয়াজ আসে। উনি আরও লেখেন—'কৈলাস পর্বতের এলাকা সোজাসুজি পৃথিবীর জীবনের সঙ্গে জড়িত। যখন তপস্বীদের রাজ্য তথা পিরামিড আর পাথরের দর্পণকে মিলিয়ে একটি যোজনাবদ্ধ নকশা বানানো হয় তখন সেটা দেখে হয়রান হয়ে যাই। কারণ সেই নকশা ডি.এন.এ. অণুর স্থানিক নকশা ছিল। কৈলাস পাহাড় নিয়ে গবেষণা করা বৈজ্ঞানিক নিকোলাই রোমনভ জানান— কৈলাস পর্বতের চারিদিকে একটি অলৌকিক শক্তি বয়ে চলে।'

কৈলাস পর্বতে বাস হর-পার্বতীর। হিন্দুধর্মের সনাতন বিশ্বাস। আসুন জেনে নিই এই পবিত্র ভূখণ্ড নিয়ে কিছু কথা। শুধু হিন্দুধর্মই নয়। কৈলাস এবং মানস সরোবর পুণ্যভূমি বলে মনে করা হয় বৌদ্ধ জৈন এবং 'বন' ধর্মবিশ্বাসেও। ভৌগোলিকভাবে কৈলাস পাহাড় আছে তিব্বত মালভূমিতে চিন-তিব্বত ভূখণ্ডে। ছ'টি পর্বত শ্রেণি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ঘিরে আছে কৈলাস পাহাড়কে। ২২ হাজার ফিট উচ্চতার কালো পাথরের এই পাহাড়কে প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর স্তম্ভ বলে মনে করা হয়। যা নাকি ধরে রেখেছে পৃথিবীর ভর। শুধু ভারতেই নয়, ইউরোপের অকাল্টবাদীরা কৈলাসকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে, এখানে নানা ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তির অবস্থান। অনেকেই তাই বিনা বাধায় এটা নেনে নিয়েছেন যে এই কৈলাস যাবতীয় অতিপ্রাকৃতের কেন্দ্রবিন্দু।

পুরাণ অনুযায়ী কৈলাস পর্বতের চারটি পাশ স্ফটিক, চুনি, সোনা এবং লাপিস লাজুলি দ্বারা গঠিত। এই তথ্য নিয়ে নানান বিতর্ক আছে। দিনের বিভিন্ন সময়ে আলো পড়ে এইসব পাথর বা ধাতুর বিভ্রম কৈলাস অবশ্যই তৈরি করে।

কৈলাস অঞ্চলে অবস্থিত হ্রদগুলির আকৃতিও কিন্তু বেশ রহস্যময়। মানস সরোবর পূর্ণ গোলাকার এক জলাশয়। রাক্ষসতালের আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকার। এরা নাকি সূর্য ও চন্দ্রের শক্তিকে প্রকাশ করে।

তিব্বতি তান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী কৈলাসে তাঁদের দেবতা ডেমচমংয়ের আবাস। হিন্দুদের মতে এখানে বাস করেন শিব। জৈন-ধারণায় কৈলাসের বাসিন্দা তাঁদের প্রথম তীর্থঙ্কর। এই তিন ধর্ম অনুসারে কৈলাসে আরোহণ নিষিদ্ধ। কেবল এটুকুই জানা যায়, ১১ শতকের তিব্বতি মহাযোগী মিলারেপাই একমাত্র কৈলাসে আরোহণ করেছিলেন।

সংস্কৃতে 'কৈলাস' থেকে পর্বতের নাম কৈলাস। অনেকে বলেন, 'কেলাস' ইংরেজিতে ক্রিস্টাল অর্থাৎ স্ফটিক শব্দটি থেকে কৈলাস' কথাটির উৎপত্তি। তিব্বতি ভাষায় এর নাম 'গাংস রিনপোচে'। তিব্বতিতে 'গাংস' বা 'কাং' শব্দের অর্থ তুষারশৃঙ্গ; আর 'রিনপোচে' শব্দটি ব্যবহার করা হয় অমূল্য কিছুকে সে ব্যক্তি বা বস্তু, যা-ই হোক সম্মান জানাতে। যে কারণে তিব্বতি ধর্মগুরু পদ্মসম্ভবকে বলা হয় 'গুরু রিনপোচে' অর্থাৎ 'অমূল্য প্রভু'। যা-ই হোক, 'গাংস' আর 'রিনপোচে দুয়ে মিলে কৈলাস' হল 'তুষারের অমূল্য মণি'।

কিংবদন্তি অনুসারে শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মগুরু মহাযোগী মিলারেপাই পা রাখতে পেরেছিলেন কৈলাসশীর্ষে। ফিরে এসে তিনি নিষেধ করেছিলেন এই পর্বত জয় করতে। আধুনিক পর্বতারোহীদের মতে, কৈলাস পর্বতের শীর্ষে ওঠা দুরূহ। পশ্চিম তিব্বতের ৬,৬৩৮ মিটার তথা ২১,৭৭৮ ফুট উঁচু এই পর্বত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং তিব্বতের প্রাচীন 'বন' ধর্ম, সকলের

কাছেই এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। হিন্দু পুরাণে কৈলাস পর্বতকে 'শিবের লীলাধাম' বলা হয়। শিব ও তাঁর সহধর্মিণী দুর্গা এবং তাঁদের অনুচরেরা কৈলাস পর্বতে বাস করেন। জৈনধর্ম অনুসারে, তাদের প্রথম তীর্থংকর আদিনাথ ঋষভদেব কৈলাসে নির্বাণলাভ করেন। ইউরোপের অকাল্টবাদীরা কৈলাস পর্বতকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের মতে, এখানে অতিপ্রাকৃত শক্তির অবস্থান। অনেকের মতে, এই স্থান যাবতীয় অতিপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র। মোদ্দা কথা, বিশ্ববাসীর কাছে কৈলাসের একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে।

কৈলাসের অদূরেই মানস সরোবর, তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে এর দূরত্ব ১,২১৩ কিমি। পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মানসিক শক্তির সাহায্যে এক সরোবর নির্মাণ করেন। ব্রহ্মার মানস-উদ্ভূত, তাই নাম 'মানস সরোবর'। মানস সরোবর পাহাড়ে ঘেরা হ্রদ বটে, তবে এক সমুদ্র বিশেষ। ৪০০ বর্গকিমিরও বেশি এলাকা জুড়ে এর বিস্তৃতি। দেখতে অনেকটা ডিম্বাকার। পূর্ব দিকে সাড়ে ২৫ কিমি, দক্ষিণে ১৬ কিমি, পশ্চিমে প্রায় ২১ কিমি এবং উত্তরে ২৪ কিমি। কোনাকুনি দৈর্ঘ্য সাড়ে ২২ কিমি থেকে ২৫ কিমি। সাগরবক্ষ থেকে ১৫,০৬০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই হ্রদের সর্বাধিক গভীরতা ৩০০ ফুট পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম দিকে রাক্ষসতাল তথা রাবণ হ্রদ ও উত্তর দিকে কৈলাস পর্বত। ১৫,০১০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রাক্ষসতালও কিছু কম যায় না। এর বিস্তৃতি ২৫০ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে।

বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে—'মান্ধাতার আমল'। সেই রাজা মান্ধাতাই নাকি প্রথম মানস সরোবরের সন্ধান পান। এই হ্রদের তটেই তিনি ধ্যাননিমগ্ন থাকেন। তাই তাঁর নামে সরোবরের দক্ষিণ তীরের শৈলশ্রেণির নামকরণ করা হয় মান্ধাতা শৈলশ্রেণি, গুরলা মান্ধাতা। পুরাণ মতে, মানস সরোবর ৫১ সতীপীঠের অন্যতম। দেবীর হস্তখণ্ড পতিত হয়েছিল এই স্থানে। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং 'কুমারসম্ভব'-এ কৈলাস ও মানস সরোবরের উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত নাট্যকার কবি বানভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে মানস সরোবরকে 'পদ্মদিঘি' হিসেবে বর্ণনা করেন। এছাড়া অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও এখানে সাধনা করেছেন।

দেবতাত্মা হিমালয়কে আক্ষরিক অর্থে উপলব্ধি করা যায় একমাত্র মানস-কৈলাসে এলেই। কৈলাসের রহস্য অসীম। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী মানসের রহস্যও কিছু কম নয়। এখানে উল্লিখিত হল মানস-সংক্রান্ত রহস্যের কয়েকটি। মানস সরোবরে রাত কাটাতে এসে অনেকেই দেখেছেন রাতের অন্ধকার আকাশে দু'টি উজ্জ্বল আলো দপদপ করছে। একটু নজর করে দেখা গিয়েছে একটি আলো অন্যটিকে অনুসরণ করছে। সাদা রঙের এই আলোগুলি বিন্দুপ্রতিম। কিন্তু এরা এতটাই উজ্জ্বল যে, এদের দিকে নজর যেতে বাধ্য। মাঝে মাঝে এই আলোর দাক্ষিণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মানস। চোখ ফেরানো কঠিন হয়ে ওঠে তখন সেই সৌন্দর্য থেকে। এই আলোর প্রকৃত সত্য আজও অনাবিষ্কৃত। লোকবিশ্বাস, ভোর রাতে শিব-পার্বতী মানস সরোবরে অবগাহন করতে আসেন। এই আলোর শিখাই আসলে দেবাদিদেব মহেশ্বর ও পার্বতী। আবার কিছু মানুষের বিশ্বাস—আপনি যদি এই আলোগুলি দেখতে পান তাহলে তা হল কৈলাসে আপনার আত্মোপলব্ধি হয়েছে। শিখাদুটি আত্মোপলব্ধির শিখা। যদিও তা মানতে অনেকেই রাজি নন। অতএব এর পেছনে থেকে যাওয়া প্রকৃত সত্য কী তা আজও অনেকের কাছে অজানা।

প্রায়শই অনেকেই ব্রাহ্মমুহূর্তে মানস সরোবরে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছেন, তার তীরে তাঁবুতে বাসরত পুণ্যার্থী-পর্যটকদের অনেকেই। কেউ কেউ সেই সময়ে শুনেছেন গহনার ঝনাৎকারও। কেউ কেউ দাবি করেছেন, তাঁরা সরোবরের জলে আলোড়ন দেখেছেন। কিংবদন্তি অনুসারে ব্রাহ্মমুহূর্তে নাকি সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে সাত ঋষি নেমে আসেন সরোবরের পবিত্র জলে স্নান করতে। এই জলোচ্ছ্বাস নাকি তাঁদেরই দ্বারা সৃষ্ট।

আর একটি বিষয়েও মানস সরোবর অনন্য। খুব খারাপ আবহাওয়াতেও এই সরোবরের জল স্থির থাকে। এমনকি, মানসের যমজ হ্রদ রাক্ষসতাল যখন ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় উত্তাল, মানস তখন একাবারেই স্থির। এই রহস্য ভূবিজ্ঞানীদের যথেষ্ট প্রহেলিকায় রেখেছে দীর্ঘকাল ধরে।

আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি কৈলাস শিব ঠাকুরের বাড়ি। সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব জগজ্জননী মাতা পার্বতীকে নিয়ে থাকেন। সেখানে কার্তিক-গণেশ থাকেন। আরও থাকেন ভূতনাথের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী প্রমুখ। যাই হোক হিন্দুদের চির পবিত্র তীর্থভূমি কৈলাস, সঙ্গে মানস সরোবর। কত সাধু-সন্ত এখানে তপস্যা করেছেন যুগে যুগে। কৈলাস ও মানস সরোবর এখন ভারতের অংশ নয়। কারণ চিন তিব্বত দখলের পর হিমালয়ের ওই অংশ এখন চিনের।

হিন্দুদের প্রাচীনতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদ কৈলাস কিংবা মানস সরোবরের কথা না থাকলেও মেরু পর্বতের কথা আছে। অনেকে এই মেরু পর্বতকেই বেদের দেবতা রুদ্রের আবাস্থল গণ্য করেন। ঋগবেদের রুদ্র শিবেরই সমার্থক। সেকালে সুমেরু পর্বতকে পৃথিবীর মধ্যবিন্দু হিসেবে গণ্য কর হত। পৌরাণিক যুগে এসে আমরা কৈলাস ও মানস সরোবরের নানা বর্ণনা পাই। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে সরযু নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে তার মন থেকে এক সরোবর সৃষ্টি করেছেন, তাই তার নাম মানস সরোবর। সরোবর থেকে নিঃসৃত নদী তাই তার নাম সরযু।

এই মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি হয়েছে মহাপবিত্র চারটি নদী যথাক্রমে: সাংপো বা ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু এবং বর্ণলী বা ম্যাপ ছু। এই বর্ণলী নদী নেপাল হয়ে ভারতে এসে মেশে কালী নদীর সঙ্গে আর কালী নদীর উপনদী হল সরযূ। বাল্মীকি রামায়ণে এসব পৌরাণিক ভাষায় প্রায় হবহু বর্ণিত আছে। মহাভারতের বিখ্যাত রাজা মান্ধাতা প্রথম মানস সরোবরের খোঁজ পান। তিনি সেখানে তপস্যা করেন, তাই তার নামে সরোবরের দক্ষিণ তীরের শৈলশ্রেণির নামকরণ করা হয়, যার নাম গুরলা মান্ধাতা।

এখানে কৈলাসকে দেবাদিদেব শিব জ্ঞানে পুজো করা হয়। তীর্থযাত্রীরা বেলপাতা ধূপ কর্পূর ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যান। এখানে অনেক সাধনগুহা আছে। বহু সাধক এখানে সাধনা করেছেন। তার মধ্যে একজন হলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ। তিনি প্রথম কৈলাসে যান ১৯২৮ সালে, তারপর ১৯৩৬-৩৭ সালে এবং তৃতীয়বার ১৯৪৩-৪৪ সালে। তিনি এখানে সাধনভজন করেন, নৌকো নিয়ে মানস সরোবর ভ্রমণ করেন। তিনি প্রথম বর্ণনা করেন কীভাবে শীতকালে সরোবরের জল জমে যায় আবার কেমন করে সেটা গলে জল উৎপন্ন হয়। তিনি ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু এবং বর্ণলী নদীগুলির উৎসমুখ পরিদর্শন করে তার সঠিক বিবরণ দেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর 'Pilgrims companion to the holy kailas and manasarovar' বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে বের হয় 'Exploration in tibet' তিনি এই অঞ্চলের সঠিক মানচিত্র তৈরি করেন, যেটি সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নির্ভুল বলে গণ্য করে। ১৯৪৯ সালে তার "kailas manasarovar' প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে।

এই পবিত্র মানস সরোবরে স্নান করে তীর্থযাত্রীরা কৈলাস শিখরের দিকে মুখ করে বসে শিবপুজো করে থাকেন।

পুরাণ মতে মানস সরোবর ৫১ পীঠের অন্যতম একটি পীঠস্থান। এই পীঠের দেবী দ্রাক্ষায়ণী ভৈরব অমর। সরোবরের পশ্চিম তীরে একটি ছোটো পর্বতে অনেকগুলি গুহা আছে। তার মধ্যে সব থেকে বড়ো যেটি সেখানে রয়েছে হর পর্বতীর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ। ওপরে একবার বলে এসেছি কোন কোন পুরাণে সুমেরু পর্বতকে কৈলাস পর্বত বলা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণের ৩৯তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—সুমেরু পর্বতে জ্যোতিস্থল নামে এক রত্নময় বিচিত্র শৃঙ্গ আছে। ওই শৃঙ্গ সর্ব লোকের নমস্কৃত, অপ্রমেয় ত্রিলোকবাসীরা এর পুজো করে থাকে। পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব ওই রত্নখচিত গিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। তার পাশেই বসেছিলেন দেবতারা। এছাড়া ছিলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং কৈলাসের রাজা বৈশ্রবণ। সবাই মহাদেবের উপাসনা করেছিলেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুন হিমালয় এবং তিব্বত অঞ্চল জয় করে ওই স্থানের রাজাদের থেকে যজ্ঞের জন্য বহু ধনরত্ন নিয়ে আসেন। ব্যাসদেবও কৈলাসে গিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

নিয়ে কৈলাস ভ্রমণে যান।

কৈলাসের অবস্থান ইয়ালাং-সাংপো সন্ধিতে, এখানেই ইওসিন যুগের মহাদেশগুলো মিলিত হয়েছিলো আর আশেপাশের পাললিক শিলার রূপান্তর ঘটিয়েছিল। এই কংগ্লোমারেটের সঙ্গে শিলার ভার্টিক্যাল জয়েন্ট একত্রিত হয়ে, বরফ আর শিলার গায়ে তৈরি করেছিল একটা স্বস্তিকা। স্বস্তিকা, যেটা পবিত্রতার চিহ্ন, প্রায় সব কয়টি ধর্মে। স্বস্তিকা, যেটাকে গত শতাব্দীতে নাৎসিরা ব্যবহার করেছিল।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে এসেছিলেন যে পদ্মসম্ভব আর প্রথম জৈন হিসেবে খ্যাত তীর্থংকর, দুজনেই এখানে বোধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আঞ্চলিক তিব্বতীয় বনপো ধর্মের মানুষ একে ডাকে নয়তলা স্বস্তিকা পর্বত নামে। এর চূড়াতে কোনো বরফ জমে না, কারণ এটা এতটাই খাড়া। বরফ নীচে পড়ে যায়, গলে যায়, আর উৎপত্তি হয় পবিত্র সেই নদীগুলোর। এই মরুভূমির মতো এলাকাতে এটাই শ্বেতশুভ্র পর্বত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, হিমালয়ের প্রথম ও প্রধান রেঞ্জ হিসেবে।

কেউ এখন পর্যন্ত এর চূড়ায় ওঠেনি, যদিও লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী হাজার হাজার বছর ধরে এই সরোবরের চারপাশে ঘুরেছে, জ্ঞান আর পুনর্জন্মে সুখী হবার আশায়। অনেকেই বারবার অবনত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছে এর চারপাশে যে ৫০ কিলোমিটার ট্র্যাক আছে, সেই পথে হাঁটতে হাঁটতে। পর্বত আরোহণ জগতের বিখ্যাত নক্ষত্র রেইনহোল্ড মাইসনার এর চূড়াতে আরোহণ করার জন্য চায়না সরকারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২০১৫ সালে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার জন্য তিব্বত যাওয়ার দ্বিতীয় নাথুলা পাস খুলে দিয়েছিল চিন। ৫৩ বছর পর পর্যটকদের জন্য খুলে দেয় এই পথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ মিটার উচ্চতায় সিকিমের এই নাথুলা পাসের উদবোধনের কথা চিন সফরের সময় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৩ সালে উত্তরখণ্ডে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই নাথুলা পাস। উদ্বোধনের পর নাথুলা পাস পেরিয়ে তিব্বতে যান ৪৪ জন তীর্থযাত্রী। প্রথম দফায় কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার অনুমতি পেয়েছিলেন ২৫০ জন তীর্থযাত্রী। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বয়স্ক মানুষ বেশি থাকেন। তাই বয়স্কদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয় চিনা দূতাবাস। প্রথম পদযাত্রী হিসেবে নাথু লা পেরোন ভারতের চিনা রাষ্ট্রদূত লে ইউচেং। এই পথের সাহায্যে নাথুলা থেকে কৈলাসের ১,৫০০ কিলোমিটার পথ বাসে যাতায়াত করতে পারবেন তীর্থযাত্রীরা। এই পথ পুরোনোটির থেকে বেশি সুরক্ষিত বলে জানিয়েছেন লে ইউচেং। এর মধ্যেই তিব্বতে শুরু হয়ে যায় নতুন ভারতীয় হোটেল তৈরি, গাইডদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজ। পুরোনো পথে দুর্গমতা সত্ত্বেও গত এক দশকে ৮০,০০০ মানুষ কৈলাসযাত্রা করেন। প্রতি বছর ১৮টি দলে মোট ১০০০ জন তীর্থযাত্রী কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার অনুমতি পান বলে জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। ২৩ দিনের তীর্থে মাথাপিছু খরচ পড়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস এবং সিকিমের নাথুলা দিয়ে মানস সরোবর যাওয়া যায়। ২০১৭ সালে ডোকা লা সমস্যা চলাকালীন নাথুলা দিয়ে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের মানস সরোবর যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয় চিন।

মানস কৈলাস আপনি চাইলেই যেতে পারবেন এমনটা মোটেও নয়। অনেক নিয়ম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পৌঁছোতে হয় কৈলাস। সবচেয়ে বড়ো কথা মহাদেব যদি চান তবেই আপনার যাত্রা সফল হবে।

জাতি-ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে মানস কৈলাস এক বিচিত্র জায়গা। দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যাস্থল। অতএব যখনই কৈলাস যাবেন একগুচ্ছ বিস্ময় আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

রহস্যময় মন্ত্র ‘ওম মণিপদ্মে হুম’

হিমালয়ের পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে গেলে দেখবেন অজস্র জায়গায় একধরনের কাপড়ের চেন ফ্ল্যাগ ঝুলছে। যাকে তিব্বতিরা ‘প্রেয়ার হুইল’ বলে। এই প্রার্থনা পতাকা কারও কারও গাড়িতেও ঝোলানো থাকে। বাইকের সামনে, বাড়ির দরজায় ঝোলানো থাকে। আর সেই ফ্ল্যাগগুলির নান-রঙের ছোট্ট ছোট্ট বক্সের মত অংশটিতে লেখা থাকে “ওম মণিপদ্মে হুম” কথাটি। প্রচুর বৌদ্ধ মনাস্ট্রির দরজায়, মঠের দেয়ালেও লেখা থাকে এই কথাটি। এই কথাটির মানে কী?

হিমালয়ের অজস্র মঠ মনাস্ট্রি ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে আজ ‘ওম মণিপদ্মে হুম’ মন্ত্রটির নেপথ্যের যে বিরাট ইতিহাস ও মিথ লুকিয়ে আছে সেই গল্পেরই কিছু অংশ এটি। কারণ এই শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হলে আস্ত একখানা বই লেখা হয়ে যাবে।

হাজার হাজার বছর ধরে হিমালয়ের উত্তর অংশে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বত নামের রহস্যময় এক রাজ্য। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগের কথা। দুর্গম পর্বতমালা, কঠোর আবহাওয়া, তুষারের শীতলতাসহ সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে, ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, ভারতের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং-এর দুর্গম রাস্তা ধরে ১০৪২ সালে আমাদেরই বাংলাদেশের এক কৃতি সন্তান পৌঁছোলেন তিব্বতে। সঙ্গে সঙ্গে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে তাঁকে অভ্যার্থনা জানাল। সেই ঘোড়সওয়ারদের হাতে তীক্ষ্ণ বর্ষার মাথায় পতপত করে উড়ছে শ্বেত পতাকা, সুর তোলা বাদ্যযন্ত্রে বাজছে স্বাগত বাজনা আর সেই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে পবিত্র মন্ত্র—'ওম মণিপদ্মে হুম।'

তিব্বতের গু-জে-এর রাজা স্বয়ং গার্ড অব অনার দিয়ে বরণ করেছিলেন বাংলার এই জ্ঞানতাপসকে, নাম তাঁর শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ দীপঙ্করের জন্ম বাংলার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে। তাঁকে ‘11th century Tibetan Buddhist master’ বা ‘একাদশ শতাব্দীর তিবেতান বুদ্ধগুরু’ বলা হয়।

ওম মণিপদ্মে হুন মন্ত্রটি বাংলার বজ্রযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের মন্ত্র হলেও বহির্বিশ্বে এই মন্ত্রকে তিব্বতের মন্ত্র হিসেবেই সবাই জানে।

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ শতক থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দ এই ৮০০ বছর ধরে তৎকালীন বাংলায় বৌদ্ধ ভাবধারা বিস্তার লাভ করে। আর সেই সময়ে বাংলায় ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধরা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ‘মহাযান’ ‘এবং অন্যটি ‘হীনযান’। ‘মহাযান’ অর্থ-'মহৎ মার্গ’ অর্থাৎ যে মহৎ পথে যান বা শকট চলে সেই পথ। মহাযানীরা মনে করেন প্রতিটি মানুষের ভেতরেই বুদ্ধ বিদ্যমান। সে বুদ্ধত্ব অর্জন করতে হলে দরকার সাধনা ও জ্ঞানের, প্রজ্ঞার। যে ব্যক্তি বুদ্ধ নির্দেশিত নির্বাণে উপনীত হতে এবং বুদ্ধত্ব লাভে আগ্রহী, সে যে মহৎমার্গ বা উপায় অবলম্বন করে তারই নাম ‘মহাযান’। হীনযানীরা বুদ্ধত্ব লাভে আগ্রহী নয়, তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের এবং তপস্যার মাধ্যমে নির্বাণ লাভে আগ্রহী। এজন্য মহাযানীরা এ মতকে হীন মনে করে। দুটি সম্প্রদায়ের বিভক্তির এটিই মূল কারণ।

৫২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তযুগের পতনের পরে ভারতবর্ষে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ অবনতি ঘটেছিল। গুপ্তযুগের সমাপ্তির পর থেকেই মায়াবিদ্যা ও যৌন-অতীন্দ্রিয়বাদের আদিম ধারণা ভারতীয় ধর্মে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল।

এই ধারণা বৌদ্ধমতকেও প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে অষ্টম শতকে বাংলা ও বিহারে মহাযান বৌদ্ধধর্ম পরিবর্তিত হয়ে ‘বজ্রযান’ নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। বিক্রমপুর বা বিহারের বিক্রমশীলা মঠটি ছিল বজ্রযানী বৌদ্ধদের অন্যতম সাধনমার্গ। একাদশ শতকে এই মঠের বজ্রযানী সাধকগণ তিব্বতে ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাদেরই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। এই বজ্রযানী সম্প্রদায়ের প্রধান মন্ত্র হল, ‘ওম মণিপদ্মে হুম’। যার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় ‘মণিই প্রকৃত পদ্ম। কিন্তু এই মন্ত্রের মাঝেই লুকিয়ে আছে সম্পূর্ণ বজ্রযান তথা বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষা।

‘ওম মণিপদ্মে হুম’ ছয়টি শব্দাংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্কৃত মন্ত্র, যা বৌদ্ধ সভ্যতার

চার হাতওয়ালা ছায়াদেবতা 'অবলোকিতেশ্বর'-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অবলোকিতেশ্বর হলেন বোধিসত্ত্বগণের অন্যতম। যিনি সকল বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রকাশমান করুণার আধার। মূলধারার মহাযান বৌদ্ধধর্মে ইনিই হলেন সর্বাধিক পূজিত বোধিসত্ত্ব এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যতক্ষণ এই পৃথিবীতে একটিও প্রাণী বদ্ধ থাকবে ততক্ষণ তিনি নির্বাণলাভ করবেন না। অবলোকিতেশ্বর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন তিব্বতি ভাষায় তাঁর নাম 'চেনারেজিং'।

তিনি হাতে পদ্ম ধারণ করে থাকেন বলে কখনো 'পদ্মপাণি' হিসেবেও অভিহিত হন। আবার তিনি লোকেশ্বর অর্থাৎ জগতের প্রভু নামেও পরিচিত। তিব্বতি বৌদ্ধধর্মানুসারে অবলোকিতেশ্বর দলাই লামা এবং কারমাপা রূপে জীবকুলের মঙ্গলার্থে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বজ্রযানীগণ বিশ্বাস করতেন দেবদেবীদের করুণা ভিক্ষা করে লাভ নেই। এদের বাধ্য করতে হবে। যে গ্রন্থে এই বাধ্য করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় 'তন্ত্র'। মন্ত্র এবং যন্ত্র -এ দুই হল বজ্রযানের সাধনার উপকরণ। যে কারণে বজ্রযানকে বলা হয় 'তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম'। আর 'যন্ত্র' হল 'মোহিনী প্রতীক', যা সঠিকভাবে আঁকতে হয়। মোহিনী প্রতীক হল 'Religious Symbolism', যা মার্কিন লেখক ড্যান ব্রাউন আধুনিক পাঠকের কাছে অনেকাংশে পরিচিত করে তুলেছেন। আর পদ্মকে বৌদ্ধধর্মে বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বজ্রযানীদের প্রধান দেবী হলেন তারা। ইনি ছিলেন বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের স্ত্রী। মাতঙ্গী, পিশাচী, ডাকিনী, যোগীনি প্রমুখ তুচ্ছ দেবীও বজ্রযানীদের আরাধ্য ছিল। "ওম মণিপদ্মে হুম' মন্ত্রটি বুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাপারমিতার এবং বোধিসত্ত্ব এবং তারাদেবীর মিলনের প্রতীক।

মহাযানী পন্থার অন্যতম দেবী ছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযানীরা বুদ্ধত্ব লাভে আগ্রহী এবং বোধিসত্ত্ব মতবাদে বিশ্বাসী। বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন তিনি, যিনি বারবার জন্মগ্রহণ করেন এবং অপরের পাপ ও দুঃখভার গ্রহণ করে তাদের কামনা বাসনাদূর করেন। মহাযানীপন্থায় যে কয়েকজন বোধিসত্ত্ব রয়েছেন তার মধ্যে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং বজ্রপাণি প্রধান। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বোধিসত্ত্বেরই গুণাবলির মূর্ত রূপ বলে মনে করা হত। বোধিসত্ত্বদের স্ত্রী কল্পনা করা হয়েছিল।

এই দেবীই ছিলেন দেবতাদের প্রকৃত শক্তি। দেবতাকে মনে করা হত সুদূর এবং অজ্ঞেয় এবং দেবীকে সক্রিয় মনে করা হত। মহাযানীরা বিশ্বাস করতেন যে দেবতাকে পেতে হলে দেবীর সাহায্য নিতে হয়। আর তারজন্য প্রধান্য দেওয়া হয়েছিল অতীন্দ্রিয়বাদ।

সে যাই হোক, "তম মণিপদ্মে হুম' মন্ত্রটিকেই বুদ্ধ ধর্মের সকল শিক্ষার বীজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ওম, মা, নি, পদ, মে, হুম এই ছয়টি শব্দাংশের সমন্বয়ে গঠিত মন্ত্রটির প্রতিটি শব্দাংশ আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রদান করে। শব্দগুলো সাধারণত কিছু পবিত্র পাথর, যা 'মণি পাথর' নামে অভিহিত করা হয় তার গায়ে খোদাই করা থাকে। অথবা কাগজ বা কাপড়ে লিখে প্রার্থনাচক্রে বা প্রেয়ার হুইলে লাগানো থাকে। এই মন্ত্রটি চক্রে একবার ঘোরানো হলে এর পর যতবার ঘুরতে থাকে ততবারই মন্ত্রটি উচ্চারিত হয় বলে ধারণা করা হয়। শব্দগুলোকে বিভিন্ন বৌদ্ধ মনাস্ট্রিতে নানাভাবে অনুবাদ করে থাকে।

অনেক ভাষাবিদই মনে করেন যে 'মণিপদ্ম' একটি যৌগিক শব্দ। সংস্কৃতে কোনো বড়ো হাতের অক্ষর না থাকায় মন্ত্রটি অনুবাদ করতে গিয়ে বড়ো ও ছোটো হাতের অক্ষরজনিত কারণে এর ভাবার্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

'মণিপদ্ম'-কে একত্রে 'পদ্মের রত্ন' বা ইংরেজিতে 'লোটাস ইন দ্য জিয়েল' বলা হয়। সংস্কৃতে 'মণি'-কে কখনো কখনো দেবী চিন্তামণির সঙ্গেও তুলনা করা হয়ে থাকে; পদ্মফুলের মাঝে যার অবস্থান।

ডোনাল্ড লোপেজের মতে, বৌদ্ধসভ্যতার দেবতা অবলোকিতেশ্বরের একটি উপাধিকে নির্দেশ করে মণিপদ্ম। এটি পূর্বে 'ওম' ও পরে 'হুম' শব্দের মাঝে অবস্থিত, যা ভাষাগত অর্থ

ছাড়াই ব্যবহৃত হয়।

লোপেজ আরও বলেন যে, অধিকাংশ তিব্বতি বৌদ্ধগ্রন্থে মন্ত্রকে অনুবাদ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন—চেংরিগ সাধনায় এই ছয়টি শব্দ ছয়টি রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে।

পদ্মফুল বিশুদ্ধতার প্রতীক। সুতরাং 'প্রকৃত পদ্ম'; মানে 'প্রকৃত বিশুদ্ধতা' হতে পারে। তাহলে 'মণি" শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, এই মন্ত্রের মধ্যেই বুদ্ধের শিক্ষা রয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বুদ্ধ-প্রকৃতি বিদ্যমান। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিশুদ্ধতার বীজ রয়েছে, এটার উন্নয়ন সাধন করে বুদ্ধত্বে রূপান্তরিত করতে হবে। আমাদের সাধারণ দেহ, বাক্য ও মন বিশুদ্ধ হয়ে রূপান্তরিত হবে বুদ্ধের পবিত্র দেহে, বাক্যে ও মনে। আর 'ওম মণিপদ্মে হুম' সেই পথটির অনুশীলন করে।

স্বামী শিবানন্দ এক লেখায় লিখছেন, ওম মানে হল 'সব' বা অল। 'ওম' হল ইশ্বর ও ব্রহ্মার নাম ও প্রতীক। 'ওম' হল জগতের আদি নামশব্দ কিংবা উচ্চারণ। ওম মানবের ত্রিগুণিত অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। ওম থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সমগ্র মহাবিশ্ব টিকে আছে এই 'ওম'-এর ওপর আবার বিলীনও হবে 'ওম'-এ।

ওম শব্দটিকে বিচ্ছেদ করলে আমরা পাই। এখানে 'অ' 'বিষ্ণু', 'উ' 'মহেশ্বর বা শিব' ও 'ম্' 'ব্রহ্মা'-কে নির্দেশ করে। একে মনে করা হয় সকল মন্ত্রের আদি ধ্বনি। সামবেদের শব্দ অবয়বের প্রথম অবয়ব ওম। ভাগবত অনুসারে পরমেষ্ঠ আত্মসংযম করার পর, তাঁর হৃদয়াকাশ হতে এই শব্দ উৎপন্ন হয়েছিল। হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হতে এর উৎপত্তি। এটি নিজের আশ্রয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক; সর্ব্বমন্ত্র ও উপনিষদ স্বরূপ। এটিই বেদের সনাতন বীজ।

'অ' শারীরিক সমতলকে প্রতিনিধিত্ব করে। 'উ' মানসিক এবং নাক্ষত্রিক সমতল, বুদ্ধিমান আত্মার জগৎ, সকল স্বর্গ। 'ম' গভীর ঘুমের দশা-কে প্রতিনিধিত্ব করে, এমনকি সকল কিছু যা কিনা জাগ্রত অবস্থায়ও অজানা, এবং সেইসব কিছু যা কিনা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির নাগালেরও বাইরে। এইভাবে 'ওম' ই সব আমাদের জীবন, চিন্তন ও বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি। সমগ্র বিশ্বজগৎ 'ওম' থেকে উদ্ভূত, 'ওম'এ অবস্থিত এবং 'ওম' এই বিলীন হবে।

'মণি' শব্দের অর্থ রত্ন, ফসিল, কেউ কেউ একে বীজকোশও বলে থাকেন। বিশুদ্ধ রত্ন হল ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। এবং তা জ্ঞানদীপ্ত হওয়ার বাসনাকে প্রতীকী রূপ দান করে। 'মণি' হল 'মায়া', 'বাসনা', 'সংসার'ও 'নির্বাণ'-এর উদ্ভব।

পদ্মে' মানে, কমল যা কিনা প্রজ্ঞার, জ্ঞানের, উদ্দীপনার প্রতীক। একটি পদ্মফুল যেমন পাঁক থেকে ওঠে তেমনি প্রজ্ঞাকে মানব অবস্থা থেকে স্বর্গীয় গুণ অর্জন করা পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়। সকল প্রজ্ঞার মূল প্রজ্ঞা হল 'নীরবতা ও শূণ্যতার প্রজ্ঞা'। 'পদ্মে' মানে শূন্যতা।' হম' প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির সংযুক্তি ঘটায়। এটা অবিভাজ্যতা, স্থবিরতা, যাকে আন্দোলিত করা যায় না। এটা জ্ঞানদীপনের মননকে উপস্থাপন করে। 'হুম' যন্ত্রণাকে ধ্বংস করে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে একে এভাবেও দেখা হয়ে থাকে—'ওম মণিপদ্মে হুম' অর্থাৎ দেবকুলে(ওম), অমরকুলে(ম), মানুষরূপে(নি), পশুরূপে(প), হতাশরূপে (দ্মে), নারকিরূপে(হুম বা হ্রং) -পুনর্জন্ম নিরোধ করে। এই মতানুসারে পুনর্জন্মের ছয় অবস্থাসূচক ছয় বর্ণ উক্ত ছয় অক্ষরে আরোপিত হয়ে থাকে। আবার কখনো একে বৌদ্ধশাস্ত্রের আত্মায় ছয়টি পরিশোধনের নির্দেশক হিসেবে ভাবা হয়। এই ছয়টি পরিশোধন হল—গৌরব বা অংহ (এম), ঈর্ষা বা কাম (মা), আবেগ বা আকাঙ্খা (নি), অজ্ঞতা বা কুসংস্কার (প), লোভ (স্মে), ঘৃণা (হুম)। কখনো একে বৌদ্ধধর্মের ছয়টি রঙের নির্দেশক হিসেবে কল্পনা করা হয় সাদা (ওম), সবুজ (ম), হলুদ (নি), নীল (প), লাল (স্মে), কালো(ম)। এখানে কালো মূলত বাকি পাঁচটি রঙের সমন্বয় হিসেবে দেখানো হয়।

কখনো মহাযানীদের ছয় পারমিতাকে এই ছয়টি শব্দাংশ দ্বারা নির্দেশিত করা হয়েছে বলে

ধারণা করা হয়। এই ছয় পারমিতা হল-দান (ওম), শীল (ম), ক্ষান্তি (নি), বীর্য(প), ধ্যান (স্মে) ও প্রজ্ঞা (ম)। এই ছয় পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞাপরিমিতাকে মূখ্য রুপে দেখা হয়েছে। প্রজ্ঞা পারমিতার মৌলিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ উচ্চতর জ্ঞান লাভের উপায়, যা শূন্যতার প্রতিপাদক। প্রজ্ঞাপারমিতার বুৎপত্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে “অষ্ঠ সহস্র প্রজ্ঞাপারমিতা’ গ্রন্থে বলা হয়েছে সর্বধর্ম অনুপলদ্ধকে প্রজ্ঞা পারমিতা বলা হয়েছে। এর গুরুত্ব প্রতিপাদনে শত সাহসিকা প্রজ্ঞাপরিমিতাতে বলা হয়েছে চন্দ্র, সূর্য যেমন চতুদ্বীপ উদ্ভাসিত করে তদ্রূপ প্রজ্ঞাপরিমিতা ও অন্য পারমিতা সমূহকে পরিশোধিত করে।

বৌদ্ধ মন্ত্র ‘ওঁ মণিপদ্মে হুম’ শরীরের অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলন। বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্র, মণি এই শব্দগুলো লিঙ্গের প্রতীক। আর যোনি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় পদ্ম, ত্রিভুজ। দেহতত্ত্বের এই সাধনায় সুষুম্না কাণ্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুষুম্নার বাঁয়ে ইড়া, ডানে পিঙ্গলা ও ভেতরে চিত্রিণী ও বজ্রাখ্যা নাড়ি অবস্থিত। বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানে এই নাড়িগুলোকে প্রায়ই নদী বলে উল্লেখ করা হয়। সুষুম্নায় থাকে সাত পদ্ম, নারীত্বের সাত কেন্দ্র। মূলাধার(কক্সিস),সাধিষ্ঠান(অণ্ডাশয়), মণিপুর(নাভি), অনাহত (হৃদয়), বিশুদ্ধ (কণ্ঠ), আজ্ঞা (কপাল) ও সহস্রার (মস্তিষ্ক)। এইসব পদ্মের দলসংখ্যা আলাদা। সহস্রার পদ্মের দলসংখ্যা হাজার, তাই এর অন্য নাম সহস্রদল পদ্ম। বৌদ্ধ তন্ত্রে চারটি চক্র ধরা হয়। নির্মাণচক্র (নাভি), ধর্মচক্র (হৃদয়), সম্ভোগচক্র (কণ্ঠ) এবং মহাসুখচক্র (মস্তিষ্ক)। ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্না বৌদ্ধতন্ত্রে হয়ে যায় ললনা-রসনা-অবধূতী। মূলাধারে সুপ্ত নারীত্ব কুলকুণ্ডলিনীকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করাই তন্ত্রসাধনা। এখানেই মিলিত হয় পুরুষ ও প্রকৃতি। নাথেরা বলেন শিব-শক্তির মিলন। বৌদ্ধদের কাছে করুণা (পুরুষ) ও প্রজ্ঞার (নারী) এই মিলনই মহাসুখ। বৌদ্ধমন্ত্র ‘ওঁ মণিপদ্মে হুম’ শরীরের অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনেরই প্রতীক। এইপুরুষ আদি বুদ্ধ বা বজ্রধর। তাঁর সাধনসঙ্গিনী প্রজ্ঞাপারমিতা। আদি বুদ্ধর অধীনে আছেন পাঁচ দিকের অধীশ্বর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ। পূর্বে অক্ষোভ্য (রং নীল, সঙ্গিনী-লোচনা), পশ্চিমে অমিতাভ (রং– লাল, সঙ্গিনী—পাণ্ডুরা), উত্তরে অমোঘসিদ্ধি (রং সবুজ, সঙ্গিনী শ্যামা তারা), মধ্যে বৈরোচন (রং—সাদা, সঙ্গিনী—শ্বেততারা) ও দক্ষিণে রত্নসম্ভব(রং—হলুদ, সঙ্গিনী—মামকী)।

এই বিমূর্ত প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্ত হয়ে ওঠেন তারাদেবীতে, যিনি শেষদিন অবধি ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের প্রেরণা। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের প্রভাব। ছিল অতীশের ওপর। অতীশকে বুঝতে তাঁর অতীশ কি পঞ্চ ‘ম’-কারের সাধনা করতেন? মানে মাছ, মাংস, মদ, মুদ্রা ও মৈথুন। তান্ত্রিক অতীশকে জানা যায় না বিশদে। এই পথ তিনি ধরেছিলেন না ছেড়েছিলেন তা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। তবে অতীশ চিরকাল প্রাচীন সনাতন বৌদ্ধধর্মে আস্থাশীল ছিলেন।

অদ্বয়বজ্র ও রাহুলগুপ্তর কাছে তন্ত্রশিক্ষার পর গুহ্যজ্ঞানবজ্র শ্রামণ্য নেন। ওদন্তপুরী মহাবিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষান্তে নাম হয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বয়স তখন ঊনত্রিশ। দুবছরে মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধধর্মে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন অতীশ। এমনটাই দাবি করেছেন তিব্বতিয় ঐতিহাসিকরা। সুবর্ণদ্বীপে আচার্য ধর্মকীর্তির কাছেও শাস্ত্রশিক্ষা করেন বারো বছর। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ভারতে ফিরে অতীশের বাকি জীবনের অনেকটাই কাটে বিক্রমশীল মহাবিহারে। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় অতীশ বিক্রমশীলেই তৎকালীন পাল রাজা নয়পাল ও কলচুরি রাজ কর্ণের মধ্যে এক কূটনৈতিক মৈত্রীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আনুমানিক ১০৪২ সালে প্রায় ষাট বছর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেন অতীশ। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মে, ব্যক্তিগত অহমিকা বর্জন করে যারা আর্তের সেবায় নিয়োজিত হন তারাই বোধিসত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এই বোধিসত্ত্বরা গভীর শ্রদ্ধায় পূজিত হন মহাযানী বিশ্বে। সম্ভবত আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা বোধিসত্ত্বদের জীবন থেকেই পেয়ে থাকবেন অতীশ। এর আগে শান্তরক্ষীত, পদ্মসম্ভব ও কমলশীল তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বিশেষ করে তিব্বতে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্মের

প্রবক্তা পদ্মসম্ভব বা গুরু রি পো চে ক্রমশ কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাত অনিবার্য ছিল। পরে বজ্রযানী তান্ত্রিকরাও নানা উপদলে ভেঙে যায়। মারণ, বশীকরণ, নারী সম্ভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অতীশ তিব্বতে বিভিন্ন মনাস্ট্রি নির্মাণের কথা বলেন ও সেখানে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করেন। অতীশের শিষ্য ব্রোম তোন পা জন্ম দেন কাদমপা সম্প্রদায়ের এবং ক্রমে এখান থেকেই তৈরি হয় গেলুকপা সম্প্রদায়। দলাই লামা, পাঞ্চেন লামারা এই সম্প্রদায়েরই উত্তরাধিকার। এর পরে এই লামাতন্ত্র তিব্বতে কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সে খবর পাই শরৎচন্দ্র দাশের বিবরণে। তবে অতীশ আর ভারতে ফিরে আসতে পারেননি। তিব্বতের মানুষের কাছে তিনি জোবোজে বা প্রভু হয়ে যান। হাতে সময় থাকলে শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত নিয়ে বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

‘ওম মণিপদ্মে হুম’ মহামন্ত্রটির সম্ভাব্য কিছু ব্যাখ্যায় অনেকে মনে করেন যে ‘আহা মণিই প্রকৃত পদ্ম’! পদ্মফুল বিশুদ্ধতার প্রতীক। সুতরাং ‘প্রকৃত পদ্ম’ মানে ‘প্রকৃত বিশুদ্ধতা’ হতে পারে। তাহলে ‘মণি’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে? বলা হয় যে, মণি মানে মন বা মন্ত্র যার মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষা রয়েছে।

বিহারের বিক্রমশীলা বিহারটি ছিল বজ্রযানী বৌদ্ধদের অন্যতম কেন্দ্র। একাদশ শতকে এই মঠের বজ্রযানী বৌদ্ধরা তিব্বতে ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তিব্বতে আজও অসংখ্যবার ওম মণিপদ্মে হুম’ জপ করা হয়। এই মন্ত্রটি বুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাপারমিতার এবং বোধিসত্ত্ব এবং তারাদেবীর যৌনমিলনের প্রতীক। তবে বজ্রযান কেবলই যৌন সাধনপন্থা নয়, বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের একটি রহস্যময় রূপ।

এভাবে বজ্রযান হয়ে উঠেছিল যৌন-অতীন্দ্রিয়বাদী শক্তি। তবে বজ্রযানে ধ্যানের গুরুত্বকে অবহেলা করা হয়নি। বজ্রযানীর উদ্দেশ্য ছিল যৌনচর্চার মাধ্যমে দেবীর কৃপা লাভ করে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা অর্জন। যা একটি ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা থেকে ভারতবর্ষের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বজ্রযানী সাধকদের বলা হত সিদ্ধ অথবা সিদ্ধাচার্য। এঁদের সংখ্যা ছিল ৮৪। পূর্বে মহাযান পন্থার বই-পুস্তক লেখা হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। বজ্রযানী সিদ্ধাচার্যগণ লিখেছিলেন বাংলার আদি রূপ। তাদের ভাবনার সংকলনই—চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাপদ। চর্যাপদই বাংলা ভাষার আদিরূপ।

চর্যার কবিরা ছিলেন পূর্ব ভারত ও নেপাল রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। কেউ পূর্ববঙ্গ, কেউ উত্তরবঙ্গ, কেউ বা রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বিহার, কেউ ওড়িশা, কেউ বা আবার অসম বা কামরূপের বাসিন্দাও ছিলেন। এঁরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, বণিক এমনকি অন্ত্যজ শ্রেণি থেকেও এসেছিলেন। কেউ কেউ রাজবংশজাতও ছিলেন। এঁরা পূর্বাশ্রমের পিতৃপ্রদত্ত নাম ত্যাগ করেছিলেন বলে নাম দেখে এঁদের জাতি স্থির করা যায় না। এঁরা হিন্দুধর্মের সনাতন শাস্ত্রবিধান মানতেন না বলে এঁদের বেদবিরোধী ও নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয়। সাধনার নামে গোপনে কেউ কেউ যৌনাচারও করতেন বলে আধুনিক গবেষকগণ মত প্রকাশ করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে যখনই কোনো মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা শুরু হয় ‘ওম’ দিয়ে। আর শেষ হয় ‘স্বহা’ উচ্চারণ করে। ইষ্টদেবতা যেই হন, তাঁর উদ্দেশে মন্ত্র সব সময়ই শুরু হয় ‘ওম’ দিয়ে। বৈদিক, পৌরাণিক বা বীজমন্ত্র—কোথাও এর অন্যথা হয় না। ‘ওম’ শব্দের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় উপনিষদে। এবং সেখানেই বলা হয়েছে এই শব্দের নানা অর্থ। যেমন, ওম মানে ব্রহ্মাণ্ড, ওম মানে আত্মা, ওম মানে পরমাত্মা। আর এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে তার মুক্তি নিশ্চিত।

রহস্যময় অঘোরী সাধুদের গল্প

নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের ঠিক একেবারে পেছেন বাগমতী নদী। বাগমতীর তীরে হরিদ্বার বেনারসের মতো সেখানেও সন্ধ্যা আরতি হয়।

আরতির সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এক মাতাজি শিবতাণ্ডব করছেন। আরতি শেষ হতেই কী খেয়াল হল যেদিকে আরতি হচ্ছিল সেদিকে গেলাম। আরতি শেষে হঠাৎ করে অন্ধকার নেমে এল। আর তারপরই দেখলাম পরিবেশ কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। আরতিস্থলের একটু কাছে গিয়ে দেখলাম মাতাজির আশেপাশে বেশ কয়েকজন অঘোরী সাধু ঘুরছে। মাথায় জটা। কালো পোশাক। চোখ লাল। ভরপুর গাঁজার গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। তারা ওই সুন্দরী মাতাজির হাতে কিছু একটা দিয়ে দূরে চলে গেল।

বাগমতীর অন্য তীরে তখন একটি শবদেহ এসেছে। সাদা কাপড়ে মোড়া শবদেহটিকে বাগমতীর জলে স্নান করানো চলছে। সিঁদুর মাখিয়ে পুজোপাঠ চলছে। মৃতদেহ দাহকার্য হয় বাগমতীর ওই ঘাটেই। মৃতদেহ দাহের আগে তার যাবতীয় নিয়মবিধি পালনের কাজ যখন চলছে তখন বাগমতীর এপারে সুন্দরী মাতাজি নির্জন ঘাটে ধ্যানমুদ্রায় বসলেন।

অন্ধকার নেমে এসেছে। সন্ধে সাড়ে সাতটা। আরতি শেষে কার্যত এপাশের ঘাট পুরোপুরি শুনশান। কোনো লোকজন জনপ্রাণী নেই। এক নিস্তব্ধ পরিবেশ। আমি ওপরের একটি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি। তার দু-ধাপ নীচে মাতাজি ধ্যানে বসেছেন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাতাজিকে আর মাতাজির ঠিক উলটো দিকে মানে বাগমতী নদীর অন্য পাড়ে সাদা কাপড়ে মোড়া শবদেহটিকে। মাতাজি অঘোরীদের দেওয়া সেই কাঠের টুকরোগুলি নিজের সামনে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাখলেন। নিজের ঝোলা থেকে একটি শিশি বের করলেন, কিছু চিহ্ন আঁকলেন। তারপর একমনে ধ্যানে বসলেন। চোখের পাতা ফেলিনি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওপর থেকে নীচের দিকে। আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না, হঠাৎ করে না জানি কী বিচিত্র উপায়ে মাতাজির সামনে থাকা কাঠগুলো জ্বলে উঠল।

আমি কেমন যেন চমকে উঠলাম। কোনো কেমিক্যাল নেই কিচ্ছু নেই। যদি থাকে তাহলে অগ্নি সংযোগ হল কীভাবে? এসব ভাবছি তখনই ফোন বেজে উঠল। ধরতে একটু পাশে সরেছি। চোখের পলক পড়েনি, এগিয়ে এসে দেখলাম মাতাজি ভ্যানিশ! আর তার সামগ্রী? মানে কাঠ, আগুন ইত্যাদি... তাও বেমালুম গায়েব। আর মাতাজি তাকেও দেখতে পেলাম না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে কোথায় গেল? শুনশান ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি আমি একা।

পরে মেলানোর চেষ্টা করলাম মাতাজি অঘোরীদের সঙ্গে শবসাধনা করছিলেন। ওই মৃতদেহ থেকে শক্তি নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল।

হিমালয়ের আনাচে-কানাচে দেখা মিলবে অঘোরীদের। নেপালের কাঠমাণ্ডুর 'অঘোর কুঠী' অঘোরীদের বহু প্রাচীন তীর্থ। কথিত রয়েছে, বাবা সিং শাবক নামের এক রামভক্ত সন্ন্যাসী এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। আবার উত্তরাখণ্ডের গুপ্তকাশীর কালীমঠ আর এক গুরুত্বপূর্ণ অঘোরী-তীর্থ। কেদারনাথের নিকটবর্তী এই তীর্থ একটি শাক্তপীঠ। সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম এই পীঠস্থানে অঘোরীদের অনায়াস যাতায়াত। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর বেশ বড়ো রকমের প্রভাব রয়েছে এই অঘোরী সম্প্রদায়ের সাধুদের, বলা যায় ভারতকে চিহ্নিত করতে হলে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তার একটা এই সাধুরা। হিমালয়ের আনাচেকানাচে এবং বেনারসে সবচেয়ে বেশি অঘোরী সাধু দেখা যায়।

অঘোরী সাধুদের লোকজন যতটা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তার থেকে বেশি মানুষ তাদেরকে ভয় করে। তাদের ভয় পাওয়া লোকের সংখ্যাই বেশি। অঘোরীদের সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে কীভাবে একজন অঘোরী সাধু হন। আর অন্যান্য সাধুদের থেকে অঘোরী সাধুদের পার্থক্য কী—

অঘোরীরা মূলত দেবতা 'শিব'-এর পূজারি। তারা বিশ্বাস করে শিবই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, ধ্বংসকারী এবং সব কিছুর পরিচালনাকারী। শিবের মহিলা রূপ মৃত্যুর দেবী 'কাল ভৈরবী বা মহাকালী'-এর উদ্দেশেই তারা প্রার্থনা করে এবং এ-কারণেই তারা মৃত্যুভয়কে পেছনে রেখে

আসে। অঘোরীদের মতে, "শিবই সব কিছু। হিন্দুধর্মের সব দেবতাই শিবের কোনো না কোনো রূপ।"

কালো পোশাক আর বিশাল জটাধারী অঘোরী সাধুদের দেখলেই চেনা যায়। ধ্যান করার জন্য সাধারণত তাঁরা শ্মশানের মতো নির্জন জায়গাকেই বেছে নেন। এছাড়াও হিমালয়ের ঠান্ডা গুহা, রাজস্থান, গুজরাটের নিষ্প্রাণ মরুভূমি, এমনকি বাংলার ঘন জঙ্গলেও তাঁদের দেখা মেলে। তবে বেনারস এবং নেপালের পশুপতিনাথ যেহেতু শিবের প্রিয় জায়গা, তাই বেনারসের গঙ্গার তীরে আপনি প্রচুর অঘোরী সাধু দেখতে পাবেন আর পাবেন নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরে ও মন্দিরের বাইরে বাগমতী নদীর তীরে।

অঘোরীদের জন্য চুল বা গোফ-দাড়ি কাটা একেবারে নিষিদ্ধ। সাধারণত কালো পোশাক পরতে দেখা গেলেও অনেক সময় তাঁদেরকে দেখা যায় নাগাদের মত নগ্ন অবস্থায়। নাগাসাধুদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে অবশ্য অনেক দিক থেকে। শ্মশানে ধ্যান করার সময় তারা পোড়ানো মৃতদেহের ছাই সারা শরীরে মেখে তার ওপরে বসেই ধ্যান করা শুরু করেন, এ সময় তাদের পরনে থাকে শুধুমাত্র একটি কৌপিন। এছাড়া রুদ্রাক্ষের মালা আর মানুষের খুলি তো গলায় থাকেই। অঘোরীদের অনেকেই সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘোরেন। পার্থিব সব কিছু ঝেড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে তারা এটি করে থাকেন!

অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে ও নাগাদের সঙ্গে অঘোরীদের একটি বড়ো পার্থক্য হল অঘোরীদের খাবার। অন্যান্য সাধুরা যেখানে নিরামিষাশী, সেখানে অঘোরীরা খেতে পারেন যে-কোনো কিছুই। আবর্জনা থেকে শুরু করে মানুষের মাংস এমনকি মানুষের মলমূত্র পর্যন্তও তাঁরা খান। কারণ? কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন শিব সবচেয়ে খারাপের মধ্যেও বিদ্যমান।

অঘোরীদের মূলমন্ত্রই হচ্ছে "অশুদ্ধের মধ্যে বিশুদ্ধতাকে খুঁজে বের করা।" তা ছাড়া তারা বিশ্বাস করেন মলমূত্র খাওয়া তাঁদের ভেতরের আত্ম-অহমিকাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে। বেঁচে থাকার জন্য তারা যতটুকু দরকার ততটুকুই খান। তাঁদের কাছে খাবারের স্বাদ বা চেহারা কোনো বিষয় নয়। তবে বেনারস ও নেপালের কাঠমান্ডুর মতো শহরেও কেউ তাঁদেরকে নরমাংস খেতে বাধা দেয় না, কারণ তাঁদের খাওয়ার জন্য শ্মশানের পোড়া ও আধপোড়া মৃতদেহ থাকেই।

ধ্যান করার জন্য অঘোরীরা বেছে নেন শ্মশানকে। একেবারে মধ্যরাত থেকে তাঁরা পোড়া মৃতদেহের দাহের স্থানের ওপর বসে ধ্যান শুরু করেন। তারা বিশ্বাস করেন এই সময়টিতে কোনো মানুষ বা কোনো আত্মা ঘোরাফেরা করে তাঁদের ধ্যানের মনোযোগ নষ্ট করতে পারবে না। এছাড়া তাঁরা ধ্যান করার আগে খানিকটা গাঁজাও টেনে নেন যাতে ধ্যানের মনোযোগ আরও সুদৃঢ় করতে পারে। এছাড়া তাঁরা দাবি করেন, গাঁজার ঘোর তাঁদেরকে আত্মা দেখতে সাহায্য করে। যদিও গাঁজা টানার পরেও তাঁরা থাকেন নির্লিপ্ত।

অঘোরীদের অনেকেই দাবি করেন তাদের কাছে পৃথিবীর সব রোগেরই ঔষধ রয়েছে, যা ক্যানসার এমনকি এইডসকেও সারিয়ে তুলতে পারে! সে পদ্ধতি জানলেও তারা তার প্রয়োগ করতে পারেন না। বারণ আছে। কারণ তাতে তাঁর অর্জিত শক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। মৃত্যু হতে পারে তাঁর। দেবতা রুষ্ট হয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে পারেন। অঘোরীরা শক্তি সংগ্রহ করেন পোড়ানো মৃতদেহগুলি থেকে। আর এই সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে তারা নিজেদের ভাষায় 'মানুষের তেল' বলে।

অঘোরীদেরকে বলা হয় পৃথিবীর সেরা কালো জাদুকর বা ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান। যদিও তারা দাবি করেন, তাঁরা এই ক্ষমতা কখনও মানুষের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন না, বরং মানুষের উপকার করেন। কোনো অসুস্থ মানুষের রোগকে তাঁরা কালো জাদুর সাহায্যে মৃতদেহে ঢুকিয়ে দেয় এবং মৃতদেহ পুড়িয়ে রোগটিকে ধ্বংস করে ফেলে!

অঘোরীরা বিশ্বাস করেন ডানমার্গ বা ভালো পথের চেয়ে বামমার্গ বা খারাপ পথ দ্বারা দেবতার সান্নিধ্য পাওয়া যায় খুবই দ্রুত। এই পদ্ধতি কার্যকরও হয় গভীরভাবে। যদিও

এভাবে সান্নিধ্য পাওয়ার মতো সাহস শুধু অঘোরীদেরই আছে। অমাবস্যার মধ্যরাতে তারা কালীকে খুশি করার জন্য মৃতদেহের সঙ্গে মিলিত হয়! মেরোনাথ নামক এক অঘোরী সাধু এক জায়গায় লিখছেন, "আমাদের এই কাজকর্ম বাইরের দুনিয়ায় অতি অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা নোংরামির মধ্যে বিশুদ্ধতা পাওয়ার চেষ্টা করি। যদি কেউ মৃতদেহের সঙ্গে মিলিত হবার সময়ও দেবতার ওপর মনোযোগ রাখতে পারে তবে বুঝতে হবে সে সঠিক পথে রয়েছে।" এছাড়াও তাঁরা বিশ্বাস করেন, এর ফলে তাঁদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। মিলিত হবার সময় অন্যান্য সাধুরা মন্ত্র জপ করেন।

অঘোরী সাধুদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। যা-ই হোক, বেনারস শহরের কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের এক পুরোহিত একদিন দেখতে পান তৈলঙ্গস্বামী তার অদ্ভুতভাবে শিবের পুজো করছেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৈলঙ্গস্বামীকে চড় মেরে তাকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দেন এবং পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়। পরদিন সকালেই পুরোহিত আকস্মিকভাবেই মারা যান।

অঘোরীরা এককথায় শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শিবের উপাসক তাঁদেরই একটি সম্প্রদায় হল, অঘোরী। অঘোরী শব্দের তাৎপর্য হল—এই বৈষয়িক বিষয়ের ঘোর যাঁদের কেটে গেছে এবং আধ্যাত্মিক জগতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন যাঁরা। অঘোরীরা উগড় বা ঔঘড় নামেও পরিচিত। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে অঘোর উপাসনার কথা আছে। অঘোর শিবেরই রূপান্তর মাত্র। স্বচ্ছন্দ ভৈরবের পাঁচটি মুখ। অঘোর হ'ল সেই পাঁচটির মধ্যে দক্ষিণ মুখটি। গোরক্ষনাথ নামক এক হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই এই অঘোরীদের উদ্ভব। তিনি নাথপন্থীদেরও গুরু।

সতেরো শতকের একটি গ্রন্থ, "দবিস্তান" -এ অঘোরীদের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক ডব্লিউ ক্রুক সাহেব বলেছেন, তিনি নিজে দেখেছিলেন অঘোরীদের এক সম্প্রদায়কে, যারা মৃতদেহের ওপর বসে নিজ সম্প্রদায়ের গান করে, যতদিন না সেই দেহ পচে যায়। পরে সেই দেহ তাদের আহার হয়। অঘোরীদের উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকে আনন্দগিরি রচিত "শঙ্করবিজয়" বইতে, সপ্তম-অষ্টম শতকে ভবভূতির "মালতীমাধব" নাটকে, একাদশ শতকে কৃষ্ণমিশ্র রচিত "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটকে।

শ্মশানচারী অঘোরী সন্ন্যাসীদের নিয়ে কথা ও কাহিনির চল এদেশে কম নয়। অঘোরী এবং নাগা সন্ন্যাসীদের নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের কৌতূহলও ব্যাপক। অনেকেরই ধারণা অঘোরপন্থা গুপ্ত ও গুহ্য। এবং সেই কারণেই তাঁরা তাঁদের উপাসনাকে গোপনে রাখেন। কিন্তু একটু নজর করলেই জানা যায়, অঘোরী সন্ন্যাসীরা আদপেই জন-বিচ্ছিন্ন নন। তা ছাড়া, তাঁরা তাঁদের উপাসনাকেও গোপন রাখতে চান না।

অঘোরীদের গমনাগমন মূলত শাক্ত তীর্থগুলিতে। তবে, বিশেষ কয়েকটি মন্দির বা দেবস্থানকে তাঁরা তাঁদের উপাসনাক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব দেন। জন্মচক্র, তা থেকে মুক্তি এবং মোক্ষের সাধনাই অঘোরীদের কাছে মুখ্য কাজ। তাঁদের ক্রিয়া-কর্ম রাত্রিকালীন। তাঁরা এমনিতেও নিশাচর। কিন্তু তাই বলে তাঁরা 'অপ্রকাশ্য নন। মজার ব্যাপার এই, তাঁরা শৈবসাধক হলেও শাক্তদের সঙ্গে তাঁদের কোনো বিরোধ নেই। তাই বলে যে-কোনো শাক্ততীর্থে অঘোরীদের দেখা মিলবে, এমন নয়।

আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহু জায়গা আজও রয়েছে, যা অঘোরী সাধুদের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। সেইসমস্ত জায়গার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু জায়গার মধ্যে অন্যতম হল বীরভূমের তারাপীঠ। কথিত আছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে মাতা পার্বতীর চক্ষু খণ্ডিত হয়ে এই তারাপীঠে প্রথিত হয়েছিল। সেই থেকে তারাপীঠ শক্তিপীঠ নামেও পরিচিতি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই তারাপীঠ মহাশ্মশানে অঘোরী সন্তগণ তাঁদের তপস্যা ও সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। এর পরে হল হিংলাজ ধাম, যা বর্তমানে পাকিস্তানের বালুচিস্তান রাজ্যে হিঙ্গল নদীর তীরে অবস্থিত। মাতার ৫২ পীঠের মধ্যে এই হিংলাজ পীঠ উল্লেখযোগ্য। বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল ও দুর্গম পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় একে মরুতীর্থ হিংলাজও বলা হয়।

বিন্ধ্যাচল পর্বতশ্রেণিও অঘোরী সন্তদের এক অন্যতম পীঠস্থান। কথিত আছে দুর্গা মাতা মহীষাসুরকে বধ করার পর এই বিন্ধ্যাচলেই উপবিষ্ট হয়েছিলেন। জানা যায়, এখনও এই বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণির বহু গুহায় অঘোরী তান্ত্রিক সাধুরা নিজেদের সাধনায় মগ্ন রয়েছেন। অঘোরী সন্তদের চতুর্থ পীঠস্থান হল চিত্রকূট, তীর্থস্থল হিসেবে পরিচিত এই চিত্রকূটের স্ফটিকশিলা মহাশ্মশান আজও অঘোর সন্তদের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। এর পর কালীমঠ, হিমালয়ের কাছে গুপ্তকাশী থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই অঘোর পীঠস্থানে বহু অঘোরী বাস করেন। উড়িষ্যায় অবস্থিত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও অঘোরীদের অন্যতম পীঠস্থানগুলির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য। কথিত আছে এখানে মাতা পার্বতীর পায়ের খণ্ড প্রোথিত হয়েছিল। পুরীর স্বর্গদুয়ার মহাশ্মশান অঘোরী সন্তদের প্রসিদ্ধ সাধনাস্থল। দক্ষিণ ভারতের মাদুরাইয়েও অঘোরীদের কপালেশ্বর মন্দির রয়েছে, যেখানে বসবাসরত অঘোরীরা অঘোরী বিধি অনুযায়ী কপালেশ্বর মায়ের পুজো-অর্চনা করেন। এর পর রয়েছে কলকাতার কালীঘাট। কথিত আছে, এই কালিঘাটে ও দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাতা কালিকার উপাসনা করতেন, যা অঘোরীদের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবেও পরিচিত।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক আপনি কোন কোন মন্দিরে গেলে অঘোরীদের দেখা পাবেন-

* অঘোরীদের উৎস কাশীতে। এই প্রাচীন শহরে তাঁদের দেখা পাওয়া যায় নিয়মিতই। এখান থেকেই তাঁরা বিভিন্ন তীর্থে গমন করেন।

* নেপালের কাঠমান্ডুর 'অঘোর কুঠী' অঘোরীদের বহু প্রাচীন তীর্থ। কথিত রয়েছে, বাবা সিং শাবক নামের এক রামভক্ত সন্ন্যাসী এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা।

* বিন্ধ্যাচলও অঘোরীদের কাছে পবিত্র উপাসনাক্ষেত্র। কাশীর কাছেই এই শাক্ততীর্থ। এখানে অঘোরীরা প্রায়ই সমবেত হন। দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরকে ঘিরে প্রচুর গুহা রয়েছে। এই গুহাগুলিই অঘোরীদের আস্তানা। এখানেই ধ্যান ও অন্যান্য ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাঁরা।

* গুপ্তকাশীর কালী মঠ আর এক গুরুত্বপূর্ণ অঘোরী-তীর্থ। কেদারনাথের নিকটবর্তী এই তীর্থ একটি শাক্তপীঠ। সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম এই পীঠস্থানে অঘোরীদের যাতায়াত অনাবিল।

* কলকাতা শহরে অঘোরীদের দেখা মেলে প্রায়শই। কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর তাঁদের কাছে পবিত্র তীর্থ। তবে, পশ্চিমবঙ্গে যে মন্দিরটিতে সারা বছরই অঘোরীদের দেখা মেলে, সেটি তারাপীঠ।

* মাদুরাইয়ের কপিলেশ্বর মন্দিরটি অঘেরীদের প্রিয় তীর্থ। এই মন্দিরের নিকটবর্তী একটি আশ্রমে তাঁরা প্রায়ই সমবেত হন।

* চিত্রকূটের দত্তাত্রেয় মন্দিরে ত্রিনাথের দর্শন অঘোরীদের কাছে পবিত্র কর্তব্য। কিংবদন্তি অনুসারে, দত্তাত্রেয় অঘোরপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বেদ ও তন্ত্রের সম্মিলন তিনিই ঘটান বলে বিশ্বাস করেন অনেকেই।

সুদূর আফগানিস্তানের কাবুলেও অঘোরী তীর্থ বিদ্যমান। অঘোর রতনলালজি নামের এক সন্ন্যাসী এখানে প্রথম আসেন এবং আশ্রম তৈরি করেন। তাঁর প্রয়াণও হয় এখানেই। রতনলালজির সমাধি অঘোরীদের কাছে পবিত্র তীর্থ।

* অঘোরপন্থীদের প্রধান গুরু কিনারাম হিংলাজ মাতার আশীর্বাদধন্য ছিলেন বলে বিশ্বাস। পাকিস্তানের মরুতীর্থ হিংলাজকে তাই অঘোরীরা অন্যতম গন্তব্য হিসেবে ধরেন।

আসলে 'অঘোরী' শব্দটি শুনলেই অনেকে আঁতকে ওঠেন। কালো পোশাকে আচ্ছাদিত, জটাজুটধারী এই সন্ন্যাসীরা এমন কিছু আচারে বিশ্বাসী, যা শুনলে তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের সদস্যরা শিউরে উঠতে বাধ্য। প্রথমত তাঁরা শ্মশানচারী, তার ওপরে তাঁরা সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম মেখে থাকেন। প্রায়শই নগ্ন অঘোরী সাধুদের দর্শন পাওয়া যায়। সর্বোপরি তাঁদের খাদেখাদ্যভেদ একেবারেই নেই। এমনকি অঘোরীরা মৃতদেহ খেতেও অভ্যস্ত। এই ভয়াবহ বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই গৃহীজীবনে শঙ্কার হিল্লোল তোলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

ভারতীয় অধ্যাত্মমার্গে অঘোরী সম্প্রদায় মোটেও পরিত্যাজ্য নয়। উলটে বিরল সম্মান পেয়ে থাকেন অঘোরীরা। এখানেই প্রশ্ন জাগে—ঠিক কী কাজ করছে এই সম্ভ্রমের পেছনে?

উত্তর খুঁজতে গেলে প্রবেশ করতে হবে এমন কিছু প্রসঙ্গে, যা সাধারণত আলোচনাবৃত্তে আসে না। প্রথমেই ভাবতে হয় 'অঘোরী' শব্দটিকে নিয়ে। এই শব্দের উৎসে রয়েছে 'অঘোর' শব্দটি। এর অর্থ অন্ধকারের বিলয়। আবার এই শব্দটি ভয়হীনতাকেও বোঝায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই—অঘোরীদের বেশিরভাগ আচারই সাধারণ মানুষের ভীতি উদ্রেককারী। অঘোরীরা বিশ্বাস করেন শিবের বৈনাশিক রূপে। এক তীব্র শৈব ভাবনা থেকে তাঁরা শিবানুসারী জীবনযাপনে উদ্যোগী হন। শ্মশানবাস তার মধ্যে প্রধান।

চিতাভস্ম গায়ে মাখা, পচা, নোংরা খাবারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা বস্তুতপক্ষে ইন্দ্রিয়জয়েরই একটি দিক। অঘোরী সাধুরা মৃতদেহ ভক্ষণ, মূত্রপান ইত্যাদি অভ্যাস করেন। ১৭ শতকের সন্ন্যাসী বাবা কিনারামের সূত্রেই এই আচারগুলি অঘোরীদের কাল্টে প্রবেশ করেছে বলে জানা যায়। অঘোরীরা নিয়মিত শবসাধনা করে থাকেন। মৃতদেহ থেকে হাড় ছাড়িয়ে তা নিজেদের শরীরে ধারণ করেন, সঙ্গে রাখেন।

নরকপাল তাঁদের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় এক সামগ্রী। এটিকে অনেক সময়েই তাঁরা পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। অঘোরীদের এই আচারগুলির পেছনে সবথেকে বড়ো যুক্তিটি হল, কত কম উপকরণে জীবনধারণ করা যায়, তার অভ্যাস রাখা। এই যুক্তিতে তাঁরা প্রায়শই নগ্ন থাকেন। নগ্নতার সপক্ষে আর একটি যুক্তি হল এই—প্রকৃতি থেকে দূরে সরতে রাজি নন তাঁরা।

অঘোরীদের এই অদ্ভুত আচরণ তাঁদের সম্পর্কে বিস্তর কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে। অনেকেরই বিশ্বাস, অঘোরীরা কালো জাদুতে পারদর্শী। অথবা তাঁদের অতিলৌকিক ক্ষমতা বর্তমান। আসলে কোনো অতিলৌকিকতা প্রদর্শন অঘোরীদের লক্ষ্য নয়। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ, অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ। বলাই বাহুল্য, এই লক্ষ্য ভারতীয় অধ্যাত্মমার্গের সকলেরই। এইখানেই অঘোরীরা ভারতীয় সন্ন্যাস পরম্পরার সঙ্গে একাত্ম। কোনো তর্ক কখনোই ওঠে না অঘোরীদের সাধন-উদ্দেশ্য নিয়ে।

মধ্যযুগীয় কাশ্মীরি কাপালিকতন্ত্র থেকেই অঘোরীদের উৎপত্তি বলে মনে করে অনেকেই। এঁদের প্রাচীন নাম 'কালমুখ'। তা ছাড়া কিনারামের ঐতিহ্যের কথা সব অঘোরীই স্বীকার করেন। অঘোরীরা শক্তি আরাধক। শিব, অনেক সময় কালী বা তারার উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের আদর্শ শিবত্ব। এই জায়গায় মূলধারার শাক্ত তান্ত্রিকদের সঙ্গে তাঁরা সহমত। তাঁদের আরাধ্য পুরুষ দেবতাদের মধ্যে শিব ছাড়াও কালভৈরব, মহাকাল, বীরভদ্র প্রমুখ রয়েছেন।

এমনিতে অঘোরীরা মুক্তপুরুষ। কোনো বন্ধনেই তাঁরা আবদ্ধ নন। কোনো ভেদ-দর্শনে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। এমনকি পবিত্রতা-অপবিত্রতার ভেদরেখাও তাঁরা মানেন না।

যে-কোনো বস্তুতেই ঈশ্বর রয়েছেন—এটা অঘোরীদের নিশ্চিত বিশ্বাস। এই সর্বেশ্বরবাদ তাঁদের মধ্যে অনুপম মাধুর্যের জন্ম দেয়।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে অঘোরীরা কখনোই খারাপ ব্যবহার করেন না। তাঁদের দূরে সরিয়েও রাখেন না। নেপাল কিংবা কাশীতে তাঁদের মূল সাধনক্ষেত্রে। তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহুপ্রকার ভেষজ ও জৈব ওষুধে দিয়ে থাকেন। এছাড়া তন্ত্রের বিভিন্ন অলৌকিক জ্ঞান তাঁদের করায়ত্ত। বিপন্ন মানুষকে সে-বিষয়ে পরামর্শ দিতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। সর্বোপরি, অঘোরীরা একান্তভাবেই নির্বিরোধী এক সম্প্রদায়। তাই আপাত-বীভৎসতাগুলিকে দূরে সরিয়ে হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় অঘোরীরা পূজিত হন।

অঘোরীরা পুজো করেন শিবের। এছাড়াও মৃত্যুর দেবী কালীসাধনাও করে থাকে এঁরা। বারাণসীর অঘোরী মেরোনাথ এক সাক্ষাৎকারে ফোটোগ্রাফার এবং লেখক ডাভোর রস্তুহারকে বলেন, "সনাতন হিন্দু দর্শনে প্রত্যেকটি প্রভুর একটিমাত্র রূপ থাকে। বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো করে। তাদের মতো করে নৈবেদ্য প্রদান করে। শিব আর মা কালী

যখন ভক্তদের কাছ থেকে বলি আশা করে, তখন ভক্তরা কিন্তু তা মান্য করতে নিরুৎসাহিতা দেখিয়ে থাকে। আমরাই একমাত্র গোত্র, যারা মা-কালী এবং শিবের আশা মতো নৈবেদ্য প্রদান করে থাকি।”

হিমাচলের এক অঘোরী সাধু এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “সাধুরা তিনটি বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রাখে—মাংস, মদ এবং যৌনাচার। তবে অঘোরীরা এক্ষেত্রেও ভিন্ন। তাঁরা মনে করেন, মা কালী এই তিনটি বিষয়কেই খুব পছন্দ করেন। মাংস যে শুধু পশুর হবে, তা নয়। তারা এক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ করেন না। মানুষের মাংসও তাঁরা ভক্ষণ করেন, তবে মৃত। আস্তাকুঁড় থেকে নোংরা উচ্ছিষ্ট খাবার উঠিয়ে খান অঘোরীরা। এক্ষেত্রে তাঁরা মনে করেন, খাদ্যের ব্যাপারে কোনো ভিন্নাদর্শ থাকা উচিত নয়। মানুষের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট, মৃতদেহ, এমনকি মলমূত্রও ভক্ষণ করেন অঘোরী সাধুরা।

অঘোরীদের মতে, মা-কালী যৌনাচারে খুশি হন। তাই তাঁরা খোঁজ করতে থাকেন উপযুক্ত একটি মৃতদেহের। সমাধি থেকে সদ্য তাজা লাশ উঠিয়ে এনে তার সঙ্গে শুরু করেন অবাধ ও বিকৃত যৌনাচার। অঘোরীদের মনে আর একটি বিচিত্র বিশ্বাস রয়েছে। তাদের ধারণা মৃতদেহের সঙ্গে যৌনাচার তাদেরকে দিতে পারে অতুলনীয় ক্ষমতা। গভীর রাতে সমাধিস্থলে গিয়ে অঘোরীরা এই ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা মৃতদেহ কিংবা কোনো এক নারীকে বেছে নেন। চারদিকে ঢাকের বাদ্য বাজতে থাকে। তবে যার সঙ্গে যৌনক্রিয়া করা হবে, তাকে কোনো ধরনের জোর করা হয় না। নিজেদের ইচ্ছাতেই কাজটি হয়ে থাকে। এভাবে অঘোরীরা মনে করেন তাদেরকে মা-কালী পৃথিবীতে দেবেন অতুলনীয় ক্ষমতার আস্বাদ।

মেরোনাথ তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, “আমরা যা করি, তা বাইরের বিশ্বের কাছে শুনতে পাগলামি মনে হলেও আমাদের কাছে খুবই নৈমিত্তিক একটি ব্যাপার। নোংরার মাঝে শুদ্ধতা খুঁজে পাওয়া, এটিই আমাদের মূলমন্ত্র। মৃতদেহের সঙ্গে যৌনাচার কিংবা মৃতদেহ ভক্ষণ করার পাশাপাশি একজন অঘোরী যদি ঈশ্বরকে খুঁজে পায়, তাহলে বুঝতে হবে সে সঠিক পথেই আছে।”

ঘৃণা বিশ্বের বুকে ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না, এটাই অঘোরীদের বিশ্বাস। এমনকি কুকুর বেড়াল গোরু ছাগলের সঙ্গে বসে তারা খাবার ভক্ষণ করে থাকে। তারা মনে করে সামান্য প্রাণী তাদের খাবার নষ্ট করছে, এটা ভেবে যদি চিন্তিত হয়ে যায়, তাহলে প্রভু শিবের সঙ্গে কখনও মিলিত হওয়া সম্ভব হবে না। মানুষ তাদেরকে নানাভাবে কটুকথা বলে, হেয় করে। এসব কিছুই অঘোরীরা পাত্তা দেয় না। মানুষকে ঘৃণা করা তাদের স্বভাবে নেই। তারা অনেক উঁচু স্তরের এবং সে স্তরে যেতে এসব বিষয় আমলে না নেয়াই ভালো, এমনটাই বিশ্বাস অঘোরীদের।

একজন অঘোরী তান্ত্রিকের হাতে মানুষের খুলি বা ‘কপাল’ থাকাটা সত্যিকারের পরিচায়ক। অনেক সময় এজন্য এদেরকে কাপালিক বলেও অভিহিত করা হয়। জলে যেসব মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় কিংবা যেসব মৃতদেহ ভেসে ওঠে, তাদের খুলিটা সংগ্রহ করেন অঘোরী সাধুরা। এসব খুলিতে করে তাঁরা পানাহার করেন, আবার কেউ কেউ ভিক্ষাও চেয়ে থাকে। তখন এই খুলিকে ভিক্ষার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অঘোরীরা সমাধিকে পবিত্র ভূমি বলে বিবেচনা করে থাকেন। শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ, পবিত্র এবং অপবিত্র, উচিত এবং অনুচিতের মধ্যকার ফারাকটা তারা সমাধিস্থলে নেই বলে মনে করেন। এজন্য গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, অঘোরীরা একে একে এসে জমায়েত হন সমাধিক্ষেত্রে। বেজে ওঠে ঢাকের বাদ্যি, গুনগুনিয়ে ওঠে সম্মিলিত কণ্ঠে মন্ত্র।

বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটের শ্মশানে অঘোরীদের ক্যানিবালিজম বা মানুষের মাংস খাওয়া স্বাভাবিক একটি বিষয়। তাই বলে ভাববেন না যে তারা জীবিতের মাংস খান। সমাধিস্থ মৃত মানুষের দেহ কবর খুঁড়ে তুলে সেগুলো ভক্ষণ করেন অঘোরীরা। মাঝে মাঝে সেগুলো আগুনে ঝলসিয়েও খাওয়া হয়। পর্যাপ্ত মাংস খেয়ে নেবার পর বাকি মৃতদেহের

ওপর বসে তাঁরা পুজো শুরু করেন, চলে সারারাত। তবে কিছু কিছু অঘোরী রয়েছে যারা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। তাঁরা জীবিত মানুষের ওপর হামলা করে মাংস খাওয়া শুরু করেন। তাই অঘোরীদের এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য বারাণসীর মানুষ অনেক বেশি সতর্ক আচরণ করে। সমাধিস্থলেও বাড়ানো হয়েছে সতর্কতা।

বেশিরভাগ অঘোরীই মাদক সেবন করে থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের পছন্দ হচ্ছে মারিজুয়ানা। এটি সেবন করার মাধ্যমে তাঁরা মনে করেন এভাবে ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সহজতর হয়। এই মাদক সেবন করার ফলে যোগব্যায়াম করতে সুবিধা হয় বলে ধারণা তাঁদের। তবে মারিজুয়ানার মতো একটি মাদক সেবন করার পরও তাঁদের ব্যবহার খুব শান্ত এবং নম্র থাকে।

অঘোরীপন্থীদের কথা চিনা পর্যটক, হিউএম সাংও লিখে গেছেন। তিনি লিখছেন, "অঘোরীরা নগ্ন থাকে সকল ঋতুতেই। শরীরে ভস্ম মাখে। আর মাথায় থাকে হাড়ের মুকুট। কখনো কখনো কিছু অঘোরী সাধু গাছের ছাল পরে অথবা বাঘের চামড়া। তাদের পানপাত্র হল মানুষের মাথার খুলি।"

হিমালয়, বেনারস পার হয়ে চলে আসি বাংলার অঘোরীদের কথায়। অঘোরীরা শক্তির উপাসক। বাংলায় শিব ছাড়াও অঘোরীদের আরাধ্যা দেবী দুর্গা, কালী অথবা চামুণ্ডা। পঞ্চম শতকেও পূর্ব বাংলায় শক্তি আরাধনার আভাস মেলে। পুজোর এক অন্যতম অঙ্গ ছিল নরবলি। কালিকাপুরাণে নর হত্যার কথা আছে। এখন তার বদলে ছাগল, পায়রা বা মোষ বলি দেওয়া হয়। যেমন বৈষ্ণবদের পুজোয় কোনো ফল বলি দেওয়া হয়। এগুলি নৃশংসতা থেকে সরে এসে প্রতীকী বলির উদাহরণ।

অষ্টাদশ শতকে অঘোরীদের এক নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম হয় বেনারসে। নীরায়ের কানুরাম নামের এক সাধু কান্নুরাম নামের এক লোককে প্রথম এই মন্ত্রে দীক্ষা দেন। এই সম্প্রদায়কে "কান্নীরাম" বলে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানেন তাঁরা। তাঁরা উলঙ্গ এবং মৌনী। এদের মূল শিক্ষা হল, জীবনে আনন্দ, দুঃখ, ঠান্ডা অথবা গরম সব কিছুকেই সমান জ্ঞান করা। অনেকটা গীতার "স্থিতধী" স্তরের কথা।

তাঁদের দীক্ষা দেওয়া হয় কীনারামের সমাধিস্থলে। মির্জাপুর থেকে ছয় মাইল দূরে এক অষ্টভুজা মন্দিরের কাছে দীক্ষার প্রথা সম্পন্ন হয়। দীক্ষা প্রণালীতে কানে চুপি চুপি মন্ত্র বলা হয়। সঙ্গে বাজে শাঁখ ও নানান বাজনা। মাথা কামিয়ে ন্যাড়া করা হয়। এর পর মড়ার খুলি করে ন্যাড়া মাথায় মূত্র ঢালা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের চিহ্ন হিসেবে কপালে তাঁরা ত্রিপুণ্ড্রক চিহ্ন আঁকে, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। আবার মানুষের দাঁতের মালাও অনেকে পরেন। অঘোরীরা এর পর মদ খেয়ে নীচু জাতির কাছে ভিক্ষা করতে যায়। প্রথম বারো বছর শিক্ষানবিশ থাকতে হয় পূর্ণ অঘোরী সাধু হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগে। এই বারো বছরের শিক্ষানবিশের জীবনের প্রথা বৌদ্ধ পন্থাতেও দেখা যায়। এই শ্রেণির অপর সম্প্রদায়ের নাম, স্বরভঙ্গি।

এক অঘোরী সাধুর কথা শোনা যাক। তিনি ছিলেন আদিতে পাতিয়ালার মানুষ। নেপাল, জগন্নাথ, মথুরা সহ ভরতপুর সব জায়গায় ঘুরে তীর্থ করেন। সবার দেওয়া খাবারই খান, জাতিভেদ মানেন না। তিনি নিজে নরমাংস খেতেন না। তাঁর কথা মতো, তাঁর সম্প্রদায়ে এমন সাধু আছেন যাঁরা মানুষকে খেয়ে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। তারা ঘোড়া ছাড়া সব পশুর মাংস খান। অনেকের মতে, হিন্দিতে ঘোড়া শব্দের সঙ্গে 'ঘোরী' শব্দ জড়িয়ে থাকায়, তাদের এই সিদ্ধান্ত। যদিও তা খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, আদিকাল থেকেই ভারতে ঘোড়ার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। অশ্বমেধ যজ্ঞে হত্যা করা ঘোড়ার মাংসও খাওয়া হত না। যদিও এর বিপরীত মতও আছে আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র বা বাজসনেয়ী সংহিতাতে এবং ঋগ্ বেদেও।

কেবল ভারতের অঘোরী সম্প্রদায়ই নয়, ভারতের বাইরেও ধর্মীয় জগতে উন্নতি সাধনের জন্য নরমাংস খাওয়াকে আবশ্যক মনে করা হয়। ঐতিহাসিক ম্যাকডোনাল্ড মনে করেন,

মধ্য এশিয়ার ওঝারাও নরমাংস খায়। অলৌকিক ক্ষমতা তাতে বাড়ে বলে তাদের ধারণা। উগান্ডা ও বল্টু আফ্রিকার অনেক জায়গায় বিশ্বাস করে, ডাকিনী-যোগিনীরা মড়ার মাংস খাওয়ার জন্য গুপ্তসমিতিতে দেখা করে রাত গভীর হলে। ভারতের মালাবার উপকূলেও জাদুকরদের মধ্যে এই প্রথা ছিল।

অঘোরীরা ছাড়াও পূর্ব আফ্রিকার লোকেরাও বিশ্বাস করে যে মড়ার খুলিতে পানীয় পান করলে অলৌকিক ক্ষমতা বাড়ে। কেল্টিক জাতির মধ্যেও এমন পাত্র ছিল। এমনকি পুরোনো জার্মান দেশেও। তারা বিশ্বাস করত, এমন মড়ার খুলিতে পান করলে, মৃগী রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে।

হিমালয় অঞ্চলে তুষার ঝড়ের সময় মহিলাদের হত্যা করে তাদের খুলি দিয়ে ঢাক তৈরি করত অঘোরীরা। সেই ঢাক বাজিয়ে ভূত-প্রেত তাড়ানোর কাজ চলত।

ব্রিটিশ আমলে আইন বলবৎ করে অঘোরীদের নগ্ন থাকা, নরহত্যা ও নরমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। যদিও কোনো আচার রীতি বা স্বভাব আইন বলবতের মাধ্যমে বন্ধ করা অসম্ভব। এখনও এই অঘোরীরা আছেন। সাধনা রীতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়তো ঘটেছে সময়ের সঙ্গে বাঁচার তাগিদে, তবে তা কেবল বাহ্যিক দিক। দর্শন একই আছে। অঘোরীরা সচরাচর সাধারণ মানুষের সামনে আসেন না এবং কথাও বলেন না। আর সাধন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা তো করেনই না। বর্তমানে কিছু কিছু অঘোরী সাধুদের নানান তথ্যচিত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় দেখা গেলেও, তা খুবই সামান্য।

অঘোরীদের নিয়ে লিখলে আস্ত একখানা বই হয়ে যায়। ভারতের শাক্ত তীর্থগুলি ছাড়াও বিশেষ কয়েকটি মন্দির বা দেবস্থানকে অঘোরীরা তাদের উপাসনাক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব দেন। আবার যে-কোনো শাক্ততীর্থে গেলেই যে অঘোরীদের দেখা মিলবে এমনটাও নয়।

রহস্যে ঘেরা মাউন্ট এভারেস্ট

জানেন কি পাইলটরা মাউন্ট এভারেস্টের ওপরের আকাশপথ দিয়ে বিমান ওড়ান না কেন? কেন তারা এড়িয়েই চলেন এই আকাশপথ। জানেন কি এর নেপথ্যে কী কারণ লুকিয়ে আছে?

বেশিরভাগ বাণিজ্যিক বিমান সংস্থাগুলি সরাসরি হিমালয় পর্বতমালার ওপর দিয়ে বিমান চলাচল এড়িয়ে চলেন। কারণ হিমালয় পর্বতমালার একাধিক চূড়ার উচ্চতা ২০,০০০ ফুট—কিংবা তার থেকেও বেশি। যার মধ্যে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০৩৫ ফুট। আর বেশিরভাগ বাণিজ্যিক বিমান সর্বাধিক ৩০ হাজার ফুচ উচ্চতা পর্যন্ত উড়তে পারে। হিমালয় পর্বতমালার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় পর্বতচূড়া থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওড়ার জন্য বিমানগুলিকে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নীচের অংশের দিক বরাবর এগিয়ে যেতে হয়। আর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বায়ুস্তর অত্যন্ত পাতলা। এই বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রাও অত্যন্ত কম থাকে। আর যার ফলে বাতাসে টালমাটাল পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে এবং তা অনেকাংশেই যাত্রীদের অসুবিধার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি এই স্তরে বায়ুর চাপ অনেকটাই শক্তিশালী এবং পর্বতের উপস্থিতির কারণে বিমান চলাচল অনেকটাই জটিল হয়ে উঠতে পারে।

আকাশপথ সমতল ভূমির ওপর দিয়ে হলে কী হয় আপদকালীন জরুরি অবতরণের প্রয়োজন হলে পাইলট বিমান অবতারণ করতে পারে। কিন্তু এভারেস্টের চারপাশে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কোনো সমতলভূমি নেই। ফলে হঠাৎ করে জরুরি অবতরণের প্রয়োজন হলে তা সম্ভব হয় না। তাই পার্বত্য অঞ্চলে বিমান অবতরণের ঝুঁকির জন্য এভারেস্টের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ। এই একই কারণে তিব্বতের ওপর দিয়েও বিমান ওড়ে না। অনেকে তিব্বতের লাসার প্রসঙ্গ এনে নানান অলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। আর ঠিক একই রকম কারণে জরুরি অবতরণগত সমস্যার কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল করে না।

এছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল কিংবা পার্বত্য অঞ্চলে অক্সিজেনের অভাব একটা বড়ো সমস্যা। সেকারণে পার্বত্য অঞ্চলে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় বিমান চালানো মানে মৃত্যুকে স্বাগত জানানো। এর পাশাপাশি, এই ধরনের এলাকায় জনবসতি কম হওয়ার জন্য রাডার পরিসেবার অস্তিত্বও প্রায় নেই বললেই চলে, সুতরাং পাইলটেরও ভূমির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো চান্স নেই। আরও একটা বিষয় আছে, সেটি অত্যন্ত গোপন এবং নিরাপত্তা বিষয়ক। ভারতীয় বায়ুসেনা এবং পিপলস লিবারেশন আর্মি এয়ার ফোর্সের প্রশিক্ষণ চলে হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চলে। এভারেস্টের আশেপাশে ভারতীয় বায়ুসেনার বেশ কিছু বেস-ক্যাম্প আছে। সে কারণে বাণিজ্যিক বিমান এই অঞ্চলে ওঠা-নামা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। দেয়াল মানচিত্রে এই দূরত্ব পরিমাপ করলে আপনার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। কারণ আমাদের পৃথিবী কিন্তু আয়তকার নয়, গোলাকার। বিষয়টি বোঝার জন্য আপনি একটা গ্লোব নিন। এবার গ্লোবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্য এশিয়ার কোনো দেশ চিহ্নিত করুন। এবার একটি সুতোর সাহায্যে বিমানের যাত্রাপথ এবং সমুদ্রের ওপরের যাত্রাপথ মেপে দেখুন, দেখতে পাবেন সোজা পথের চেয়ে বাঁকানো পথই স্বল্পদৈর্ঘ্যের।

এবার চলে আসি মাউন্ট এভারেস্টের বেশ কিছু গল্পে। আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন, সর্বপ্রথম কে এভারেস্ট জয় করেছিলেন? মনে মনে হয়তো আপনি ভেবে নিয়েছেন যে, উত্তরে তিনি স্যার অ্যাডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগের নাম বলবেন। কিন্তু আপনি যদি কোনো ব্রিটিশ নাগরিককে এই প্রশ্ন করেন তাহলে সে আপনাকে চমকে দিয়ে কি উত্তর দেবে জানেন? – জর্জ ম্যালোরি এবং তাঁর সহযোগী অ্যান্ড্রু অরভিন। অ্যান্ড্রুর ডাকনাম ছিল স্যান্ডি। কেউ কেউ স্যান্ডি অরভিনও বলে থাকেন।

ব্রিটিশ নাগরিকের মুখে এই দুই পর্বতারোহীর নাম শুনে মোটেও অবাক হবেন না। কারণ অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। ব্রিটিশ নাগরিকরা বেশিরভাগই বিশ্বাস করেন না যে হিলারি

ও নোরগে প্রথম মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন। তাদের স্থির বিশ্বাস, হিলারি এবং নোরগেরও ত্রিশ বছর আগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয় করেছিলেন ব্রিটিশ পর্বতারোহী জর্জ ম্যালোরি এবং তাঁর সহযোগী স্যান্ডি।

ব্রিটিশদের এই বিশ্বাস যে একেবারেই অমূলক তা কিন্তু নয়। এভারেস্টকে বলা হয় পৃথিবীর তৃতীয় মেরু। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই পৃথিবীর দুই মেরুতে মানুষ তার পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু এভারেস্ট। আর এভারেস্টের চূড়ায় নিজেদের পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার জন্য সবার আগে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ পর্বতারোহীরা এবং সে কারণেই বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ১৯২১ সালে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করার প্রথম পরীক্ষামূলক চেষ্টাটিও করেছিল তারা। এই পরীক্ষামূলক অভিযানের একজন সদস্য ছিলেন ইংল্যান্ডের মবেরিতে ১৮৬৬ সালে জন্ম নেয়া জর্জ ম্যালোরি। এই অভিযান হয়েছিল তিব্বতের দিক দিয়ে। তিব্বতের পথে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার রাস্তা আবিষ্কার করেছিলেন জর্জ ম্যালোরি এবং গাই বুলক

জর্জ ম্যালোরি ছিলেন একজন ধর্মযাজক। পাদ্রীদের বংশধর জর্জ উইনচেস্টার কলেজে পড়াশোনার করার সময় তাঁর একজন শিক্ষকের অধীনে আল্পস পর্বতমালায় ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং আল্পসের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন। সেই প্রথমবার তাঁর পর্বতারোহণের দক্ষতা প্রকাশ পেল। তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন জর্জ।

শিক্ষকতার পাশাপাশি চলল পর্বত অভিযান। জর্জ কখনও যেতেন আল্পস পর্বতে আবার কখনও বা যেতেন ওয়েলস পর্বতে। দক্ষ পর্বতারোহী হওয়ার জন্য প্রায়শই পর্বতারোহণ করতেন। দক্ষতা ঝালাই করে নিতেন বিভিন্ন অভিযানের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন সময়ের অন্যান্য পর্বতারোহণকারীরা খেয়াল করেছিলেন, জর্জের পর্বতারোহণের কৌশল, দক্ষতা অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জর্জ ম্যালোরি ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিলেন। ১৯১৯ সালে যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি আবার শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মধ্যে থেকে তখনও কাটেনি।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ এই সময়ের মধ্যে তিনটি এভারেস্ট অভিযান চালানো হয়েছিল। এই অভিযানে যে ২৬ জন যোগ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ২০ জনই যুদ্ধের ভয়াবহতার সাক্ষী ছিলেন। জর্জ দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিটেনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আল্পাইন ক্লাবের সদস্য ছিলেন। তাই ক্লাবটি যখন ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয়ের অভিযান পরিচালনার কথা ভাবছিল, স্বাভাবিকভাবে এই অভিযাত্রিক দলের সদস্য জর্জ ম্যালোরিই ছিল তাদের অন্যতম পছন্দ।

জর্জদের সেই গ্রুপের অভিযান ছিল নিছক পরীক্ষামূলক। এভারেস্ট জয় করতেই হবে এমন কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না। পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য তারা নর্থ পোলের বেশি ওপরে উঠতে পারলেন না। তারা শুধু রাস্তা আবিষ্কার করলেন ও ফিরে এলেন। ফলে চূড়ায় ওঠার নেশাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। ফলে এর পরের বছর ১৯২২ সালেই আর একটি অভিযান চালানো হল, যা ছিল এভারেস্ট জয়ের সর্বপ্রথম পরিকল্পিত অভিযান। সেই অভিযানে ৭ জন শেরপা তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে মারা গেলেন। এই অভিযানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ব্রিটিশ পর্বতারোহী জর্জ ম্যালোরি। ব্যর্থ মন নিয়ে এভারেস্টের চূড়ার অনেকটা কাছ থেকে ফিরে এলেন তিনি। অনেকেই ধরে নিলেন তাঁর আর এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা হবে না।

দেখতে দেখতে জর্জের বয়স বেড়ে ৩৬-এর কোঠায়। ৩ সন্তানের জনক হয়েছেন তিনি। কিন্তু যাই হোক এভারেস্টের নেশা তাঁকে আর ছাড়তে চায় না। যে করেই হোক এভারেস্ট তাকে জয় করতেই হবে—এটাই ছিল জর্জের ধ্যান-জ্ঞান। তাই শেষবারের মতো আবারও এভারেস্টে জয়ের নেশায় ছুটলেন তিনি।

১৯২৪ সালে এভারেস্ট জয়ের অদম্য ইচ্ছা নিয়ে আবারও অভিযানের পরিকল্পনা করলেন জর্জ ম্যালোরি। এই অভিযানের পরিকল্পনা করতে দেখে একটু অবাক হয়ে পড়লেন জর্জের স্ত্রী রুথ। সন্তান এবং পরিবারের কথা বলে স্ত্রী তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে, তাঁকে পরিবারের পাশে, সন্তানদের পাশে থাকা খুব প্রয়োজন। কিন্তু মন যার পড়ে আছে এভারেস্টে তাঁকে কি আর ফেরানো যায়। স্ত্রীর মন রক্ষার্থে জর্জ স্ত্রীকে বললেন, "এবার যদি এভারেস্ট জয় করতে পারি তাহলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় তোমার একটা ছবি রেখে আসব।"

স্ত্রীকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে, স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও জর্জ ম্যালোরি যাত্রা করলেন এভারেস্টের দিকে। ১৯২৪ সালে জর্জের এভারেস্ট অভিযানের অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগলো জর্জ ম্যালোরির নাম। নিউইয়র্কে বেশ বড়ো করে ম্যালোরিকে নিয়ে হল সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ম্যালোরিকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "আপনি কেন মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে চান?" জর্জ উত্তর দিলেন, "বিকজ ইটস দেয়ার!"

এবার তাঁর সঙ্গী হলেন মাত্র ২২ বছর বয়সি অ্যান্ড্রু অরভিন ওরফে স্যান্ডি। ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত অভিযানের প্রথম দুটির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না তারা। এদিকে জুন মাস, আসছে মৌসুমি আবহাওয়া। দেরি করা সম্ভব নয়। সেখান থেকেই স্ত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন জর্জ। চিঠির বয়ান বড়ো মর্মস্পর্শী, "বর্ষাকাল এগিয়ে আসছে। এর পর আর ওঠার সুযোগ পাবো কি না জানি না। আমি এখানে পড়ে থাকতে চাই না। পরশুদিন আমরা যাত্রা শুরু করতে চাই।"

তারপর জর্জ আর স্যান্ডি এভারেস্ট জয়ের পণ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো অভিযান শুরু করলেন। ৪ জুন তারা দুজন অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হয়ে পরের তিন দিনে ৬ নম্বর বেস-ক্যাম্পে পৌঁছোলেন। ৮ জুন দুজন ৬ নম্বর বেস-ক্যাম্প থেকে রওনা হয়ে সেদিন দুপুরের মধ্যে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। শুরু হল প্রবল তুষার ঝড়! পরেরটা চাপা পড়ে যাওয়া ইতিহাস। যে ইতিহাস মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভারেস্টে চাপা পড়ে যায়। হিমালয়ের এই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস বড়ো বিচিত্র।

প্রশাসন জানিয়েছিল, জর্জ আর অ্যান্ড্রুকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল এভারেস্টের ৮,৬০০ মিটার উচ্চতায়। সেখান থেকে চূড়ায় উঠতে তাদের বাকি ছিল আর মাত্র আড়াইশো মিটার। আশা করা যায়, খুব কাছাকাছিই চলে গেছিলেন তারা। কিন্তু তাদেরকে আর কখনও দেখা যায়নি। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন দুজনই জর্জ আর অ্যান্ড্রু?

এই দুই পর্বতারোহীর মৃত্যু এভারেস্ট পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক বড়ো রহস্যের জন্ম দেয়। সকলের মনেই প্রশ্ন দানা বাঁধে, তারা কি পেরেছিলেন শেষপর্যন্ত এভারেস্ট জয় করতে? নাকি তার আগেই মারা যান?

১৯৩০ সালের এক অভিযানে অরভিনের আইস অ্যাক্স বা কুঠার খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ৮,৪৪০ ফুট উচ্চতায়। তারপর ১৯৯১ সালের এক অভিযানে ১৯২০ সালের অভিযানে ব্যবহৃত অক্সিজেন ক্যানটি খুঁজে পায় একটি অভিযাত্রী দল। এভাবেই ছোটো ছোটো কিছু নমুনা পাওয়া যাওয়ায় ১৯৯৯ সালে জর্জ আর অ্যান্ড্রুকে খুঁজতে একটি অভিযান হয়। যে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ম্যালোরি আর অরভিনের মৃতদেহ আর তাদের ক্যামেরাগুলি খুঁজে বের করা। কারণ, যদি ক্যামেরাটি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো সেখান থেকে জানা যেতে পারে তারা এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন কী রাখেননি।

ওয়াখেন হেমলের একজন জার্মান লেখক, যিনি নিজে একজন অভিযাত্রীও। ১৯৯৯ সালের যে দলটি এভারেস্টে জর্জ ম্যালোরির মরদেহ খুঁজে পায় তিনি ছিলেন সেই দলের একজন সদস্য। জর্জ ম্যালোরির জীবন এবং রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাগুলো ছেলেবেলা থেকেই তাকে খুব টানত। তিনি লিখছেন, "আমার বাবাও ছিলেন একজন পর্বতারোহী। আমার বয়স যখন ছয় বা সাত বছর, তখন তিনিই প্রথম আমাকে এসব গল্প

শোনান। তখন থেকেই জর্জ ম্যালোরি এবং তার সঙ্গী আরভিন সম্পর্কে শুনতাম। তাদের সম্পর্কে খবরের কাগজে যা ছাপা হত তা আমি সংগ্রহ করে রাখতাম। এসব খবরের মধ্যে একটি ছিল ১৯৭৫ সালের, যেখানে একজন চিনা পর্বতারোহী দাবি করেছিলেন যে এভারেস্টের উত্তর পাশ দিকে আরোহণের সময় তিনি একজন বৃদ্ধ ইংরেজের মরদেহ দেখতে পেয়েছেন। এটা ম্যালোরি কিংবা আরভিন ছাড়া আর কারও হতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হল ওই চিনা পর্বতারোহী ঠিক কোথায় এই মরদেহটি খুঁজে পান সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য তুলে ধরেননি। পরে তিনি নিজেও এক তুষারধসে প্রাণ হারান।" মি. হেমলের লিখছেন, "আমার হাতে শুধু একটি প্রমাণ ছিল। তা হল চিনা পর্বতারোহীর ক্যাম্পের একটি ছবি। সম্ভবত, সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই তিনি মরদেহটি দেখতে পান। আমি ছবিটি বিশ্লেষণ করি এবং ওই ক্যাম্পের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হই। এটা যখন আমি ইন্টারনেটে প্রকাশ করি তখন একটি আমেরিকান অভিযাত্রী দলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। জর্জ ম্যালোরির মরদেহ খুঁজে বের করে পর্বতারোহণের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো এক রহস্যের সমাধান করার আশায় যে কটি দল অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল এই মার্কিন দলটি ছিল তাদের মধ্যে একটি। জর্জ ম্যালোরিই প্রথম এভারেস্ট জয় করতে পেরেছিলেন কি না সে সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

ওয়াখেন হেমলের লিখছেন, "আমেরিকানরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এই বলে যে তারা যদি তার দেওয়া তথ্য ব্যবহার করতে পারে তবেই তারা তাকে অভিযাত্রী দলের সদস্য হিসেবে সঙ্গে নেবে। এটা ছিল আমার প্রথম হিমালয় আরোহণ। সব কিছুই ছিল আমার কাছে একেবারে নতুন সব সরঞ্জাম, অক্সিজেনের বোতল, দড়ি-কাছি—এগুলো সম্পর্কে ধারণা ছিল না। কিন্তু আমার কাছে এটা ছিল ছেলেবেলার স্বপ্নপূরণ।" ওয়াখেন হেমলের লিখছেন, যেহেতু আমার পর্বতারোহণের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই আমাকে থাকতে হয়েছিল পর্বতের বেস-ক্যাম্পে। সেখানে আমার দায়িত্ব ছিল টেলিস্কোপ এবং ওয়্যারলেস ব্যবহার করে আরোহী দলকে পথনির্দেশনা দেওয়া। অভিযান শুরু হওয়ার পাঁচ সপ্তাহ পর অভিযাত্রী দলটি প্রথম টের পেলেন তারা রহস্য সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। বেশ কিছু সময় অপেক্ষার পর বেস ক্যাম্প থেকে দেখা গেল এভারেস্টের ওপর থেকে ছায়া সরে গিয়েছে এবং সূর্যালোক পর্বতের গায়ে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। তখন নাটকীয় সব ঘটনা ঘটতে লাগল।

আট হাজার দুশো মিটার উচ্চতায় ছিল আর একটি ক্যাম্প। নাম তার ক্যাম্প সিক্স। এই ক্যাম্প-সিক্সেই অভিযাত্রীরা খুঁজে পেলেন একটি জলের বোতল। যেটি এসেছিল ১৯৭৫ সালের চিনা অভিযান থেকে। সেখানে তারা খুঁজে পেলেন অন্যান্য আরও বেশ কয়েকজন অভিযাত্রীর মরদেহ। যারা এভারেস্ট জয় করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। অভিযাত্রীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা জায়গা মতো পৌঁছে গিয়েছেন।

ওয়াখেন হেমলের লিখছেন, "অভিযান শুরু করার আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আবিষ্কার হলেই শুধুমাত্র বেতারের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে এবং কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে। যাতে অন্য কেউ যদি সেই বেতার বার্তা আড়ি পেতে শোনে তাহলে তারা কিছু বুঝতে পারবে না। তাই ঠিক করা হয়েছিল 'বোল্ডার' শব্দটার অর্থ হবে হয় ম্যালোরি কিংবা অরভিনের মরদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর 'গোরাখ' শব্দটার মানে হবে এই দুজনের কোনো একজনের ক্যামেরাটি পাওয়া গিয়েছে। এটার গুরুত্ব এই জন্য যে ম্যালোরি যদি সত্যিই এভারেস্টের চূড়ায় উঠে থাকেন, তাহলে সেই প্রমাণ থাকবে ক্যামেরার ছবিতে। সকাল প্রায় ১১টার দিকে সঙ্গী অভিযাত্রী কনরাড এঙ্কা প্রথম একটি ম্যাসেজ পাঠালেন। কিন্তু সমস্যা হলে সেই মেসেজের আসল অর্থ কী সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। তারপর টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলাম অভিযাত্রীরা রাতের বেলা যেখানে ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন সবাই সেখানে এসে জড়ো হচ্ছেন। কিন্তু বেলাশেষে সন্ধে ছটার দিকে যে শেষ রেডিয়ো বার্তা এল সেখানে একজন খুবই সতর্কভাবে বলল, ওয়াখেন তুমি

এই খবর শুনে খুব খুশি হবে। আমি বুঝতে পারলাম হয় ম্যালোরি, নয়তো অরভিনের মরদেহ তারা শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে।”

তিন দিন পর অভিযাত্রীরা বেস-ক্যাম্পে নেমে এল। সঙ্গে নিয়ে এল ম্যালোরির পোশাক আর কিছু নমুনা। ওয়াখেন হেমলের লিখছেন, “অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছিল জর্জ ম্যালোরির মৃতদেহ। আর বেস ক্যাম্প থেকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সব কিছুই ম্যালোরির পোশাকের মধ্যেই পাওয়া গেছিল। শুধু ছিল না তাঁর স্ত্রীর ছবি, যে ছবিটি তিনি এভারেস্টের চূড়ায় রেখে আসার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে।

তাহলে কি এভারেস্টের চূড়ায় রেখে এসেছিলেন সেই ছবি আর নেমে আসার সময় তুষার ঝড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল? এই অভিযানে ম্যালোরির গগলসটিও পাওয়া গিয়েছিল তাঁর জামার পকেটে। চোখের গগলস পকেটে থাকার কারণে তাঁদের এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করে। শেষবার তাঁদেরকে যেখানে দেখা গেছিল সেখান থেকে চূড়ায় উঠতে গেলে সন্ধ্যার আগেই উঠে যাওয়া সম্ভব ছিল, অর্থাৎ তাঁরা চূড়ায় উঠেই আগে গগলসটি খুলে পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। কারণ রাতের বেলা বা সন্ধ্যার পর গগলস পরার প্রয়োজন নেই। হাজারো প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শেষ হল সেবারের অভিযান।”

এদিকে সেই অভিযানের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। একাধিক ব্রিটিশ পর্বতারোহীরা বিরূপ ভাষায় আক্রমণ করে বসেন এই অভিযাত্রী দলটিকে শুধু তাই নয়, ম্যালোরির পরিবারের সদস্যরা এই অভিযাত্রীদের কাজের বিরোধীতা করেন। অবশেষে ম্যালোরির পরিবারের ইচ্ছে অনুযায়ী আমেরিকান অভিযাত্রীরা ম্যালোরির মরদেহ এভারেস্টের ঢালেই রেখে আসেন। ম্যালোরির পরিবার কেন এধরনের আচরণ করল তা কেউ জানে না। জর্জ ম্যালোরির মরদেহ আবিস্কারের পর ওয়াকেন হেমলের আরও তিনবার এভারেস্টে উঠেছিলেন। হেমলের এর পর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন নিউইয়র্ক টাইমসকে সেখানে তিনি বলেন, “আমেরিকান অভিযাত্রীরা ম্যালোরির মরদেহ এভারেস্টের ঢালেই রেখে আসতে বাধ্য হলেন। একটা ইতিহাস চাপা পড়ে থেকে গেল এভারেস্টের বুকে।” এর পর চলে একাধিকবার এভারেস্ট অভিযান কিন্তু অরভিনের মৃতদেহ বা তাঁর কোডাক ক্যামেরার কোনোটিরই আর খোঁজ মেলেনি।

ম্যালোরি আর অরভিনের এভারেস্ট অভিযান নিয়ে নানা সময়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। এসেছে বিভিন্ন তত্ত্ব, এসেছে ম্যালোরি এবং অরভিনের এভারেস্ট জয় করা নিয়ে অনেক গল্প কিন্তু কেউই জোর গলায় বলতে পারেননি যে তারা এভারেস্ট জয় করতে পেরেছিলেন কি না। শেষমেশ সব রহস্যের সমাধান করতে এগিয়ে আসেন জর্জ ম্যালোরির ছেলে। তিনি বলেছিলেন, “শুধু এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারাটাই এভারেস্ট জয় করা নয়, সেখান থেকে সফলভাবে নেমে আসাও এর অংশ।” ম্যালোরির ছেলে হয়তো অনেকটা আক্ষেপ নিয়েই কথাটি বলেছিলেন। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়, আসলেই কি ম্যালোরি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় নিজের পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন?

এবার মাউন্ট এভারেস্টের কিছু অলৌকিক গল্প বলি। এভারেস্টে নাকি অশরীরী ছায়ামূর্তি দেখা যায়! আর এ নিয়ে নানান গল্প ছড়িয়ে রয়েছে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রমন্ত্র ও নানা রকম কুসংস্কারে বিশ্বাসী শেরপারাই শুধু নয় পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষিত অনেক পর্বতারোহীও এভারেস্টে বিভিন্ন অস্বাভাবিক অবয়বের উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে বিভিন্ন সময় দাবি করেছেন।

এভারেস্ট অভিযানের একেবারে শুরুর দিকের কথা। সেই অভিযানের ঘটনা। বিখ্যাত ব্রিটিশ পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মিথ বেশ কয়েকবার মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণের চেষ্টা করেছেন। ১৯৩৩ সালে প্রথমবারের মতো এভারেস্ট আরোহণের সময় স্মিথ তাঁর পাশে অদ্ভুত কিছুর উপস্থিতি অনুভব করেন। এভারেস্টের নর্থ রিজ ধরে ৮৫৬৫ মিটার উচ্চতায় তিনি তখন একা একা আরোহণ করছিলেন। ব্যখ্যাতীত এই ঘটনাটির কথা তিনি তাঁর বই ‘ক্যাম্প সিক্স’-এ লিখে গেছেন, “…অদ্ভুত দুটি বস্তু আকাশে ভাসতে দেখলাম। একটু ভালোভাবেই

তাকাতে বস্তু দুটির অবয়ব স্পষ্টত হল। তারা দেখতে একেবারে ঘুড়ি বেলুনের মতো ছিল। এদের একটির ওপর আবার খাটো করে অপরিণত ডানা ও আর একটির গা থেকে বেড়িয়ে ছিল পাখির ঠোঁটের মতো স্ফীত কিছু, যেখান থেকে চায়ের কেটলির মুখ দিয়ে বাষ্প উদগিরণের মতো ধোয়া বের হচ্ছিল। এক জায়গায় স্থির হয়ে তারা ভাসছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে জীবন্ত কিছু স্পন্দিত হচ্ছিল। বস্তু দুটি আমার হৃৎস্পন্দনের চাইতেও ধীরে স্পন্দিত হচ্ছিল।”

স্মিথ আরও দাবি করেন, নর্থ পোলের ঢাল বেয়ে তিনি যখন একাকী আরোহণ করছিলেন তখন অন্য কারও উপস্থিতির অনুভূতি তাকে অবাক করে দেয়। সেই অশরীরী ছায়ামূর্তিকে এতটাই বাস্তব মনে হচ্ছিল যে স্মিথ তাকে দেওয়ার জন্য পকেট থেকে এক টুকরো কেকও বের করেছিলেন।

ভূতের সঙ্গে কিনা কেক ভাগাভাগি। ভাবা যায়। তাহলে কি যারা অশরীরী আত্মার কথা বলেন তারা ঠিক? আসলে কি সত্যিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে? অশরীরি কোনো কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে এভারেস্টে? এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে এভারেস্টের মৃত্যুমিছিলের ইতিহাসে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক।

এখন পর্যন্ত ২২০ জনেরও অধিক পর্বতারোহী এভারেস্টে মারা গেছেন। দুর্গম ও দুরহ এভারেস্টের ঢালে মৃতদেহ উদ্ধার করা একই সঙ্গে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল হওয়ায় বেশির ভাগ মৃতদেহই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ মৃতদেহই এভারেস্টের ঢালে চির তুষারাবৃত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। এত লাশ এখানে জমা হয়ে আছে যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ কবরস্থান এটিকে বলাই যায়।

কিছু লাশ রয়ে গেছে এভারেস্ট আরোহণের বহুল ব্যবহৃত ট্রেইলের একদম পাশেই। আসতে যেতে নতুন আরোহীদের প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয় এদের সঙ্গে। সাদা তুষারে নিথর পড়ে থাকা মৃত পর্বতারোহীদের গায়ের রংবেরঙের পোশাক আর গিয়ারের জন্য এভারেস্টের উত্তর-পূর্ব রিজের নামই হয়ে গেছে তাই রেইনবো ভ্যালি বা রামধনু উপত্যকা।

প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয়ের কোলে বাস করা জাতিগোষ্ঠীদের বিশ্বাস, হিমালয় জুড়ে দেবতাদের রাজত্ব। তিব্বতের ধর্মমতে তন্ত্র-মন্ত্র, দেবী দেবতা ও দানবের প্রভাব বেশ বলিষ্ঠ। শেরপারা বিশ্বাস করে, পর্বতে অপঘাতে যারা মৃত্যুবরণ করে, যাদের শেষকৃত্যটুকুও হয় না, তাদের আত্মা কখনোই নির্বাণ পায় না, স্বর্গ-নরক কোথাও তাদের জায়গা হয় না। চিরকাল তারা অতৃপ্ত আত্মা হিসেবে বিক্ষিপ্তভাবে পর্বতে ঘুরে বেড়ায়। আর পর্বতে এরকম আত্মার সংখ্যা এত বেশি যে বাড়ি ফিরতে দেরি হলেই তারা ভাবেন এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটল।

শেরপারা হিমালয়কে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে। তারা মনে করে হিমালয়ের দেবী খেপে গেলে তিনি ভয়ানক শাস্তি দেবেন। দেবীর আক্রোশে অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে আর তাদের আত্মা অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য, রোমাঞ্চ আর স্থানীয় মিথের আখড়া এই হিমালয় ধারণ করে এমন কিছু রহস্য, যা এখনও আমরা ঠিকঠাকভাবে বুঝে উঠতে পারিনি।

তাহলে, সাগরমাথায় পেম্বা আর স্মিথের অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করে শেরপাদের বিশ্বাসই সঠিক? সংশয়বাদীরা অবশ্য বলেন পর্বতারোহীদের এই অবাস্তব কিছুর সংস্পর্শে আসা বা অশরীরী কোন ছায়া দেখার ঘটনাকে মানুষের মন ও মস্তিষ্কের ওপর কঠিন পরিবেশ ও অতি উচ্চতায় প্রভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে, শারীরিক দুর্বলতায়, অবিশ্বাস্য রকম ঠান্ডায়, ক্ষুধার্ত পেটে, স্বল্প অক্সিজেনে ও অতি উচ্চতাজনিত অসুস্থতার সংমিশ্রণে মানব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকারিতা সহজেই নড়বড়ো হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সব কিছু মিলিয়ে এক ধরনের ইন্দ্রজালের মতো হ্যালুসিনেশন তৈরি করে।

এই অন্য কারও অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করার বিষয়টিকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন, FOP বা Feeling of Presence মাইকেল সারমা'র 'দ্যা বিলিভিং ব্রেইন' বইয়ে এই

হাইপোথিসিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই হাইপোথিসিস অনুযায়ী এফওপি সিনড্রোম শুধু পর্বতারোহীদেরই হয় না। এটা হতে পারে মেরু অভিযাত্রী, নিঃসঙ্গ নাবিক অথবা নিরবিচ্ছিন্ন অনুশীলনরত কোনো ক্রীড়াবিদের সঙ্গেও। অর্থাৎ প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক চাপে থাকা যে-কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারেন এফওপি এফেক্টে।

এই হাইপোথিসিসকে কেন্দ্র করে ২০১৪ সালে বৈজ্ঞানিকভাবে একটি গবেষণা করা হয়েছিল এভারেস্টে। সে-বছর সুইস বিজ্ঞানীদের একটি দল ভূত দেখা সংক্রান্ত গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন। মানব মস্তিষ্কের যে অংশে মোটর সেন্সরি সিগন্যাল গৃহীত হয় সেই অংশটি নিয়ে গবেষক টিম গবেষণা চালায়।

পরীক্ষা শেষে গবেষকরা বলেন, অশরীরী ছায়া দেখা বা এই এফওপি এফেক্ট আসলে মস্তিষ্ক দ্বারা সৃষ্ট এক ধরনের মায়া। আমরা যখন প্রচণ্ড রকম মানসিক চাপে থাকি বা মারাত্মক শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যাই বা নিঃসঙ্গতা থেকে বিষণ্ণ থাকি তখন আমাদের অবচেতন মনের চিন্তা ও কল্পনা মস্তিষ্কে এক ধরনের ইলিউশন বা ভ্রম তৈরি করে।

হিমালয়ের অতি উচ্চতায়, মারাত্মক ক্লান্ত অবস্থায় অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে এফওপি সিড্রোম হবার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়। ১৯৭৫ সালের ব্রিটিশ এভারেস্ট অভিযানের অভিযাত্রী দলের সদস্য ডোগাল হাসটন ও ডগ স্কট এরকমই এক ভয়াল রাতের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

হাসটন ও স্কট এভারেস্ট সামিট করে নীচে নামার সময় তাঁদের অক্সিজেন সিলিন্ডারে ত্রুটি দেখা দেয়। খারাপ আবহাওয়া থেকে বাঁচতে তারা আট হাজার মিটারের ওপরে ডেথজোনের একটা জায়গায় তুষার খুঁড়ে গুহা বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোনও ধরনের খাবার-দাবার, স্লিপিং ব্যাগ ছাড়া ক্লান্ত শরীরে তারা দীর্ঘ রাত কেটে যাবার প্রতীক্ষা করছিলেন। এক সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা অতিরিক্ত অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায় যখন তাঁদের সঙ্গে থাকা স্টোভের বিউটেন গ্যাসও শেষ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন কি না সে ব্যাপারে তারা কেউই আশাবাদী ছিলেন না।

এমন সময়ে দুজন অনুভব করেন গুহায় তাদের সঙ্গে তৃতীয় আর একজন উপস্থিত হয়েছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার উপস্থিতি দুজনই টের পাচ্ছিলেন। সারারাত ধরে সেই অদৃশ্য অশরীরি তার শরীরের উত্তাপ দিয়ে দুজনের হিম হয়ে যাওয়া শরীরকে গরম করার চেষ্টা করে গেছে, সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে কথা বলে কীভাবে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যাবে এই ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল।

পিটার হিলারি থেকে শুরু করে লিংকন হল বা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী রেইনহল্ড মেসনার ও তাঁদের পর্বতাভিযানের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এমন এক অশরীরী ছায়ার উপস্থিতির কথা বলেছেন।

এভারেস্টের এমন আর একটি রহস্যময় ঘটনার কথা বলি। ১৯৯৬ সালে এভারেস্ট অভিযানে এক ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ে মারা যান আট অভিযাত্রী, ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে পড়েন আরও অনেকে। এভারেস্ট আরোহণের ইতিহাসে ভয়াবহতম এই বিপর্যয় নিয়ে জন ক্র্যাকায়ার লিখেন তাঁর বেস্ট সেলার বই 'ইনটু থিন এয়ার'। এই বইয়েই বর্ণনা করা হয়েছে অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনাটি। ঝড় যখন এভারেস্টের দেয়ালে আঘাত হানে জন তখন নীচে নেমে আসছিলেন। ক্যাম্প ফোরের কাছাকাছি এসে তাঁর মনে হয় তাঁর দলসঙ্গী অ্যান্ডি হ্যারিস সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েকবার ডাকাডাকি করলেও সেই ছায়ামূর্তি তার কোনো উত্তর দেয়নি। অনেক পরে আবিষ্কার হল দুর্ভাগা অ্যান্ডি হ্যারিসের মৃতদেহ ক্যাম্প থেকে অনেক ওপরে নিথর পড়ে আছে। তাহলে জন আসলে কাকে দেখেছিল সেই সময়? এটা কি তার ভ্রম ছিল, নাকি এভারেস্টের হিমশীতল এই রাজ্যে আসলেই আছে কোনো অশরীরী?

পৃথিবীর সর্বোচ্চ এই পর্বতের অশরীরি রহস্যকে আধুনিক বিজ্ঞান আর গবেষকেরা হয়তো নানাভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারেন, কিন্তু ওই বিশেষ মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তাই বলে মিথ্যে হয়ে

যায় না। যেমন মিথ্যে হয়ে যায় না দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার অনুভূতি, যেমন মিথ্যে হয়ে যায় না অন্ধকার নির্জন রাতে শ্মশানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় গা ছমছমে অনুভূতি—যদিও আমাদের জানা থাকে ভয় পাবার কোনো কারণই নেই। তারপরেও অজানা কারণে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে যায়, হাতের লোম দাঁড়িয়ে যায়। তেমনি সব ব্যাখ্যার পরেও চির তুষারাবৃত হিমালয় তার সব সৌন্দর্য, রোমাঞ্চ, লোকগাথা আর কিংবদন্তির সঙ্গে ঢাকা থাকে রহস্যের মোড়কে।

মাউন্ট এভারেস্ট নিয়ে কিছু তথ্য :

মাউন্ট এভারেস্টের কিন্তু শুধু একটিই নাম নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই এভারেস্টকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে-

১. নেপাল এই এভারেস্টকে 'সাগর মাথা' বা 'গডেস অফ দ্য স্কাই' নামে ডেকে থাকে। 'চোমোলুংমা' বা মাদার গডেস অফ দ্য ইউনিভার্স নামে ডেকে থাকেন তিব্বতিরা।

২. কেন্টন কুল নামে এক পর্বতারোহী ২০১১ সালে এভারেস্টের চূড়া থেকে প্রথমবার টুইটারে টুইট করেছিলেন।

৩। গুগল তাঁর google map-এ মাউন্ট এভারেস্টের সম্পূর্ণ ছবি দেওয়ার জন্য তাদের একটি দলকে ১২ দিন ধরে ছবি তুলিয়েছিল।

৪. 'মাউন্টেন স্পাইডার', হ্যাঁ। এভারেস্টে চড়তে হলে এই স্পাইডারদের মুখোমুখি আপনাকে হতেই হবে। হিমালয়ের শৃঙ্গে চড়তে গেলে কোনোভাবেই আপনি এদের এড়িয়ে যেতে পারবেন না। এই মাউন্ট স্পাইডারদের ৬৭০০ মিটার ওপরেও দেখতে পাওয়া যায়।

৫. ব্রিটিশ নাগরিক অ্যান্ড্রু ওয়া ১৮৮৭ সালে মাউন্ট এভারেস্টের নাম দিয়েছিলেন।

৬. মাউন্ট এভারেস্টের ৮০০০ মিটার ওপরকে 'ডেথ জোন' বলা হয়ে থাকে। কারণ, ৮০০০ মিটার ওপরে পর্বতারোহীরা পাহাড়ে এক অজানা অসুস্থতায় পড়েন। এমনকি তাঁরা দিক নির্দেশনাও হারিয়ে ফেলেন। আর অক্সিজেনের অভাবতো আছেই। যার ফলে অনেক পর্বতারোহীর মৃত্যুও ঘটে।

৭. আপনি চাইলেই ফ্রি-তে মাউন্ট এভারেস্টে চড়তে পারবেন না। এর জন্য আপনাকে প্রায় ৩০ হাজার ডলার গুনতে হবে।

৮. আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন মাউন্ট এভারেস্টকে বিশ্বের সবচেয়ে নোংরা এভারেস্ট বলা হয়ে থাকে। কারণ, মাউন্ট এভারেস্টে প্রচুর বিয়ারের ক্যান থেকে শুরু করে অক্সিজেনের ভারী ভারী বোতল দেখতে পাওয়া যায়। যা গুনে শেষ করা যাবে না। তাই এটি বিশ্বের সবচেয়ে নোংরা পর্বত।

৯. একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রতি ১০ পর্বতারোহীর ১ জন পর্বতে চড়তে গিয়ে মারা যায়।

১০. বিশ্বের প্রায় সব দেশের মানুষই মাউন্ট এভারেস্টে চড়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সফল হননি।

হিলারি, নাকি তেনজিং-কে ছিলেন প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী?

"১৯৫৩ সালের ২৯ মে-র সেই সকাল থেকেই, যখন তেনজিং নোরগে এবং আমি প্রথমবারের মতো পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করতে সক্ষম হলাম, আমাকে এক মহান অভিযাত্রী হিসেবে বর্ণনা করা হতে থাকে। কিন্তু আমি আসলে স্রেফ এক পোড় খাওয়া কিউয়ি, যে জীবনের বহু প্রতিকূলতাকে উপভোগ করেছে মনে-প্রাণে।" -ন্যাশনল জিয়োগ্রাফিক পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এটাই ছিল এভারেস্ট বিজয়ী এডমন্ড হিলারির প্রতিক্রিয়া।

এভারেস্ট শিখর থেকে নামার পথে অনেকটা সময় পরে প্রথম যে মানুষটির সঙ্গে হিলারি ও তেনজিং-এর দেখা হল, তিনি ছিলেন সেই ঐতিহাসিক অভিযানের আর একজন কিউয়ি, এডমন্ড হিলারির ঘনিষ্ঠ বন্ধু জর্জ লোয়ে। যিনি হিলারি এবং তেনজিং-এর জন্য গরম স্যুপের

পাত্র নিয়ে বেশ খানিকটা উপরের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। বন্ধুকে দেখতে পেয়ে হিলারি বললেন তাঁর সেই অমর বাক্য—Well, George, we knocked the bastard off.”

এভারেস্ট থেকে নেমে আসার পরই একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন দক্ষ পর্বতারোহী এডমন্ড হিলারি এবং শেরপা তেনজিং। প্রথম এভারেস্ট শিখরে কে উঠেছিলেন—হিলারি না তেনজিং? এই প্রশ্ন জন্ম দিল এক ঐতিহাসিক বিতর্কের। মাউন্ট এভারেস্টের নামকরণ থেকে প্রথম পরিমাপকর্তা নিয়ে যেমন বিতর্কের অবসান নেই, ঠিক তেমনই এভারেস্ট শীর্ষে প্রথম আরোহণের কৃতিত্ব কার—তা নিয়েও বিতর্ক তুঙ্গে।

হিলারির হিমালয় কেন্দ্রিক আত্মজীবনী ‘High Adevntures এবং View from the Summit’—এই দুটি গ্রন্থেই হিলারি লিখছেন—’আমরা একসঙ্গে শীর্ষে পৌঁছালাম।... ‘ A few more whacks of the ice axe in the firm snow, and we stood on top.’

বিতর্ক বাঁধল এবার একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। এভারেস্ট শীর্ষে মানুষের প্রথম আরোহণের ছবিটি আজও পৃথিবীর সেরা আলোকচিত্রগুলির মধ্যে একটি। ছবিটি জনসমক্ষে প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে জোর শোরগোল পড়ে যায়। সেই চিত্রটিতে দেখা যায়, এভারেস্টের বরফসাদা শৃঙ্গে পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আর কেউ না, শেরপা তেনজিং। আর সেই ছবিটি তুলেছেন এডমন্ড হিলারি। ছবি তোলা অবধি না হয় ঠিকই ছিল, কিন্তু এভারেস্টে হিলারির কোনো ছবি নেই কেন? অনেক প্রশ্নের পর হিলারি স্বয়ং এর কারণ জানান। এভারেস্টে আরোহণের পর হিলারি জানতে পারেন, তেনজিং ক্যামেরা ব্যবহার করতে জানেন না। অতএব তাঁকে দিয়ে ছবি তোলানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এভারেস্টের স্মৃতি হিসেবে তাই হিলারি তেনজিং-এর ছবি তুলে দেন, যা পরে ইতিহাস রচনা করে। সে-যুগে সেলফি থাকলে হয়তো এই বিতর্ক উঠতই না।

এদিকে, এভারেস্ট জয়ের পর তেনজিংকে নিয়ে শুরু হয়ে গেছে এক অদ্ভুত আন্তর্জাতিক লড়াই। তেনজিং ভারতের, না নেপালের? তবে তেনজিংকে নেপালি নাগরিকের চেয়ে ভারতীয় প্রমাণ করতে ব্যগ্র হল একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহল। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তেনজিংকে ভারতে রাখার ব্যবস্থা করলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করে তেনজিংকে সেখানকার প্রথম ডিরেক্টর করে দিলেন তিনি।

কিন্তু ‘এভারেস্ট শিখরে প্রথম কে উঠেছে’—এই বিতর্কের অবসান হল না। সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হিলারি ও তেনজিং ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সাংবাদিকদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনায় জল ঢেলে তেনজিং তাঁর আত্মজীবনী—’Man of Everest’-এ স্পষ্টভাবে জানালেন, হিলারিই প্রথম শিখর জয় করেছিলেন এবং সেই চল্লিশ ফুট উঁচু আপাত-অসম্ভব পাথুরে দেওয়ালটি, যার নামকরণ পরবর্তীতে করা হয় ‘হিলারি স্টেপ’, অতিক্রমের উপায় হিলারিই খুঁজে বের করেন এবং তেনজিং তাঁকে কেবল অনুসরণ করে শিখরে পৌঁছেছিলেন।

কিন্তু তাতেও যখন মানুষের জল্পনা থামল না তখন তেনজিং মানুষের কৌতূহলে বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হলেন – “যদি এভারেস্টে হিলারির এক কদম পেছনে থেকে দ্বিতীয় মানুষ হিসেবে আরোহণ কোনো লজ্জাজনক বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে এই লজ্জা নিয়েই আমাকে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হবে।”

এদিকে কিছু সাংবাদিক এভারেস্টের সেই ছবি নিয়ে তেনজিংকে প্রশ্ন করলে তেনজিং বলেন একেবারে এক অন্য কথা। তেনজিং বলেন, তিনি হিলারির ছবি তুলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে হিলারি নিষেধ করেন এবং বলেন, শিখরে কে আগে উঠেছে’ – সেটা কাউকে না বলতে।

অন্যদিকে, এভারেস্ট জয়ের সংবাদে আপ্লুত ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ ‘নাইটহুড’ উপাধিতে ভূষিত করেন হিলারি এবং অভিযানের মূল নেতা জন হান্টকে। তেনজিং নোরগে ব্রিটিশ উপনিবেশের নাগরিক না হওয়ায়, বিদেশির জন্য সর্বোচ্চ সম্মান ব্রিটিশ এম্পায়ার

মেডেল বা জর্জ মেডেল লাভ করেন। ব্রিটিশ সংবাদসংস্থার এক সূত্র থেকে জানা যায়, তেনজিংকেও নাকি নাইটহুড দেবার প্রস্তাব উঠেছিল সে-সময়, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর তাতে আপত্তি ছিল। যদিও নেপালের রাজা হিলারি ও তেনজিং উভয়কেই সম্মানিত করেন।

এডমন্ডের পেশা ছিল মৌমাছি পালন আর শখ ছিল অবসর মরশুমে নিউজিল্যান্ডের নানা পর্বত আরোহণ। মৌমাছিপালক মানুষটি 'স্যার" উপাধি পাওয়ার পর বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন—"আমি সেই ধরনের মানুষ নই, যার উপাধির প্রয়োজন আছে।" আর শেরপা তেনজিংও হিলারির কৃতিত্বকে বরাবর সম্মান জানিয়ে এসেছেন। বিতর্ক যাই থাক, থাক, হিলারি ও তেনজিং ছিলেন একে অপরের প্রিয়জন।

এডমন্ড ছিলেন চিরকালের এক প্রচারবিমুখ মানুষ। ভাবলেও অবাক হতে হয়, তিনিই প্রথম অভিযাত্রী যিনি তিন-তিনটি মেরু—উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু এবং 'এভারেস্ট' যাকে বলা হয় 'থার্ড পোল' বা তৃতীয় মেরু—জয় করেন। তিন মেরু জয়ী হিসেবে খুব কম মানুষই তাঁর নাম জানে। আরও একটা অজানা কথা, উত্তর মেরু জয়ে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন চাঁদে পা দেওয়া প্রথম মানুষ নীল আর্মস্ট্রং!

মাউন্ট এভারেস্ট ও রাধানাথের গল্প

মাউন্ট এভারেস্টের কথা যখন হচ্ছে তখন এই বাঙালির কথা না বললে এভারেস্টের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। রাধানাথ শিকদারের কৃতিত্বকে ব্রিটিশ সরকার কৌশলে চেপে গেছিল কিন্তু কেন? আসুন জেনে নেওয়া যাক এর নেপথ্যে কি রহস্য লুকিয়ে ছিল।

দেরাদুন শহর

সে সময়ে সাধারণ মানুষকে উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসাররা জোর করে পয়সা না দিয়ে পরিশ্রম করিয়ে নিত। এটাই নাকি ছিল রেওয়াজ। কিন্তু অমানবিক এই কাজের প্রতিবাদ করলেন এক সাহসী বাঙালি যুবক। যিনি সেই সময় দেরাদুনের গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসে চাকুরিরত। এই যুবকের নাম রাধানাথ শিকদার।

রাধানাথের পরিচারক-কে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার এইচ ভ্যানসিটার্ট সাহেব বিনা পয়সায় তাঁর নিজের মালপত্তর বহন করিয়ে নিচ্ছিলেন। যা দেখে রাধানাথ আপত্তি করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের মালপত্তর আটকে রাখেন। শুধু তাই নয়, ম্যাজিস্ট্রেটকে সশরীরে তাঁর কাছে আসতে বাধ্য করেন। ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। উভয়ের মধ্যে হল উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়।

রাধানাথ তো সাহেবের মালপত্তর ফেরত দিয়ে দিলেন, কিন্তু ক্রোধে অগ্নিশর্মা ম্যাজিস্ট্রেট রাধানাথের বিরুদ্ধে দিলেন মামলা ঠুকে। মামলায় হারলেন রাধানাথ। জরিমানা হল দু'শো টাকা। সেই আমলে দুশো টাকা মানে অনেকটাই অর্থ। যাই হোক, রাধানাথ কোনোরকম গ্রাহ্য না করে জরিমানার দু'শো টাকা মিটিয়ে দিলেন। মামলা মিটল। কিন্তু রাধানাথের এই প্রতিরোধের ফলে ইংরেজদের এই বেগার খাটিয়ে নেওয়ার মতো অমানবিক কাজ সেখানে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ছেলে রাধানাথ। পিতা তিতুরাম। রাধানাথের পড়াশোনা শুরু কলকাতার ৪৮নম্বর চিৎপুর রোডের 'ফিরিঙ্গি' কমল বসুর বিদ্যালয়ে। পরে ভরতি হন হিন্দু কলেজে। হিন্দু কলেজেই রাধানাথ ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে পান ইয়ং বেঙ্গলের ডিরোজিওকে। আর গণিতের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ড. জন টাইটলারকে। এই সময়ে আইজ্যাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' সমগ্র ভারতে প্রথম চর্চা করেছিলেন রাধানাথ শিকদার এবং রাজনারায়ণ বসাক আর সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের শিক্ষক ড. টাইটলারের জন্যই।

হিন্দু কলেজে পড়াকালীন গণিত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে মুগ্ধ করে। ছাত্র থাকাকালীন তিনি নিজেই জ্যামিতির একটি সম্পাদ্য সমাধানের পদ্ধতি আবিষ্কার করে সবাইকে চমকে দেন।

এদিকে কর্নেল উইলিয়াম ল্যাম্বটনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় উপমহাদেশে গ্রেট

ট্রাইগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভের কাজ শুরু হয়। হায়দ্রাবাদে ল্যাম্পটনের প্রধান সহকারী হয়ে কাজ শুরু করেন জর্জ এভারেস্ট। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি বড়ো থিয়োডোলাইট যন্ত্র। যার সাহায্যে ল্যাঙ্কটন ও জর্জ এভারেস্ট জিটিএস পদ্ধতিতে এই উপমহাদেশে জরিপের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

এভারেস্ট এবং ল্যাম্পটন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বুঝতে পেরেছিলেন, নেপালের জঙ্গলে ওই যন্ত্রকে প্রায় একত্রিশ ফুট উচ্চতায় না বসাতে পারলে পর্বতশৃঙ্গগুলির উচ্চতা পরিমাপ করা বেশ কঠিন কাজ হবে।

ইতিমধ্যে কাজ চলতে চলতেই ল্যাঙ্কটন মারা যান। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার জর্জ এভারেস্টকেই সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করে। ভারতের সার্ভেয়র জেনারেল জর্জ এভারেস্ট কাজের জন্য তখন একজন দক্ষ, তরুণ গণিতবিদকে খুঁজছিলেন। তাঁর বন্ধু ড. জন টাইটলার তাঁর প্রিয় ছাত্র রাধানাথের নামটি সুপারিশ করে দিলেন এভারেস্টের কাছে। টাইটলারের সুপারিশে এভারেস্ট রাধানাথকে নিয়োগ করলেন। রাধানাথ সার্ভেয়র জেনারেলের অফিসে মাসে ৩০টাকা বেতনের চাকরিতে যোগ দিলেন।

ধীরে ধীরে রাধানাথ গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভেয়র হন এবং দেরাদুনের সিরোজ অঞ্চলে জরিপের কাজে যুক্ত হন। এই জরিপের কাজের জন্য এভারেস্ট বেশ কিছু নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। মেধাবী রাধানাথ এভারেস্টের কিছু পদ্ধতির পরিমার্জন করে দিলেন। এভারেস্ট খুশি হন রাধানাথের ওপর।

জর্জ এভারেস্টই প্রথম ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশাল এলাকা সম্বলিত পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর ওপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সার্ভের কাজ শুরু করেন। সার্ভে করতে করতে জর্জ সিদ্ধান্ত নেন হিমালয়ের সবচেয়ে উচ্চ শৃঙ্গের অবস্থান তিনি নির্ণয় করবেন।

সুযোগ-সুবিধাবিহীন, পদে পদে বিপদ থাকা সত্ত্বেও জর্জ এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি কাজটি শেষ করতে পারলেন না। কারণ তার আগেই চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় উপস্থিত হল। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এভারেস্ট চলে গেলেন ইংল্যান্ডে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

জর্জ এভারেস্ট অবসর নেওয়ার আগে তাঁর The Great Arc of India'-র কাজটি সম্পূর্ণ করেন। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভয়ংকর সমস্যাসংকুল একটি জরিপের কাজ। এভারেস্ট অবসর নেওয়ার পর তাঁর জায়গায় এলেন অ্যান্ড্রু ওয়াহ। এদিকে রাধানাথ শিকদার দেরাদুনের সার্ভে অফিস থেকে কলকাতার সার্ভে অফিসে বদলি হয়ে গেলেন।

ভাবলেও অবাক হতে হয়, এই পাঁচ বছরের মধ্যে হিমালয় পর্বতের প্রায় ঊনআশিটি শিখরের উচ্চতা নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। এগুলির মধ্যে একত্রিশটি শিখরের নামকরণ হয়েছিল স্থানীয় নামে আর বাকিগুলিকে রোমান অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হত।

অ্যান্ড্রু ওয়াহ হিমালয় পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তে একটি নতুন শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। তিনি ধারণা করেন এর উচ্চতা তখন পর্যন্ত জানা পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকে বেশি হতে পারে। এর নাম রাখা হল Peak-XV বা 'পিক ফিফটিন'। হিমালয় পর্বতের সব শৃঙ্গের উচ্চতার মাপগুলি তখন জমা পড়ছিল কলকাতার গণনা বিভাগে। যার নেতৃত্ব ছিলেন রাধানাথ। জমা পড়া পরিসংখ্যানের মাঝেই একদিন রাধানাথ আবিষ্কার করলেন এই পিক ফিফটিনই পৃথিবীর সবথেকে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ। তাঁর হিসাব অনুযায়ী পিক ফিফটিনের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। তিনি দেরাদুনে অ্যান্ড্রু ওয়াহকে বিষয়টা জানালেন। রাধানাথের মনে হল এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। ওয়াহসাহেব কাউকে কিছু না জানিয়ে দেরাদুনে কর্মরত এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনেসি সাহেব ও তাঁর সহযোগীদের বিষয়টা ক্রসচেক করতে বললেন। স্বীকৃতি পেল রাধানাথের কৃতিত্ব।

সে বছর রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি ঘোষণা করল 'পিক ফিফটিন'ই বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ।

"সাধারণত পর্বতের নাম সেই অঞ্চলের মানুষ যে নামে ডাকে সে নামেই নির্দিষ্ট হবে" – এরকম এক নিয়ম চালু করেছিলেন জর্জ এভারেস্ট নিজেই। সেই অর্থে সদ্য আবিষ্কৃত 'পিক ফিফটিন'-কে নেপালিরা ডাকত 'সাগরমাথা' বলে আর তিব্বতিরা ডাকত 'কুমুলুংমা' নামে, যার অর্থ 'পৃথিবীর জননী'। অন্যদিকে তখন নেপাল ও তিব্বত বিদেশিদের জন্যে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তার সঙ্গে দু'দেশে দুধরনের নাম। যে কারণে নামকরণ নিয়ে বেশ সমস্যা দেখা দিল।

হিমালয় পর্বতমালার অন্য শৃঙ্গগুলোকে তাদের আঞ্চলিক নামেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু হিমালয়ের এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, ওয়াহসাহেব যখন এর নির্দিষ্ট একক কোনো আঞ্চলিক নাম পেলেন না তখন তিনি আঞ্চলিক নামের প্রতি আর উৎসাহ না দেখিয়ে লন্ডনে রয়্যাল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটির কাছে লিখিতভাবে সমস্যার কথা জানালেন এবং প্রস্তাব দিলেন তাঁর গুরু 'জর্জ এভারেস্ট'-এর নামে এই সর্বোচ্চ পর্তশৃঙ্গের নামকরণ করার জন্য।

প্রস্তাব গ্রাহ্য হল। শোনা যায়, প্রচারবিমুখ এভারেস্ট নিজে কিন্তু এই প্রস্তাবে একেবারেই সম্মত ছিলেন না। তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধিতাকে কেউ খুব একটা আমল দিল না। 'পিক ফিফটিনে'র নাম হয়ে গেল 'মাউন্ট এভারেস্ট'। ব্রিটিশ সরকার জর্জ এভারেস্টকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে। মাউন্ট এভারেস্ট স্বীকৃতির এক বছর পরই জর্জ এভারেস্ট মারা যান।

দুঃখের বিষয় এটাই, এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাণ করলেও রাধানাথের কৃতিত্বকে ব্রিটিশ সরকার চেপে যায়।

সার্ভে বিভাগের এক ম্যানুয়াল প্রকাশিত হত, নাম 'A Manual of Surveying for India' যার লেখক ছিলেন, আর স্মিথ এবং এইচ এল থুইলিয়ার। এই গ্রন্থে তাঁরা রাধানাথের অবদানের কথা উল্লেখ করলেন প্রথম। কিন্তু তাঁরা তাঁদের গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে রাধানাথের নাম মুছে দিলেন। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে এই ঘটনাকে 'মৃতের ওপর ডাকাতি' বলে কটাক্ষ করা হয়।

রাধানাথের আবিষ্কারের কথা প্রথম প্রকাশ্যে আনেন ভারতের প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল কর্নেল সিডনি জেরাল্ড বুরার্ড। বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এর একটি সংখ্যায় "Mount Everest : The Story of a Long Controversy" শিরোনামে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক নিবন্ধ লেখেন। তারপরই সারা বিশ্ব জানতে পারে এই অসাধারণ গণিতবিদ সম্পর্কে।

রাধানাথ একজন সাহিত্য অনুরাগীও ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্যারীচাঁদ মিত্রকে তিনি 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশে সহায়তা করেন। কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তৎকালীন জেনারেল এসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশনে গণিতের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন রাধানাথ। পরে জার্মানির "Natural History Society of Bavaria-র সম্মানজক সদস্যপদ পান। বিয়ে করেননি তিনি। সংসার-বন্ধন মুক্ত ছিলেন গণিতজ্ঞ রাধানাথ।

শেষ জীবনে রাধানাথ থাকতেন চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার গঙ্গার ধারে তাঁর নিজের বাগানবাড়িতে। সেখানেই মারা যান রাধানাথ।

হিমালয়ের ‘ইয়েতি’ রহস্য

হিমালয় নিয়ে নানান অভিজ্ঞতার গল্প বলছি। ইয়েতির কথা হবে না তাও আবার হয় নাকি! আসলে ইয়েতি ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে, কারণ এখনও অবধি যতজন ইয়েতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে একজনের লেখার সঙ্গে অন্যজনের লেখার মিল নেই। একজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যজনের অভিজ্ঞতার মিল নেই। তবে ইয়েতির ব্যাপারে একটা বিষয় কিন্তু বেশ স্পষ্ট যা হল তিব্বত-নেপাল হিমালয়ের বরফে ঢাকা অঞ্চলে এমন কিছু রহস্যময় প্রাণী আছে যাকে অনেকেই দেখেছে, যার পায়ের ছাপ মিলেছে। কিন্তু চোখের নিমেষে সে মিলিয়ে গেছে। দেখা দেওয়ার পরই বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

ইয়েতি নিয়ে রয়েছে নানা মিথ, নানা রহস্য। গল্প-কমিকসও কিন্তু তাতে পিছিয়ে নেই। ‘তিব্বতে টিনটিন’ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। টিনটিনের জনপ্রিয় কমিক সিরিজের তিব্বতে টিনটিন পর্বে ইয়েতির উল্লেখ আছে। টিনটিনের স্রষ্টা হার্জকে অনেকেই মিঃ পারফেকশনিস্ট বলে ডাকতেন। টিনটিনকে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিগুলি লেখার আগে সেই জায়গার ছবি, কাহিনি, ক্ষেত্রসমীক্ষার রিপোর্ট, ফোটোগ্রাফ সমস্ত কিছু জোগাড় করতেন তিনি। নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ সেরে তারপর লিখতে বসতেন। ‘তিব্বতে টিনটিন’-এ লামাদের রহস্যময় জীবনের চিত্র যেমন হার্জ এঁকেছিলেন, তেমনি ইয়েতির প্রসঙ্গও তিনি এনেছিলেন। কারণ তখন ইয়েতি নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বেশ আলোচনা চলছিল।

এখন প্রশ্ন হল ইয়েতিকে নিয়ে কী কী রিপোর্ট পেয়েছিলেন হার্জে? ‘তিব্বতে টিনটিন’-এ ইয়েতিকে এমন একটি জীব হিসেবে হার্জ দেখিয়েছেন যে মানুষের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নকল করতে পারে। টিনটিনকে দেখে সে তেড়ে এসেছিল। গল্পে ইয়েতি শুধু পাহাড়ি কোনো জন্তু নয়, বরং মানুষের মতো তার মনও রয়েছে। সে এমন একটি প্রাণী, যার মানবিক নানা গুণ রয়েছে।

‘ইয়েতি’ একটি তিব্বতি শব্দ। কেউ কেউ প্রাণীটিকে ‘মানব ভল্লুক’ বলে উল্লেখ করেন। কেউ বলেন কাং আদমি। কেউ ইয়েতিকে বলেন মিগোই বা মিগো। যার অর্থ বনমানুষ। আবার নেপালি শব্দ বান মানচিও বলতে নাকি ইয়েতিকেই বোঝায়, পাহাড়ি মানুষদের কাছে ইয়েতি বেশ পরিচিত শব্দ। নেপাল বা তিব্বতের জনশ্রুতি বলছে, ইয়েতি ওরফে ‘মিরকা’-কে যে দেখবে তার মৃত্যু হবে, বা তাকে নাকি ইয়েতি মেরেই ফেলবে। যার সঙ্গে অস্ত্র হিসেবে থাকে একটা বিশাল পাথর এবং পাহাড়ে শিস দিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়।

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার ইয়েতির খোঁজ করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে তিনি সিন্ধু উপত্যকা জয়ের সময় ইয়েতির গল্প শুনে ইয়েতি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয়রা তাকে জানিয়েছিল, ইয়েতি কম উচ্চতায় বেঁচে থাকতে পারে না, তাই তাদের পক্ষে ইয়েতি ধরে সম্রাটের সামনে হাজির করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বিখ্যাত সব পর্বতারোহী—জন হান্ট, তেনজিং নোরগে, রেইনহোল্ড মেসনার—এঁদের স্মৃতিচারণে ইয়েতির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শুধু ইয়েতিদের খোঁজেই দু’দুটো অভিযান হয়েছে হিমালয়ে। কিন্তু এত কিছুর পরেও বেশির ভাগ জীববিজ্ঞানী ইয়েতির অস্তিত্বকে মানতে চান না।

ইয়েতির অস্তিত্ব নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও নানা মতানৈক্য রয়েছে।

ইয়েতির অস্তিত্বের সব থেকে প্রাচীন যে রিপোর্টটি পাওয়া যায়, সেটি ১৮৮৯ সালে সিকিমের। এর পর ১৯২১ সালে কর্নেল সি কেক হাওয়ার্ড বেরির নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী এভারেস্ট অভিযানে বের হন। ২২ সেপ্টেম্বর হাওয়ার্ডের নেতৃত্বে ম্যালোরি, ওলস্টন এবং মোর্সহেড পৌঁছোন লাকপা গিরিবর্তের ওপর। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন বরফের ওপর বিশাল বিশাল পায়ের ছাপ। তিন সাহেব আশ্চর্য হলেও, সঙ্গী শেরপারা এতটুকু অবাক হলেন না। তাঁরা ওগুলোকে ইয়েতির বলে চিনতে পারলেন।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ হাজার ফুট ওপরে এই ছাপগুলো সাহবেদের বেশ ভাবাল। সেখানে হিমবাহের জায়গাটি চিহ্নিত করে তাঁরা ফিরলেন। তুষারশৃঙ্গ এভারেস্ট থেকে

জায়গাটি মাত্র ৭৮৬ ফুট নীচে অবস্থিত। জায়গাটির নাম ‘রংবুক’, হিমালয়ের বুকে যেটি অশান্ত ও রহস্যময় স্থান বলে পরিচিত। জায়গাটির আয়তন ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এবং সব সময় সেখানে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বয়। হাওয়ার্ড ফিরে এসে জানান, “আমরা বরফের ওপর কিছু বিশাল পায়ের ছাপ খুঁজে পায়েছি। সেগুলো কার জানা যায় না। তবে স্থানীয়রা জানিয়েছে সেগুলি ছিল “মিথো-কাংমি’র। এই মিথো কাংমি শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে হয় ‘মনুষ্য-ভল্লুক তুষারমানব’।

দেশে ফেরার পর অভিযাত্রী দলটির কয়েকজন সদস্যের সাক্ষাৎকার নেন হেনরি নিউম্যান নামে একজন সাংবাদিক। তিনি ‘মিথো’ শব্দটির ভুল অনুবাদ করেন ‘কুৎসিত’ হিসেবে। পরে তিনি ‘কুৎসিত’-এর স্থলে ‘জঘন্য’ বা abominable শব্দটি প্রয়োগ করেন। নিউম্যানের হাত ধরে এই কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় শেরপাদের ইয়েতি-দর্শনের গল্পগুলো অভিযাত্রীদের মাধ্যমে অনূদিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে এই গল্পের নতুন ডালপালা ছড়ায় পশ্চিমি দুনিয়ায়।

১৯২২ সালে এভারেস্টে অভিযান চালায় দ্বিতীয় অভিযাত্রী দল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি জি ব্রুসের নেতৃত্বে। তিনি প্রথমেই গেলেন রংবুক মনাস্ট্রির লামার সঙ্গে দেখা করতে। লামাকে ব্রুস ইয়েতির কথা বলতে লামা খুব সহজভাবে বললেন, “রংবুক উপত্যকার ওপর অংশে পাঁচটা ইয়েতি বাস করে।” সেই অভিযানে বেশ কয়েকজন পর্বতারোহী সেখানে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওই অভিযাত্রী দলটিতে একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম আলেকজান্ডার কিউলাস্ক। অভিযান চলাকালীন তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার সময় তিনি বার বার প্রলাপ বকছিলেন। প্রলাপের সময় তিনি বলছিলেন, “এক লোমশ দানব আসছে। বিরাট বড়ো। ওর হাত থেকে নিস্তার নেই।” এ-কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২৩ সালে এভারেস্ট অভিযান শেষে ব্রিটিশ অভিযাত্রী মেজর আলান ক্যামেরুন জানান, “অভিযান চলাকালে আমি হিমালয়ের হিমরেখার ঊর্ধ্বে খাড়া বরফের প্রাচীরের গা-ঘেঁষে সংকীর্ণ একটা পথে একদল মানবাকৃতির প্রাণীকে হেঁটে যেতে দেখেছি।”

ইয়েতিকে প্রথম চাক্ষুষ করার খবর শোনা গেছিল ১৯২৫ সালে। গ্রিক ফোটোগ্রাফার এন এ টমরাজি বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, তিনি সাদা বরফের ঢালে লোমশ জানোয়ারটাকে স্পষ্ট দেখেছিলেন। কিন্তু ক্যামেরা বার করার আগেই সে পালিয়ে গেছিল।

১৯৫০-এর দশকে ইয়েতি নিয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। ইয়েতির সন্ধানে অভিযাত্রী ও পর্বতারোহীরা অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করেন হিমালয় অঞ্চলে। এমনকি হলিউড অভিনেতা জেমস স্টুয়ার্টও ইয়েতির গল্পে জড়িয়ে যান। তিনি সে-সময় তার লাগেজে ‘ইয়েতির’ একটি আঙুল বয়ে বেড়াতেন।

মার্কিন অভিযাত্রী আঙুলটি নেপালের কোনো এক গুম্ফা থেকে সংগ্রহ করেন। পরে স্টুয়ার্টের সহযোগিতায় আঙুলটি ভারতের বাইরে পাচার করা হয়। দীর্ঘ ৬১ বছর পর এডিনবার্গ চিড়িয়াখানার বিশেষজ্ঞরা সেটির ডিএনএ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে আঙুলটি ইয়েতির নয়। আঙুলটি ছিল এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর।

তবে ১৯৫১ সালে ব্রিটিশ পর্বতারোহী এরিক শিপটন তিব্বতের মেংলুং লা থেকে ফিরে, বরফের ওপর ইয়েতির স্পষ্ট পায়ের ছাপের ছবি প্রথম লন্ডন টাইমস-এ ছাপিয়ে, ইয়েতির অস্তিত্বের দাবি জোরালো ভাবে পেশ করেন। ছাপগুলোর মাপ ছিল ১২ ইঞ্চি লম্বা আর ৫ ইঞ্চি চওড়া।

১৯৫৪ সালে প্রাণিতত্ত্ববিদ বার্নাড হিউভেলম্যানস ইয়েতির অস্তিত্ব নিয়ে বলেন, “প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটা পর্যায় ছিল জাইগ্যানটোপিথেকাস, ইয়েতি হয়তো তারই শেষ নিদর্শন।”

১৯৬০ সালে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করা প্রথম অভিযাত্রী স্যার এডমন্ড হিলারি শুধুমাত্র ইয়েতি খোঁজার জন্য হিমালয় জুড়ে একটি অভিযান করেন। সেই অভিযান শেষে একটি

জন্তুর মাথার খুলিও নিয়ে আসেন তিনি। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে বলেন, সেটি ইয়েতির নয়। সেই জন্তুর মাথাটি হেলমেট আকারের ঢাকনার মতো দেখতে। সেই মাথাটি দেখতে ছিল হিমালয়ের পার্বত্য এলাকার ছাগলের মতো এক প্রাণীর সেই রোমাঞ্চকর গল্পে আসছি একটু পরে।

প্রখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী সভার্সন হিউভেলম্যানস ইয়েতি প্রসঙ্গে বলছেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ওরা আছে। অতি আদিম যুগের মনুষ্যগোত্রের অবশিষ্টাংশ হল ইয়েতি...."

প্রথম ইয়েতির পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলার কৃতিত্ব দাবি করেন ব্রিয়ার্ন সামলোভিচ আসফেনাজি। তিনি কাশ্মীরের খিলানমার্গ অঞ্চল থেকে একটি ইয়েতির ছবি তুলে কাশ্মীর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি। ১৯৮৭ সালে সেই একই জায়গায়, আর এক বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী ক্রিস বনিংটন ৪,৮০০ মিটার উচ্চতায় ইতস্তত ছড়ানো ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি তোলে।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় গবেষক মিরা শ্যাকলির "স্টিল লিভিং? ইয়েতি, সাসকোয়াচ, অ্যান্ড দ্য নিয়াণ্ডারথাল এনিগমা।" এই বইয়ে দু'জন হাইকারের ইয়েতি দেখার কথা বলছেন মিরা। তিনি লিখছেন, "১৯৪২ সালের কোনো একদিন দুই হাইকার আমাদের থেকে সিকিমাইল দূরে বরফের ওপর দুটো কালো বিন্দু চলাচল করতে দেখেছিলেন। এত দূর থেকে দেখার পরেও তারা খুব স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছিলেন। তার উচ্চতা একেবারে আট ফুটের কম ছিল না। চৌকো মতো মাথা।" ১৯৪২ সালে যে দু'জন অভিযাত্রী মিরা শ্যাকলির 'স্টিল লিভিং?' বিশালাকার কোনো প্রাণী দেখেছিলেন, তবে তার রং কালো। ইয়েতির উচ্চতা তাদের কথায় ৬ থেকে ১০ ফুট। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও হিমালয়ের পার্বত্য এলাকার স্থানীয় মানুষের বক্তব্যকে সামনে রেখে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখে তারা ইয়েতির ওজন নির্ধারণ করেন ৯০ থেকে ২০০ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। শুধু তাই নয়, গায়ে অসংখ্য রোম থাকার জন্য ইয়েতির ওজন বেশি হয়। বিভিন্ন পর্বতারোহীদের থেকে ইয়েতি প্রসঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনে অনেক চমকে দেওয়ার মত কথাও লিখেছেন কেউ কেউ।

আর একজন ইয়েতি দেখে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন, "ইয়েতির আকার গড়পড়তা মানুষের মতোই। মাথা ভরতি লম্বা চুল থাকলেও মুখমণ্ডল আর বুকে রোমের বালাই নেই বললেই চলে। লালচে-বাদামি দু'পেয়ী প্রাণীটি মনোযোগ দিয়ে শেকড় তুলছিল আর সময়ে সময়ে চড়া ও তীক্ষ্ণ গলায় কান্না করছিল।"

কিংবদন্তি অভিযাত্রী রেনহোল্ড মেজনার নেপাল ও তিব্বতে গিয়ে 'মাই কোয়েস্ট ফর দ্য ইয়েতি : কনফ্রন্টিং দ্য হিমালয়াজ ডিপেস্ট মিস্ট্রি'তে লেখেন বড়ো ভাল্লুককেই আসলে ইয়েতি বলে ভুল করেন অনেকে।

এবার পর্বতারোহী রাইনহোল্ড মেসনারের ইয়েতি দেখার গল্প শোনা যাক। ১৯৮৬ সালের মার্চে সেদিন মেসনার একটা বিশেষ রুট ধরে চলছিলেন। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। জঙ্গলের খাড়াই বেয়ে ওঠার সময় হঠাৎ তার সামনে বিশাল ও কালো রংয়ের কিছু একটা উদয় হল। বিস্মিত মেসনার দেখলেন প্রাণীটি দৌড়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। তার দৌড়ানোর ভঙ্গি মানুষের মতোই, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত। গাছের শাখা-প্রশাখা বা বরফের ওপর থাকা গর্ত কিছুকেই পরোয়া করছে না। দশ গজের মতো গিয়ে প্রাণীটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তারপরই মেসনারের চোখের সামনে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল।

সেদিন রাতে চাঁদের আলোয় সেটিকে আবারও দৌড়াতে দেখেন মেসনার। সাত ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা, বলিষ্ঠ ও চটপটে শরীর। ছোটো ছোটো পা, পশমে ঢাকা দেহ আর লম্বা, শক্তিশালী হাতওয়ালা প্রাণীটি রাগত স্বরে শব্দ করছিল। সেই রাতে আবারও গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যায় প্রাণীটি।

১৯৮৬ সালে অ্যান্থনি উলরিজ নামক আর একজন হাইকার ইয়েতি দেখেছেন বলে দাবি করেন। তিনি দেড়শো মিটার দূর থেকে একটি ইয়েতিকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

তিনি দু'টি ছবিও তুলে নেন।

সেই ছবি পরখ করে দেখা যায়, সেগুলো কোনো মেকি ছবি নয়। ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে ছবিজোড়া ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। পরের বছর গবেষকেরা উলরিজের ইয়েতি দর্শনের স্থানে গিয়ে বুঝতে পারেন, উলরিজ আসলে একটি পাথুর-পৃষ্ঠের ওপরের অংশ দেখতে পেয়েছিলেন।

ইয়েতিকে নিয়ে গল্পগাথা শেরপাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল একটা সময় পর্যন্ত। তারপর পশ্চিমি অভিযাত্রীরা হিমালয়ে পা ফেললে তাদের হাত ধরে ইয়েতির গল্প ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপ, আমেরিকা সহ সারা বিশ্বে। আরও ভয়ংকর, রোমাঞ্চকর কাহিনির মাধ্যমে ইয়েতি সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। সেই থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইয়েতি একটা মিথে পরিণত হয়ে যায়।

পর্বতারোহী রাইনহোল্ড মেসনার ১৯৮৬ সালে ইয়েতি দেখার পর অনেকবার সেই ইয়েতির খোঁজে ছুটে বেড়ান হিমালয় পর্বতমালা, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, ভারত, মঙ্গোলিয়া, ও কাজাখাস্তানের আনাচেকানাচে। বারো বছরের খোঁজ শেষে মেসনার সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন, ইয়েতি আসলে একপ্রকার ভাল্লুক ছাড়া আর কিছু নয়! মেসনারের হিসেব মতে, ইয়েতির এই কিংবদন্তি মূলত একপ্রজাতির ভাল্লুক আর শেরপাদের হিমালয়ী বুনো জন্তুর গালগল্পের সমন্বিত রূপ। মেসনার লিখছেন, "এখনও পর্যন্ত ইয়েতির যতগুলো পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সেগুলো সব একই প্রজাতির ভাল্লুক। সুতরাং, ইয়েতির ব্যাপারটি একদিক থেকে বাস্তব।" মেসনার ইয়েতিকে দুপেয়ে জন্তু হিসেবে দেখতে নারাজ। তার মতে, মানুষ বাস্তবতার চেয়ে গাঁজাখুরি গল্প বেশি পছন্দ করে।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের প্রাইমেট বায়োলজির অধিকর্তা অ্যানাটমিস্ট, নৃতত্ত্ববিদ জন নেপিয়ার বলেন, বরফের ছায়াকে ভুল দেখেছেন একাধিক অভিযাত্রী। নেপিয়ারের এই কথা ঘিরে নানা বিতর্ক তৈরি হয়। কেউ কেউ ইয়েতির প্রকাশিত ছবি নিয়ে নেপিয়ারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

২০০৭ সালে আমেরিকার এক টিভি সঞ্চালক জোস গেটসও রহস্যময় পায়ের ছাপের কথা বলেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি।

২০১০ সালে একদল শিকারি রোমবিহীন চারপেয়ে একটি প্রাণী দেখতে পেয়েছিল, তাদের দাবি সেটিই নাকি ছিল ইয়েতি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, বড়োসড় বিড়ালজাতীয় কোনো লোমশ প্রাণী সেটি। যেটির রোগের কারণে সারা শরীরের রোম হারিয়েছিল। সেই বিশালাকার প্রাণীর উপস্থিতি, অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

২০১০ চিনের অভিযাত্রীরা একটি প্রাণীকে পাকড়াও করেন। সেগুলিকে সিভেট বা ভামজাতীয় বিড়াল বলে শনাক্ত করে হিমালয় বিশেষজ্ঞরা। ২০১৩ সালে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানী ব্রায়ান সাইকস, ইয়েতির রোম হিসেবে দাবি করা একটি নমুনা থেকে ডিএনএ পরীক্ষা করেন।

তবে বেশিরভাগ গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ইয়েতির হাড়, চুল, রোম এসব নিয়ে যা যা পরীক্ষাই হয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগই গোরু, ঘোড়া কিংবা ভালুকের জিন। একদল গবেষক বলেন, ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগের প্রিস্টোসিন যুগের ভালুকের ডিএনএ-র সঙ্গে মিল আছে ইয়েতির। বিজ্ঞানী রোনাল্ড এইচ পাইন ও ইলিসের ইগিতেরেজ বলেন, সাধারণ বাদামি ভাল্লুকের ডিএনএ থাকার সম্ভাবনা আছে ইয়েতির মধ্যে। ইয়েতির নমুনা বলে যেগুলি গবেষকরা হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন তার ডিএনএ আসলে এশীয় ভাল্লুক, হিমালয়ের ভাল্লুক, তিব্বতীয় ভাল্লুক ও কুকুরের। তাই টিনটিন গল্পে দেখা পেলেও বাস্তবে প্রমাণ এখনও মেলেনি।

মেসনারের ভাল্লুক তত্ত্বের আপাত সমর্থন মিলেছে ২০১৪ সালে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক অধ্যাপক, ব্রায়ান সাইকস ইয়েতির কিছু কথিত নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ও তার দল ইয়েতির পশমের ডিনএনএ পরীক্ষা করেন। এসব

নমুনার মধ্যে মেসনারের প্রদত্ত নমুনাও ছিল।

এর পর তারা এসব নমুনা ডিএনএ অন্যান্য প্রাণীর জিনোম সিকোয়েন্সের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। তারা দেখতে পান, লাদাখ ও ভুটানে পাওয়া ইয়েতির দুটো নমুনার সঙ্গে একধরনের মেরুভাল্লুকের প্রায় শতভাগ জিনগত মিল রয়েছে। তবে এই ভাল্লুক প্রজাতিটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে।

গবেষকেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছোন, হিমালয় অঞ্চলে হয়তো এমন একধরনের ভাল্লুকের বাস রয়েছে, যেগুলো মূলত বিলুপ্ত মেরুভাল্লুক বা Ursus maritimus জাতের ও বাদামী ভাল্লুকের বা Ursus arctos-এর মিলিত সংকর প্রজাতির। আর এই সংকর জাতের প্রাণীটিই হয়তো কোনোভাবে ইয়েতি মিথ সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

কিন্তু মেরুভাল্লুক হিমালয় অঞ্চলে বাস করে না। সুতরাং প্রশ্নের মুখে পড়ল সাইকসদের গবেষণা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর দুই অধ্যাপক রস বারনেট ও সিরিডোয়েন এডওয়ার্ডস সাইকস-এর গবেষণালব্ধ ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেন। এবারের গবেষণায় একটি বড়ো রকমের ভুল ধরা পড়ে।

সাইকস তার গবেষণায় ইয়েতির নমুনার সঙ্গে প্লাইস্টোসিন কালের মেরুভাল্লুকের যে মিল খুঁজে পাওয়ার কথা জানিয়েছেন, তা পুরোপুরি সত্য নয়। বরং বারনেটদের গবেষণা মোতাবেক এই মিলটি মূলত আধুনিক মেরুভাল্লুকের। তা-ও মিলের মাত্রাটা যৎসামান্য।

বারনেট ও এওয়ার্ডসের দাবি অনুযায়ী তাহলে কি হিমালয়ে মানুষের অজান্তে মেরুভাল্লুক বাস করছে? কিন্তু এই দুজন গবেষক দাবি করলেন, “ইয়েতিকে নিয়ে গবেষণার বিষয়টি আদৌ ওরকম কিছু নয়, বরং যে নমুনা-পশমগুলো পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলোর ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত, Damaged DNA ছিল।”

নিউইয়র্কের বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারলট লিন্ডকিস্ট এর আগে ২০০৪ সালে আর্কটিক নরওয়ে অঞ্চলে মেরুভাল্লুকের এক লক্ষ বিশ হাজার বছর পুরোনো একটি চোয়ালের হাড় আবিষ্কার ও তার বিশ্লেষণ করেন। এর প্রায় এক দশক পরে তিনি অক্সফোর্ডে সাইকসের গবেষণার খবরটি জানতে পারেন।

সাইকসের দলের দাবি, “হিমালয়ের কোনো সুউচ্চ অবস্থানে হয়তো কোনো সংকর জাতের ভালুক এখনও বাস করে আসছে। কিন্তু লিন্ডকিন্স্ট এই দাবি মেনে নিতে পারেননি। এছাড়া সাইকসদের গবেষণা পদ্ধতি নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, কারণ ওই দলটি ডিএনএ-র তুলনামূলক ক্ষুদ্র ও সীমিত অংশ নিয়ে গবেষণা করেছিল। লিন্ডকিভস্ট পুনর্নিরীক্ষণের সিদ্ধান্ত নিলেন।”

এর পর নতুন গবেষণা শুরু হয়। সেখানে ২৪টি ইয়েতির নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল ইয়েতির দাঁত, ত্বকের অংশবিশেষ, চুল, পশম ইত্যাদি। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, দাঁতটি ছিল একটি গৃহপালিত কুকুরের। বাকি নমুনাগুলোর উৎস মূলত হিমালয়ী ও তিব্বতি বাদামি ভালুকের একটি উপ-প্রজাতি, এবং একটি এশিয়ান কালো ভালুক।

গবেষণাটির ফলে ইয়েতি রহস্যের সমাধানের পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন গবেষকেরা। তারা বিপন্ন এশিয়ান ভালুকের একটি ফ্যামিলি-ট্রি তৈরিতে সক্ষম হন, যা এই প্রাণীটিকে রক্ষায় যথেষ্ট সহায়ক হবে বলেই গবেষকরা মনে করছেন।

সন্ধানের শেষ এখানেই নয়। এবার বিষয়টি নিয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের এলিসার গুতেরেজ ও কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রোনাল্ড পাইন। গবেষকেরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোলেন যে, “নমুনা দুটোর উৎস বাদামি ভালুক ছাড়া আর কিছু নয়।”

এই গবেষণার পর সাইকস ও তার দল নিজেদের ভুল স্বীকার করে বিবৃতি দিলেন। তাঁরা বললেন, “আমাদের পরীক্ষিত নমুনাগুলি কোনোভাবেই নরবানরের সঙ্গে মেলে না।”

বিখ্যাত ইয়েতি গবেষক মাইকেল ওয়ার্ড জানান, “প্যাংবোচে মনাস্ট্রিতে সযত্নে রক্ষিত

রয়েছে ইয়েতির মাথার খুলি। অনেক বৈজ্ঞানিক জানিয়েছেন সেটি নাকি আসলে একটি হিমালয়ান নীল ভালুকের খুলি। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে এই খুলিটি সম্পর্কে বড়ো বড়ো করে লেখা হয়, 'The scalp kept on the Pangboche Monastery is the only evidence of existence of Yeti in the world.'

২০১৭ সালে এক অভিযাত্রীর তোলা ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি নিয়ে বেশ বিতর্ক হয় ইউরোপজুড়ে। ইয়েতি নিয়ে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, যাঁরা ওই পায়ের ছাপকে ইয়েতি-র বলে দাবি করছেন, সেটা আদৌ ইয়েতির নয়। সেগুলো ভালুকের। হিমালয়ে তিন ধরনের ভালুক দেখা যায়-এশিয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, টিবেটান ব্রাউন বিয়ার এবং হিমালয়ান ব্রাউন বিয়ার। ওই সমীক্ষায় দাবি করা হয়, যে পায়ের ছাপকে ইয়েতির বলে দাবি করা হয়েছে, আদৌ তা ইয়েতির নয়।

৯ এপ্রিল ২০১৯। ভারতীয় সেনারা তাদের স্বীকৃত টুইটারে ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি শেয়ার করেন। ব্যস তাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে শোরগোল পড়ে যায়। ৯ এপ্রিল ভারতীয় সেনার মাউন্টেনিয়ারিং এক্সপিডিশন দল নেপালের মাকালু বেস ক্যাম্পে গিয়েছিল। তাঁদের দাবি, মাকালু-বরুণ ন্যাশনাল পার্কের কাছে বিশাল আকারের একটি পায়ের ছাপ দেখতে পান। সেই পায়ের আকৃতি মেপে দেখেন তাঁরা। পায়ের আকৃতি ছিল ৩২x১৫ ইঞ্চি। যদিও একটি পায়েরই চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানায় সেনা। ভারতীয় সেনার শেয়ার করা এই ছবি ইয়েতির অস্তিত্বের প্রসঙ্গকে ফের উসকে দেয়। যদিও বিজ্ঞানীরা তাকে ইয়েতির পায়ের ছাপ বলতে নারাজ।

বরফে ঢাকা হিমালয়ের বুকে কি এবার সত্যিই ইয়েতির সন্ধান মিলল? ভারতীয় সেনার টুইট ঘিরে এই প্রশ্ন ঘিরে উত্তাল হয় সারা দেশ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশ প্রশ্ন তোলে বিশালাকৃতির পায়ের ছাপ কার? ইয়েতির, নাকি ভালুকের?

এই প্রশ্ন ঘিরে জল্পনা বাড়তে থাকে। অভিযাত্রী দলের টুইটারে শেয়ার করা সেই পায়ের ছাপকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চরমে ওঠে। হিমালয়ের রহস্যময় ইয়েতির অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কিত প্রশ্নটি ফের একবার মাথাচাড়া দেয় নানা মহলে। ভারতীয় সেনা যে পায়ের ছাপকে ইয়েতির বলে দাবি করে, সেটি ভালুকের, না কি অন্য কোনো প্রাণীর তা স্পষ্ট না হওয়ায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

গল্পের বইয়ে 'ইয়েতি'র কথা অনেকেদিন ধরেই পাঠকরা পড়ে আসছেন। দানবাকৃতি, অনেকটা গোরিলার মতো দেখতে এমনই নানা রকমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রাণীটিকে। 'তুষারমানব' হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে তার। এই তুষারমানবকে নিয়ে নানান রকম গল্পকথা প্রচলিত থাকলেও, তার অস্তিত্ব নিয়ে সবাই সন্দিহান। কারণ এখনও পর্যন্ত ইয়েতি আছে না নেই তা প্রমাণিত হয়নি। তাই গল্পকথাতেই সীমিত থেকে গেছে 'ইয়েতি'।

কাকাবাবু যেবার খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয়ে যাবেন বলেছিলেন, তখন খোদ সন্তুই বিশ্বাস করতে পারেনি ইয়েতি আছে না নেই। শেষে তারা হিমালয়ে গেলেন। সন্তু প্রথমদিকে বুঝতে না পারলেও শেষে বুঝল কাকাবাবু নিশ্চিত একটা ইয়েতি ধরে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেবেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজের 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক' যারা পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন, শেষ অবধি কাকাবাবু হিমালয়ে কী খুঁজে পেয়েছেন। ইয়েতিকে নিয়ে এই অভিযান বাঙালি গোগ্রাসে গিলেছে।

বাঙালির অতিপ্রিয় ঘনাদাও ইয়েতি দেখেছিলেন। শুধু দেখেনইনি, ইয়েতিরই কারণে তিনি এভারেস্টের মাথায় টুপি'ও পরিয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'টুপি' গল্পে লিখেছিলেন, মোহান্ত সেজে তিব্বতের থিয়াংবোচি মঠ থেকে একটি প্রাচীন তিব্বতি পুথি নিয়ে উধাও হয়ে যান ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের ঘনশ্যাম দাস ওরফে ঘনাদা। সেখানেই হিমালয়ের এক গুহায় ইয়েতির দেখা পান তিনি।

চিতার চামড়া গায়ে জড়ানো আর মাথায় ইগলের পালক-ওয়ালা সেই সভ্য ইয়েতিরা

ঘনাদার সঙ্গীর উল্লাস শুনেই এক দৌড়ে হাওয়া! পরের দিন আবার তারা হানা দেওয়ায়, ঘনাদা ল্যাসো ছুড়ে ইয়েতি পাকড়ালেন। কিন্তু ঘনাদাকে নিয়েই দৌড়ে ইয়েতি সোজা এভারেস্টের চূড়ায়। আর সেই সময়েই টুক করে নিজের মাথার টুপি ঘনাদা পরিয়েছিলেন এভারেস্টের মাথায়। যেহেতু হিলারি এবং তেনজিংয়ের এভারেস্ট অভিযানের আগেই 'টুপি' গল্প লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাই বলাই যায় সবার প্রথম এভারেস্ট জয় করে মাথায় টুপি পর্যন্ত পরিয়েছিলেন ঘনাদা।

শেষপর্যন্ত যে ইয়েতিকে ঘনাদা কলকাতায় আনতে পারেননি, সেই দুঃখ বোধহয় বাঙালির কোনো দিনও যাবে না। আসলে ঘনাদার ল্যাসোর দড়ি ছিঁড়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি ঘটেছিল। অবশ্য ঘনাদা সম্পর্কে টেনিদা তো কপালে হাত ঠুকে বলেই ছিলেন, "ঘনাদা।! তিনি তো মহাপুরুষ। ইয়েতি কেন, তার দাদামশাইয়ের সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে পারেন।"

যারা ইয়েতি দেখেছেন তারা পুংলিঙ্গ ইয়েতি দেখেছেন না কি স্ত্রীলিঙ্গ ইয়েতি দেখেছেন সে নিয়ে অনেকেই বেশ মজার মজার লেখা লিখেছেন। যেমন স্ত্রী-ইয়েতির দর্শন কিন্তু পেয়েছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ সৃষ্ট গুলসম্রাট ব্রজরাজ কারফর্মা, মানে ব্রজদা! এবং এভারেস্টের আশেপাশে সেই নারী-ইয়েতি বরফের ওপর গান গাইছিল। কী ভাষায় সেই গান? তা একমাত্র ব্রজদাই বুঝতে পেরেছিলেন।

তবে ব্রজদারও বক্তব্য ছিল, ১৮৫২ সালে হাইজাম্প মেরে তিনিই প্রথম এভারেস্ট ডিঙিয়েছিলেন!

এছাড়াও, 'শুকতারা' পত্রিকায় প্রকাশিত সব্যসাচীর 'টারজান'-এরও হিমালয়ে ইয়েতির সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল। তারা আবার এক সময়ে টারজানকে নিজেদের জাতভাই মনে করে 'ইয়েটি ইয়েটি' বলে চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশও করেছিল।

আবার, কমিকসের অতিমানব গার্থ-এর এক অভিযানে তো প্রমাণ হয়েই গিয়েছিল যে, আসলে ইয়েতিরা এই পৃথিবীর প্রাণীই নয়! তারা সকলেই ভিনগ্রহী!

তুষার রাজ্যে এভারেস্ট থেকে মাত্র ৭৮৬ ফুট নীচে অবস্থিত একটি জায়গার নাম হল রংবুক। রহস্যময় এই স্থান ২৬৫ বর্গকিলোমিটারের। এই জায়গাটি সবসময়ই ঝড় ও তুষারপাতে অশান্ত। এখানে যারা গিয়েছেন তাঁরাই হারিয়ে গিয়েছে অথবা মারা গিয়েছেন। মনে করা হয় এখানেই নাকি সেই আদিম প্রানীর বসবাস। এই অঞ্চলে আজ পর্যন্ত অনেক অভিযান হয়েছে কিন্তু কেউ বেঁচে ফিরে আসেনি। এর পাশাপাশি অঞ্চলে অভিযান করা মেজর ক্যামেরুন জানিয়েছিলেন তিনি হিমরেখার ঊর্ধ্বে খাড়া শৈলপ্রাচীরের গা ঘেঁষে একটা পথে একদল মানবাকৃতি মানুষকে হেঁটে যেতে দেখেছেন।

ইয়েতির আদি উৎস তিব্বত ও নেপালের হিমালয় অঞ্চলে বাস করা শেরপাদের লোকগাথা। মূলত তিব্বত অঞ্চলেই ইয়েতি মিথের প্রথম উৎপত্তি। পরে শেরপাদের মাধ্যমে তা নেপাল ও হিমালয়ের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। শেরপাদের এসব লোকগল্পগুলি সংগ্রহ করেছিলেন শিব ধাকাল নামের একজন লেখক। ১২টি গল্পের সেই সংগ্রহটির নাম "ফোক টেইলস অফ শেরপা অ্যান্ড ইয়েতি।"

শেরপাদের এই গল্পগুলিতে ইয়েতিকে সবসময় ভয়ংকর প্রাণী হিসেবে দেখা হয়েছে। কখনো ইয়েতিকে অনিষ্টকারী হিসেবে, কখনো দুর্ভোগের উৎস হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। আসলে প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কিছু কাল্পনিক চরিত্র থাকে, যা ভয়ের উদ্রেক করে, মানুষের চোখে সেগুলো জুজুর মতো কাজ করে। ইয়েতি হচ্ছে শেরপাদের সেই 'জুজু'।

শেরপারা হিমালয়ের দুর্গম তুষারাবৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় তাদের জীবিকার জন্য। এসব অঞ্চলে রয়েছে পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি। তুষারধস, বরফের চোরা গর্ত এসব তো আছেই, পাশাপাশি রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের ভয়। এই আক্রমণকারী জানোয়ারদের কাছ থেকে সাবধান থাকার জন্য শেরপাদের যে জুজুর ভয় দেখানো হয়, তা হচ্ছে ইয়েতি। আমরা যে জুজু শব্দ ব্যবহার করি তার মানে ইয়েতি।

এক শেরপা গবেষক জানিয়েছেন, "এই জুজুর সৃষ্টির পেছনে হয়তো এমন উদ্দেশ্য ছিল যে, শেরপাদের বাচ্চাকাচ্চারা যেন তাদের আবাসস্থল ছেড়ে দূরে কোথাও চলে না যায়। কারণ বরফের বিশাল প্রান্তরে একবার হারিয়ে গেলে তার আর ঘরে ফেরার কোনো উপায় নেই। সুতরাং শেরপা বাচ্চাদের যদি ইয়েতির ভয় দেখানো যায়, তাহলে তারা নিশ্চয়ই ঘর থেকে এদিক-সেদিক বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়াবে না, হারিয়ে যাবে না।"

হিমালয়ে ইয়েতির পায়ের ছাপ, খুলি, পশম, হাড় বা দাঁতের টুকরা ইত্যাদি পাওয়ার দাবি করেন পর্বতারোহীরা। কিন্তু অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়-এগুলো ছিল মূলত অন্যান্য পর্বতচারী জন্তু, যেমন ভালুক, অ্যান্টিলোপ, বানর ইত্যাদির অংশ।

২০১১ সালে রাশিয়ান সরকারের ইয়েতি আবিষ্কারের নেশা চাপে। পশ্চিম সাইবেরিয়ায় তারা ইয়েতি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মিলিত হয়। গবেষক জন বাইন্ডারনাজেল দাবি করেন, ইয়েতি গাছে বাসা বেঁধে থাকে। দলটির কাছে ইয়েতির অস্তিত্বের 'সন্দেহাতীত প্রমাণ' থাকার কথা বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলে দেয়।

কিন্তু সব ভন্ডুল করে দেন আর এক বিজ্ঞানী জেফ মেলড্রাম। তিনি সন্দেহ করেন, ইয়েতির গাছে বাসা বাঁধার ব্যাপারটি আগাগোড়া ভুয়া। পরে প্রমাণিত হয়, যেসব গাছের মোচড়ানো ডালপালাকে ইয়েতির বাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল, সেগুলো আসলে মনুষ্যনির্মিত হাতিয়ার দিয়ে কাঁটা হয়েছে। মেলড্রাম সিদ্ধান্তে পৌঁছোন, ওই অঞ্চলে পর্যটকদের আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ান সরকার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছে!

এসব গবেষণা থেকে গবেষকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, ইয়েতি মূলত হিমালয় অঞ্চলে বাস করা ভাল্লুক জাতীয় প্রাণী ও স্থানীয় মিথের একটি সমন্বিত কিংবদন্তি।

সেই হিসেবে এক অর্থে ইয়েতির ধারণা সত্য। কারণ এর মূল উৎস ভাল্লুক জাতীয় প্রাণী থেকে। কিন্তু বাস্তবে মানুষের মতো দেখতে বিশাল দেহের কোনো রোমশ দুপেয়ে প্রাণী হয়তো হিমালয়ে বাস করে না, বা কখনোই করেনি।

তারপরও মানুষ এখনও ইয়েতির সন্ধানে ছুটছে, পপ কালচারে স্থান পেয়েছে ইয়েতি। ইয়েতি বর্তমানে 'ক্রিপটোজুওলজি'র অংশ হয়ে উঠেছে। ক্রিপটোজুওলজি হচ্ছে প্রমাণের অভাবে অস্তিত্বহীন এমন সব কথিত প্রাণী বিষয়ক গবেষণা।

নেপাল সরকার ১৯৫০-এর দশকে ইয়েতি শিকারের জন্য লাইসেন্স বিক্রি করা শুরু করে। ইয়েতিকে নিয়ে মানুষের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। শেরপারা এখনও বিশ্বাস করে ইয়েতি শুধু তাদেরকেই দেখা দেয়, যারা ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

ভুটানের সাক্তেং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়েতি সংরক্ষণ করা। ইয়েতি মিথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশাল অর্থনৈতিক চক্র। নেপালে 'ইয়ক অ্যান্ড ইয়েতি' নামের পাঁচতারা হোটেল রয়েছে, আরও আছে ইয়েতি এয়ারলাইন্স। সুতরাং বলা যায়, একসময়ের রহস্যময় ইয়েতি এখন মানুষের জীবনের সঙ্গে ভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

ফলে নিঃসন্দেহে ইয়েতির আবেদন কখনও কমবে না। হিমালয়ের সাহসী শেরপারা ইয়েতিকে দেখবে আতঙ্ক ও শ্রদ্ধার চোখে, আর দুনিয়ার আধুনিক মানুষ ইয়েতিকে দেখবে তাদের দৈনন্দিন ভোগবাদী জীবনের একটি সুবিধাজনক উপযোগ হিসেবে!

নেপাল অবশ্যই বিশ্বের এক অন্যতম পর্যটনস্থল। যেখানে সারা বছরই দেশ-বিদেশ থেকে মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। পর্যটন থেকে বড়ো অঙ্কের ব্যবসা পায় নেপাল। তাদের অর্থনীতির বড়ো ভরসা সেই পর্যটনকে আরও বৃহত্তর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে, মানুষকে নেপালে আসতে উৎসাহ দিতে শুরু হয়েছে 'ভিশন ২০২০'। সেই প্রকল্পকে সামনে রেখে কাঠমান্ডুকে সাজিয়েছে সরকার। সেখানে বসেছে হিমালয়ের পৌরাণিক তুষার দানব ইয়েতি-র মূর্তি। একটা নয় অনেকগুলি। আর তাতেই ফাঁপরে পড়েছে নেপাল সরকার।

এক ইয়েতি গবেষক জানিয়েছেন, "বহুকাল ধরে চলে আসা লোককাহিনি অনুযায়ী এটি হিমালয়ের পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে থাকা তুষার প্রাণী। ইয়েতি কেউ দেখেননি। কিন্তু তার

নাকি অস্তিত্ব আছে। এমনই এক বিশ্বাস চলেই আসছে। মানুষের কাছে অন্যতম কৌতূহলের বিষয়ও ইয়েতি। ইয়েতি-র দেখা না পাওয়া গেলেও তার চেহারা নিয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে পাহাড়ি মানুষের কাছে।"

ইয়েতির কথা মাথায় রেখে সেই চেহারার আদলেই ২২টি ইয়েতির ফাইবার গ্লাসের মূর্তি বানিয়ে তা কাঠমাণ্ডু শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসায় নেপাল সরকার। আর তা বসানোর পরই শুরু হয় বিতর্ক। যার জেরে পরে বিপুল অর্থ খরচ করে বসানো সেইসব মূর্তি এক-এক করে খুলে নেওয়া হয়।

এই ঘটনার পর নেপালে আবার বসানো হয় ইয়েতির মূর্তি। অনেকে বলেন, "মূর্তিগুলি জাপানি সুমো ফাইটারদের মতো। কেউ বলছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাদের তুলে ধরছে এই মূর্তিগুলি। মূর্তিগুলির ওপর যেভাবে দেবতাদের ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে অনেকে আবার ওই মূর্তিগুলির সামনে বসে পুজোও শুরু করেছেন। বেশ কয়েকজন পুরাণ গবেষক শোনান আরও মারাত্মক কথা। তাঁরা বলেন, "ইয়েতি হল পৌরাণিক দানব। যা মানুষের যাবতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করছে।"

বৌদ্ধনাথ ও বসন্তপুর এলাকায় বসানো দুটি ইয়েতি মূর্তির সারা গায়ে আঁকা দেবতাদের ছবির ওপর পেন্ট করে দেন স্থানীয় মানুষজন। শেষ অবধি ধর্মীয় সমস্যাকে সামনে রেখে এত খরচ করে তৈরি ইয়েতি ম্যাসকট সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় প্রশাসন। ১০৮ জন শিল্পী এই ইয়েতি ম্যাসকট তৈরি করেন। তৈরি করতে ৪ মাস সময় নিয়েছিলেন তাঁরা। সেই ম্যাসকট খুলে নিতে হয় নেপাল সরকারকে।

অনেক গল্প হল। এবার যে গল্পটি দিয়ে ইয়েতি অভিযানের ইতি টানব তা বেশ রোমাঞ্চকর। এই গল্পের নায়ক এভারেস্ট অভিযানের নায়ক এডমন্ড হিলারি।

ইয়েতিদের সন্ধানে অনেক দুঃসাহসিক অভিযানও পরিচালিত হয়েছে এতক্ষণ তার অনেকগুলির গল্প শুনলেন। কিন্তু এইসব অভিযানগুলির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত অভিযান ছিল স্যার এডমন্ড হিলারির ইয়েতি অভিযান।

১৯৬০-৬১ সালের দিকে হিলারিকে ওই এলাকায় পাঠায় শিকাগোর ওয়ার্ল্ড বুক অফ এনসাইক্লপিডিয়ার প্রণেতারা। এই হিলারই শেরপা তেনজিংকে নিয়ে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। কেউ কেউ বলেন ইয়েতির সন্ধানে বেরিয়েই হিলারির নাকি এভারেস্টর প্রতি টান তৈরি হয়।

যাই হোক হিলারি তার সঙ্গীদের নিয়ে হিমালয়ের পথে রওনা হলেন নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে শুরু হল তাদের যাত্রা। দুর্গম পথে চলতে চলতে তারা তিব্বতের এক গ্রামে এসে পৌঁছোলেন। গাঁয়ের নাম খুমজুং। হিমালয়ের এই গ্রাম শেরপাদের গ্রাম বলে পরিচিত। একদিন গ্রামের একটি মঠ দেখতে গেলেন হিলারি। গিয়ে দেখলেন সেখানে সযত্নে রক্ষিত আছে একখানা চামড়া। মঠের অধ্যক্ষ হিলারিকে বললেন, "আমাদের বিশ্বাস এটি ইয়েতির চামড়া।"

চামড়াটি গর্বের সঙ্গে মঠাধ্যক্ষ দেখালেন হিলারিকে। চামড়াটি দেখে হিলারির মনে হল চামড়াটি বেশ পুরোনো। হিলারি কিছুক্ষণ মন দিয়ে চামড়াটি দেখে অনুমান করলেন সেটি মানুষের চামড়া। চামড়াটির মাথার দিককার চুলগুলি লম্বা।

হিলারির আশ্চর্যের সঙ্গে মঠাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন যে চামড়াটি কোথা থেকে এলো। হিলারির প্রশ্নের উত্তরে মঠাধ্যক্ষ লামা হিলারিকে শোনালেন এক রোহমর্ষক কাহিনি। গল্প অনেকটা এরকম, প্রায় দুশো বছর আগে ইয়েতিরা খুমজুং গ্রামটি দখল করে নেয় এবং গ্রামবাসীদের ধরে ধরে খেয়ে ফেলতে শুরু করে। অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়ায় যে গ্রামে মানুষের চেয়ে ইয়েতিদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এমন সময় একজন বিজ্ঞ লামা ইয়েতিদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য একটি অভিনব পরিকল্পনা করেন। তিনি দেখলেন ইয়েতিরা অনুকরণপ্রিয়। মানুষ যা করে ইয়েতিরাও তাই অনুকরণ করে। বিজ্ঞ লামা তাদের এই অনুকরণপ্রিয়তাকেই কাজে লাগালেন তাঁর পরিকল্পনায়। তিনি গ্রামে এক মহোৎসবের

আয়োজন করলেন। সেখানে সমবেত গ্রামবাসী ও ইয়েতিদের মধ্যে বিতরণ করা হল চাঙ জাতীয় বন্যমদ। লামার শিখিয়ে দেয়া বুদ্ধিমতো গ্রামের লোকজন গোগ্রাসে মদ পানের ভান করল, কিন্তু আসলে পান করল না। তারপর মাতাল হয়েছে এরকম ভাব করে কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার বের করে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে বসল। শুরু হল এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। যুদ্ধে প্রায় সবাই জখম হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। মনে হল তাদের কেউই আর বাঁচবে না।

এদিকে মদ পানে মত্ত ছিল ইয়েতিরাও। মানুষের দেখাদেখি প্রচুর চাঙ পান করে ইয়েতিদেরও প্রচুর নেশা হয়েছিল। এবার মানুষের মতো তারাও নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু করে দিল। ওদিকে হয়েছে কী মানুষের ব্যবহৃত তলোয়ারগুলো ছিল কাঠের। যার ফলে তারা কেউই নিহত বা জখম হয়নি। কিন্তু মরার ভান করে পড়ে রইল তারা। আর যখন দেখল ইয়েতিরা মদের নেশায় চুর হয়ে গেছে তখন তারা যে যার মত সরে পড়ল।

এদিকে ঘটনাস্থলে ইয়েতিদের কাছাকাছি স্থানীয়রা কাঠের অস্ত্রের জায়গায় একরাশ লোহার ধারালো অস্ত্র ফেলে রেখে দিল। রাতের আঁধারে স্থানীয় গ্রামবাসীরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইয়েতিরা কিছুক্ষণ পরে দেখে তাদের পাশে অনেক অস্ত্র পড়ে আছে। নেশার ঘোরে তারা সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করল। ধারলো তীক্ষ্ণধার অস্ত্রগুলির ফলা তারা একে অপরকে ঢুকিয়ে দিতে শুরু করল। আর এর ফল হল মারাত্মক।

রাত পেরিয়ে সকাল হল। গ্রামবাসীরা ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা খুলল আর খুলে দেখল, ইয়েতিদের প্রায় সবাই মরে পড়ে আছে। শুধু একটি ইয়েতি মাতাল হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। গ্রামবাসীদের যত রাগ গিয়ে পড়ল ওই ইয়েতির ওপর। তারা ওই ইয়েতিটাকে হত্যা করে তার গা থেকে চামড়াটা ছাড়িয়ে নেয়।

হিলারির চমক ভাঙল। লামা বললেন, “এই সেই ইয়েতির চামড়া। হিলারিকে চুপচাপ দীর্ঘক্ষণ নিরীক্ষণ করল চামড়াটি। লামা ধীর কণ্ঠে হিলারির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, “এই বস্তুটি বহুকাল মঠে সংরক্ষিত আছে। আমরা কেউই এর বয়স জানি না। এখানে কিছু লিপি আছে যাতে এর উল্লেখ আছে।”

হিলারি সারারাত ধরে তার সঙ্গে থাকা অভিযাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এ-বিষয়ে পরদিন সকালেই গেলেন মঠের লামার কাছে। তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব রাখলেন হিলারি। তারা হিলারি লামাকে বললেন, “বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার জন্য আমরা চামড়াটি ইউরোপ ও আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়।”

লামা জানিয়ে দিলেন, “ওই চামড়া মঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, গ্রামের বাইরেও নিয়ে যাওয়া যাবে না।” বহু আলোচনার পর গ্রামের লোকজন লামাকে বোঝালেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনুরোধে লামা ইয়েতির সেই চামড়া ছ’সপ্তাহের জন্য ধার দিতে রাজি হলেন। যার বিনিময়ে গ্রামের লোকজনকে আট হাজার টাকা দিতে হল হিলারিকে। কেউ কেউ বলেন টাকার অঙ্কটা ছিল আরও বেশি। আট নয়, আশি হাজার টাকা দিতে হয়েছিল হিলারিকে।

“হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড” পত্রিকায় বড়ো করে শিরোনাম দিয়ে খবর বের হল। সেখানে লেখা হল, “স্যার এডমন্ড হিলারি খুমজুং গ্রাম থেকে ইয়েতির চামড়াসংগ্রহ করেছেন। খুমজুং গ্রামের লোকেদের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে যে সেটি নেওয়ার অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে তা মঠে ফেরত দিতে হবে। এই অল্প সময়ের পূর্ণ সদ্বব্যবহার করে ইয়েতি রহস্যের উত্তর পাওয়ার জন্য তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। ইয়েতির মাথার চামড়াটি প্রথমে চিকাগোর ন্যাচারাল হিস্ট্রির জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে তা লন্ডনের জুলজিক্যাল কাউন্সিলে নিয়ে যাওয়া হইবে। বিশেষজ্ঞদের রায় নেওয়ার জন্য আরও বেশ কিছু জায়গায় সেটি নিয়ে যাওয়া হবে।

খুমজুং গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে স্যার এডমন্ড হিলারির চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি

অনুযায়ী ইয়েতির ওই চামড়া প্রথমবারের জন্য খুমজুং গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মাকালু শৃঙ্গে এডমন্ডের বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক অভিযানের সঙ্গী তিনজন শেরপা খুমজুংয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইয়েতির মাথার চামড়া ফিরিয়া দেওয়ার বিষয়ে জামিন হয়েছে বলে জানা গেছে। শুক্রবার স্যার এডমন্ড কলিকাতায় এসে পৌঁছোন। ইয়েতির মাথার চামড়া সম্পর্কে তিনি কোনোপ্রকার মতামত প্রকাশে অক্ষমতার কথা জানান এবং বলেন যে, তিনি বিশেষজ্ঞদের কাছে ওই দ্রব্যটি নিয়ে গিয়ে দেখাবেন। তিনি বলেন, তিনি ইয়েতির গমনাগমনের পথ দেখেছেন তবে অন্য প্রাণীর গমনাগমনের ফলেও ওই পথ তৈরি হতে পারে।

বর্তমান কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা করবেন। খুমজুং গ্রামের মোড়ল খুম্বচুম্বি এবং প্রাণীতত্ত্ববিদ শ্রীমার্লিন পার্কিন্স তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন। এডমণ্ড হিলারি শুক্রবার কলিকাতা বিমান বন্দরে নন্দাঘুন্টি বিজয়ী দলের নেতা সুকুমার রায়ের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং নন্দাঘুন্টি বিজয়ের জন্য তাঁকে ও দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে অভিনন্দন জানান। তিনি শ্রী রায়ের কাছ থেকে অভিযানের যাত্রাপথ ও তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।”

হিলারি ও তাঁর দলবল তিব্বত থেকে কাঠমাণ্ডু হয়ে ব্যাংকক হয়ে শিকাগো পৌঁছোলেন বিমানযোগে। সেখানে একদফা পরীক্ষা চলল সেই ইয়েতির চামড়ার।

জাতীয় ইতিহাস জাদুঘরের বিজ্ঞানীরা ইয়েতির সেই চামড়া পরীক্ষা করলেন। তারপর সেখান থেকে হিলারি ও তাঁর দল প্যারিস হয়ে গেলেন লন্ডনে। সেখানকার রয়্যাল জুলজিক্যাল সোসাইটির বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন ইয়েতির সেই চামড়ার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনোটিতেই ইয়েতি সম্পর্কিত কোনো আশাব্যঞ্জক তথ্য উঠে এল না। অনেক সংবাদপত্র জিনিসটা ভুয়া বলে শিরোনাম দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে খবর ছেপে দিল। হিলারি ও তার দল কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে না পেয়ে ক্ষুণ্নমনে কাঠমান্ডু হয়ে তিব্বতে ফিরে গেল। আর যাদের জিনিস তাদের কাছে ফেরত দিয়ে দিল।

লামাকে হিলারি যখন জানাতে গেলেন এই চামড়া কার তার কোনো সদুত্তর তিনি পাননি। চামড়াটি আদৌ ইয়েতির কিনা তাও তিনি জানতে পারেননি। তখন হিলারির কথা শুনে লামা কোনো পাত্তাই দিলেন না। লামা মৃদু হেসে বললেন, “তোমাদের পরীক্ষায় আমাদের কী আসে যায়। বিচিত্র ও রহস্যময় এ পৃথিবীর কতটুকুই বা জান তোমরা? সব কিছুর উত্তর কি বিজ্ঞান দিতে পারে?”

রহস্যে মোড়া শেরপাদের গ্রাম 'খুমজুং'

হিমালয়ে অনেক কঠিন ট্রেকরুট আছে, যেমন কালিন্দী খাল ট্রেক, চাদর ট্রেক, অডেনস কল ট্রেক, ট্রান্স-জাঁস্কর ট্রেক। এগুলি তুলনা মূলকভাবে এভারেস্ট বেস-ক্যাম্প ট্রেকের চেয়ে অনেক কঠিন, কিন্তু এভারেস্ট এভারেস্টই। পথের শেষে তার দেখা মেলার অনুভূতি আর কোনো ট্রেকে নেই। চলুন এভারেস্ট বেস-ক্যাম্পের দিকে যাওয়া যাক আর সেই পথ ধরেই আমরা পৌঁছে যাব শেরপাদের গ্রামে। আর সেই গ্রামে গিয়ে আমরা জানব শেরপাদের জীবনের নানান অজানা কথা। খুটিনাটি বিষয়। কেমন ভাবে তারা থাকে, কী খায়, এভারেস্ট চড়া ছাড়া আর কী কী করতে ভালোবাসে, এমন অজস্র কথা। চলুন হাজারো উত্তরের খোঁজে যাওয়া যাক শেরপাদের গ্রামে।

প্রথম দিন কাঠমান্ডু। আপনি বিমানেও যেতে পারেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে রক্সৌল হয়েও নেপাল প্রবেশ করতে পারেন। নেপালের হাজারো প্রবেশ পথ। রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে ট্রেকিং করে পৌঁছে যান লুকলা।

ঘনসবুজ অরণ্য আর দুধসাদা হিমালয়ের রূপ দেখতে দেখতে পৌঁছে যান লুক্লার তেনজিং-হিলারি এয়ারস্ট্রিপ, উচ্চতা ২৮০০ মিটার। তারপর আবার যাত্রা শুরু লুকলা থেকে তিন-চার ঘণ্টার ট্রেক করে পৌঁছোন ফাকদিং প্রায় ২৬০০ মিটার। বিশ্ববিখ্যাত ট্রেকরুটটি এগিয়ে চলবে শেরপাদের গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে। অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য নিয়ে পথে দেখা দেবে দুধকোশি নদী আর উপত্যকার ল্যাডস্কেপ। ব্যাকড্রপে পাহাড়ের গায়ে সদ্য জমা বরফ আপনাকে আনমনা করে দেবে।

রাতটা থেকে যান ফাকদিংয়ে। পরের দিন ফাকদিং থেকে রওনা দিন নামচেবাজারের দিকে। ছবির মতো বেশ কিছু গ্রামের মধ্যে দিয়ে তিন ঘণ্টা ট্রেক করে জোরসালে গ্রামে এসে পারলে লাঞ্চ সেরে ফেলুন। পাহাড়ি গ্রামে সাধারণ খাবার ভাত কিংবা চাপাটি। সামান্য ডাল। সবজি। আচার। আর চাইলে চিকেন পাবেন।

পাঁচটি সাসপেনশন ব্রিজ পথে আপনাকে পেরোতে হবে। কাঁপন ধরানো গভীর গিরিখাত ও শৈলশিরা আপনার যাত্রাপথের সঙ্গী হবে। অবাক চোখে আপনাকে স্বাগত জানাবে কুসুম কাংগু, থামসারকু এবং কুম্বিয়েলা শৃঙ্গের দল।

ঘণ্টা সাতেক ট্রেক করে ফাকদিং থেকে পৌঁছে যান নামচেবাজার, ৩৪৫০ মিটার। উচ্চতা ও আবহাওয়ার সঙ্গে নিজের শরীরকে টিউন করাতে পারলে ভালো হয়। কারণ তা না হলে পদে পদে আপনি বেশ সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

আপনি যে পথে হাঁটছেন, হাঁটতে হাঁটতে একবার ভাবুন এই পথে হেঁটে গেছেন পৃথিবীর সেরা পর্বতারোহী ম্যালোরি, আরভিন, হিলারি, তেনজিং, মেসনাররা। জাস্ট আপনারা গায়ে কাঁটা দেবে। আপনার মতো রুকস্যাক পিঠে নিয়েই তাঁরা এভারেস্ট জয় করেছেন। বিশ্বাস করুন মনে মনে একটা শিহরন অনুভব করবেন। এমন মনে করলেই দেখবেন একটা অদ্ভুত এনার্জি কাজ করতে শুরু করেছে মনমধ্যে। ট্রেকের আনন্দ নিতে নিতে হাঁটতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, হিমালয়কে প্রণাম করে যাত্রা শুরু করবেন। কারণ ধ্যানমগ্ন মহাদেবকে যদি আপনি সম্মান না করে বের হন তো আপনার যাত্রা বিফল। তাই কোনোভাবেই নিজের ক্ষমতা জাহির করবেন না। হিমালয় আপনার চেয়ে কোটিগুণ শক্তিশালী। আপনি তার কাছে তুচ্ছ। তাই ঈশ্বরকে সহায় করে হাঁটাই ভালো।

নামচেবাজারে কাটান একটা দিন পুরো। হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করুন প্রাণভরে।

আশপাশের সবুজ পাহাড়ে একটু নিজের মতো ঘোরাঘুরি করুন। ফটো তুলুন মন ভরে। সিকিমের ছাঙ্গু লেকের কাছে থাকা ইয়াক কিংবা মানালির হিড়িম্বা মন্দিরের বাইরে থাকা ইয়াকদের থেকে নেপালের এই ইয়াক বা চমরি গাইগুলি আকারে বেশ বড়ো। নানা পোজে ছবি তুলুন প্রাণ ভরে। নামচেবাজারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্বাদ নিন। এ পথের শেষ বড়ো বাজারের এখানে। সেকারণেই নাম নামচেবাজার বা নামচি বাজার। কেনাকাটার ঝোঁক থাকলে কিনতে পারেন অ্যান্টিক কিছু সামগ্রী। স্থানীয় বৌদ্ধদের

নানান নিদর্শন নেড়ে চেড়ে দেখতে পারেন। কিনতেও পারেন দরদাম করে। ট্রেকিং গিয়ার থেকে বিয়ার সবই পাবেন।

নামচেবাজার থেকে পরদিন আবার শুরু ট্রেকিং। এবার গন্তব্য খুমজুং বা শেরপাদের গ্রাম।

নামচেবাজার থেকে দু'-তিন ঘণ্টায় ট্রেক করে পৌঁছে যান খুমজুংয়ে। খুমজুংয়ের উচ্চতা ৩৭৮০ মিটার। মেঘছোঁয়া উপত্যকার ভেতর দিয়ে এই হাঁটাপথ সত্যিই নৈসর্গিক। হাঁটতে হাঁটতে এক স্বর্গীয় অনুভূতি লাভ করবেন আপনি।

পবিত্র পর্বত খুম্বিয়েলার পদতলে অবস্থিত খুমজুং। শেরপাদের গ্রামে পৌঁছেই একটু জিরিয়ে নিন। চা খান। ঘন দুধের চা। চমরি গাইয়ের দুধের চা। কেউ কেউ মাখন চা বলেন। এই চা লে-লাদাখে বেশ পরিচিত। একটু বিশ্রাম সেরে ঘুরে দেখুন খুমজুং গ্রাম। দেখে নিন ইয়াক ফার্ম। তারপর পৌঁছে যান খুমজুং মনাস্ট্রিতে।

মেডিটেশনে আগ্রহ থাকলে একমনে একটু ধ্যান সেরে নিন মনাস্ট্রিতে। খুমজুং মনাস্ট্রিতে ইয়েতি নামক অলৌকিক প্রাণীর মাথার একটি খুলি আছে। বিশ্বাস করা বা না-করাটা আপনার ব্যাপার।

খুমজুং থেকে আপনার মন চাইলে একদিনের জন্য যেতে পারেন ফরৎসে। এটিও ট্রেকিং রুট। ছ'ঘণ্টা সময় লাগবে ফরৎসে গ্রামে পৌঁছোতে। ফরৎসের উচ্চতা ৩,৮১০ মিটার। এই যাত্রাপথের সৌন্দর্যে আপনি মোহিত হয়ে যাবেন। ছবির মতো সুন্দর সাজানো গোছানো গ্রাম ফরৎসে।

ফিরে আসি খুমজুংয়ের গল্পে। শেরপাদের এই গ্রাম নিয়ে যত গল্পই বলি না কেন তা সহজে শেষ করা যাবে না। খুমজুং নেপালের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাগরমাথা জাতীয় উদ্যানের অংশ। সারা পৃথিবীর পর্বতারোহীদের কাছে অতি পরিচিত এই অঞ্চল। এর উত্তরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট, যার নেপালি নাম সাগরমাথা। জীবিকাসূত্রে এখানকার সব পরিবারই পর্বতারোহণ ও পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামে যুবাপুরুষের দেখা মেলে না সেভাবে। স্বল্পকালীন পর্বতারোহণ মরশুমে যুবক পুরুষরা বিভিন্ন অভিযাত্রীদলে শেরপার কাজে যোগ দেন।

এডমন্ড হিলারির শিখরবিজয়ী দলের অনেক শেরপাই ছিলেন খুমজুং আর পড়শি-গ্রাম খুন্দের বাসিন্দা। খুমজুংকে ভালোবেসেছিলেন স্যার হিলারি। আর খুমজুংয়ের সঙ্গে তাই হিলারির সম্পর্ক এক ইতিহাস তৈরি করেছে।

খুমজুং এলে তাই কিন্তু অতি অবশ্য একটি জায়গা যেতে ভুলবেন না। সেটি হল স্যার এডমন্ড হিলারি স্থাপিত "হিলারি স্কুল"। খুমজুং-এ শুধু স্কুলই খুলে দেন নি হিলারি। তিনি খুন্দেতে একটি হাসপাতালও করে দেন শেরপাদের জন্য। খুম্বু উপত্যকার এখন সবচেয়ে বড়ো এই হিলারি স্কুল। স্কুলটির পোশাকি নাম খুমজুং সেকেন্ডারি স্কুল। লোকমুখে 'হিলারি স্কুল' নামেই পরিচিত। বহুদূর থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে পায়ে হেঁটে পড়তে আসে পড়ুয়ারা। স্কুলের বাচ্চাদের নীল পোশাক যেন হিলারির মানবিক ভাবনার গভীরতাকে বোঝায়। স্কুলপড়ুয়ারা অনেকেই ভবিষ্যতের এভারেস্ট অভিযাত্রী।

এবার আসুন একটু জেনে নেওয়া যাক শেরপাদের সম্বন্ধে। সে অনেককাল আগের কথা। হিমালয়ে পর্বতারোহণ তখনও শখের জিনিস হয়ে ওঠেনি। তিব্বতের পূর্বদিক থেকে একদল মানুষ নেপালে পাড়ি জমায়। দুই অঞ্চল তখনো একই দেশ ছিল। তারা নিজেদের 'শার-ওয়া' বলে ডাকত। তারা আজ আমাদের কাছে পর্বতের অতিমানব 'শেরপা' বলে পরিচিত।

হিমালয় ট্রেকিংয়েই হোক আর ভ্রমণেই হোক শেরপাদের গুরুত্ব অপরিহার্য। তাদের নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা থাকে। অনেক প্রশ্ন আসে তাদের নিয়ে। অনেকেরই এ ব্যাপারে কৌতূহল আছে।

শেরপাদের নিয়ে বিভিন্ন সময় হিমালয় ভ্রমণ করতে করতে জেনেছি। তারই দু'চার কথা

এখানে বলছি। শেরপারা জাতিগতভাবে সাধারণ কুলি নয়। ক্যাম্প প্রস্তুত করা, অন্য শেরপাদের নিয়ন্ত্রণ করা, কোনো শেরপার কাঁধে ভার বেশি হয়ে গেল কি না, ট্রেকিং দলের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবা এগুলো তাদের কাজ। তা ছাড়া সেবা গ্রহণকারী অভিযাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ, পুরো রাস্তায় তাদের সাহায্য করা থেকে শুরু করে অভিযাত্রী যখন ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন যেন চা গরম থাকে, তা দেখাশোনা করার দায়িত্বও একজন শেরপার।

শেরপা জাতিগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কিছু মানুষ এই কাজ করে থাকেন। তবে তা শুধু বেস ক্যাম্প পর্যন্ত। এর পরের ক্যাম্পগুলো থেকে সামিট পর্যন্ত যেতে বেশি দক্ষতার শেরপাদের প্রয়োজন হয়। এদের বেশিরভাগই আসেন শেরপা জাতিগোষ্ঠী থেকে। উচ্চতার ঝুঁকি আর দক্ষতার পাশাপাশি আন্তরিক এই দায়িত্ব পালনের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে শেরপারা ভালোটাকা পান। জীবনের ভয়কে তুচ্ছ করে একজন দক্ষ শেরপা দু'মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকেন।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় শেরপারা নেপালের সোলুখুম্বু উপত্যকায় পাংবোচি গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অন্যতম। উপত্যকাটি বর্তমানে জাতীয় উদ্যান। শেরপাদের গ্রাম থেকেই এভারেস্টে ওঠার পথ শুরু হয়।

১৯৭৬ সালে আমেরিকার একটি গবেষণায় বলা হয়, হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অন্যতম বেশি উচ্চতায় আর হিমালয়ের তাপমাত্রায় থাকতে থাকতে শেরপাদের শরীর ওই আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। তাদের শরীর তাদেরকে বেশি উচ্চতায় আর কম অক্সিজেনে বেঁচে থাকার মতো করে প্রস্তুত করেছে। হিমোগ্লোবিনে বাঁধা তাদের শরীরের এনজাইমগুলো আমাদের থেকে একটু আলাদা গোছের। তাদের হৃৎপিণ্ড শর্করাকে কাজে লাগায়, আর ফুসফুস কম অক্সিজেনে থাকার জন্য বেশ উপযোগী।

এই গবেষণার পর আরও অনেক গবেষণা হয়েছে তাদের জিনতত্ত্বের বিষয়ে। এই মতকে সামনে রেখে একদল গবেষক বলেন, "আমরা, আমাদের ছেলেমেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়েরা যদি শেরপাদের এলাকায় গিয়ে বসতি গড়ি তাহলে আশা করা যায়, আমাদের বংশে একদিন শেরপাদের মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ তৈরি হবে।" এখন এ-বিষয়ে তর্কের খাতিরে বলা যতটা সহজ করা ততটাই কঠিন।

অবশ্য আপনি যদি রেইনল্ড মেসনারের মতো হয়ে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। তিনি এভারেস্টের শিখরে একাই চলে গিয়েছিলেন, কোনো অক্সিজেন ছাড়া। এছাড়া তিনি পৃথিবীর ১৪টি ৮,০০০ মিটারের বেশি পর্বতের সবগুলোকে জয় করে ফেলেছেন।

বিখ্যাত শেরপারা জাতিগোষ্ঠীগতভাবে অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিবার এভারেস্ট সহ পুরো হিমালয়ের সব পর্বতে সামিট করার সর্বোচ্চ রেকর্ডধারী। ১৯৫৩ সালে স্যার এডমন্ড হিলারির সঙ্গে তেনজিং নোরগে শেরপার প্রথমবার এভারেস্ট বিজয় শেরপাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো অর্জন। তিব্বত ও ভারত তেনজিংকে নিজেদের বলে দাবি করে আসছে। খ্যাতিতে পিছিয়ে নেই আপা শেরপাও। তিনি ২০১১ সাল পর্যন্ত ২১ বার এভারেস্ট জয় করে ফেলেছেন। স্ত্রীকে তিনি কথা দিয়েছিলেন ২১তম বারের পর আর এভারেস্টে উঠবেন না। ২০১৮ সালের মে মাসে কামি রিতা শেরপা এই রেকর্ড ভেঙে ২২তম বার এভারেস্ট অভিযান শেষ করেন। এটা পৃথিবীতে সর্বোচ্চবার এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড।

এখন এই প্রশ্ন সবার মধ্যেই বেশ নাড়া দেয় যে, শেরপারা সবসময় এভারেস্টের আশেপাশেই কেন থাকে? এর উত্তর খোঁজ করে অবাক হয়েছিলাম। শেরপারা শুধু এভারেস্টের আশেপাশেই থাকে এই ধারণাটাই ভুল। শেরপাদের রক্তে আছে ভ্রমণের নেশা।

একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রায় ৬০০ বছর আগে জ্ঞানগঞ্জ বা সাংগ্রি-লা খুঁজতে তিব্বত থেকে সোলুখুম্বু অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল একদল মানুষ। সেখানে তারা জীবনকে উন্নততর করে তোলার সুযোগ পায়। তারপর কেটে যায় অনেকগুলো বছর। শুরু হয় এভারেস্ট অভিযান। এভারেস্ট অভিযান বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গেই স্বচ্ছল হয়ে ওঠে শেরপাদের জীবন। তাদের সন্তানেরা কাঠমান্ডু থেকে শুরু করে দেশের বাইরে পর্যন্ত পড়তে

যায়। একটি ব্রিটিশ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ৫,০০০-এর বেশি শেরপা দেশের বাইরে বসতি গড়েছেন। পাহাড়ে চড়া ছাড়াও বিভিন্ন পেশার সঙ্গে তারা যুক্ত। বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক শেরপাই পাহাড় চড়া ছেড়েছেন। তারা কেউ বা পর্বত আরোহণ সম্পর্কিত ব্যাবসা করেন, কেউ বা ট্যাক্সি চালান। কেউ কেউ তো বিমানও চালান। প্রবাসী শেরপাদের অর্ধেকের বেশি থাকেন আমেরিকায়। এছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা জার্মানিতেও আছেন অনেক শেরপা ও তাদের পরিবার।

শেরপা মানেই যে তাকে পাহাড়ে চড়তে হবে এমন ধারণাটাও ভুল। শুধু তাই নয়, শেরপা মানেই যে তাকে পাহাড় ভালো বাসতে হবে এটাও নয়। শেরপা জাতিগোষ্ঠীর এক প্রবীণ ব্যক্তি জানিয়েছেন, "উচ্চতম পর্বতগুলোর মাথায় দেবতাদের বাস, আর এ স্থান জয় করা নয়, সম্মান করে দূর থেকে দেখা উচিত। পর্বতের শীর্ষে পৌঁছোনোর মোহ এসেছে সুদূর ইউরোপ থেকে। এমনকি যেসব শেরপারা দক্ষতার সঙ্গে পাহাড় জয় করে ফেলেন, তাদের অনেকের বিশ্বাস পাহাড়ে দুর্ঘটনা হয় দেবতার প্রতি যথাযথ সম্মান না দেখানোর কারণে। এভারেস্ট অভিযান শুরু করার আগে তারা পুজো করে দেবতার অনুমতি ও সহায়তা প্রার্থনা করেন।"

নেপালের এক পাহাড়ি গ্রামে এক চায়ের দোকানে বসে থাকা এক শেরপাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা আপনাদের শেরপাদের অনেকের নামেই বেশ কিছু কমন নাম আছে, যেমন লাকপা, পাসাং, তেনজিং কিংবা পেমবা হয় কেন? "একটু খোঁজ খবর করে দেখবেন শেরপাদের কারওরনাম লাকপা দর্জি, তো কারওর নাম দর্জি লাকপা। তাদের মধ্যে একই কিছু নাম আছে যে নামে বহুজনকে পাওয়া যায়। এই বিচিত্র ব্যপারটা আমায় বেশ ভাবিয়েছিল। তাই হাতের কাছে এক শেরপাকে পেয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিলাম। সাংবাদিকসুলভ মন থেকে নিস্তার কোথায় বলুন!

উত্তরে সেই শেরপা ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে জানালেন, "এরকম মিলের পেছনে একটা কারণ, আমদের সমাজে শিশুরা সপ্তাহের যে বারে জন্মগ্রহণ করে, সেই বারের নামে শিশুর নামকরণ করার প্রবণতা আছে। এভাবেই কারও নাম দেওয়া হয় পাসাং। পাসাং মানে শুক্রবার, আবার পেমবা মানে শনিবার। এই নাম দিয়ে অনেক শেরপার নামকরণ করা হয়। এছাড়া গুণের নামেও তাদের নাম হয়, যেমন লামো। লামো মানে সুন্দর। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের পুথির পাতা থেকে উঠে আসা তেনজিং শেরপা সমাজে বহুল ব্যবহৃত অনেকগুলো নামের মধ্যে একটি।'

তুষার পর্বতের অতিমানব হয়ে উঠতে গেলে তো সাধারণ মানুষের খাওয়া-দাওয়া চলবে না। তাহলে কী খেয়ে বেঁচে থাকে শেরপারা? খুব সহজ উত্তর, ডাল-ভাত। হ্যাঁ, ডাল-ভাত নেপালেরও একটি প্রধান খাবার। সাধারণত শেরপারা একবাটি ভাতের সঙ্গে একটু সবজি আর ডাল দিয়েই ভোজন সারেন। দুর্গম পাহাড়ের পথ পেরোতে, বারবার উঠতে নামতে তাদের শরীরের ওপর যে ঝক্কি যায় তার জন্য শর্করাসমৃদ্ধ খাবার তাদের ভীষণ দরকার। ভাতের শর্করা আর ডালের আমিষ তাদের পেশিক্ষয় থেকে বাঁচায় ও সুস্থ রাখে।

রক্তের সূত্রে হিমালয়ের এই রক্ষাকর্তাদের গল্প যতই দুঃসাহসিক শোনাক না কেন, তারাও কিন্তু দিনের শেষে আমার আপনার মত সাধারণ মানুষ। তুষারধ্বস সহ নানা দুর্ঘটনায় তাদেরও মৃত্যু ঘটে। উচ্চতার দোষে বা এমনিতেই যখন অভিযাত্রীরা বিভিন্ন উদ্ভট আচরণ শুরু করেন, তখন এমনও নজির আছে যে সেই সব অভিযাত্রীরা নিজেদের শেরপাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আসে। এভারেস্টে উঠতে গিয়ে আজ পর্যন্ত যত অভিযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে তাদের এক-তৃতীয়াংশই কিন্তু শেরপা।

১৯৩৯ সালে একটি নাৎসি আরোহী দল এভারেস্ট অভিযানে যায়। মাঝপথে ঝড়ের কবলে পড়ে অভিযাত্রীদেরকেই উলটে বয়ে নিয়ে ফিরতে হয়েছিল শেরপা দলকে। একজন শেরপা কখনোই তার জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। অভিযানের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো তারাই করেন, দলের সামনে দড়ি-মই ঠিক করা থেকে দলের নিরাপত্তা বৃদ্ধিও

তাদের দায়িত্ব। কিন্তু নিরাপত্তা সীমার বাইরে গিয়ে, দুর্যোগে, দুর্ঘটনায় বা স্বাস্থ্যগত কারণে যদি কোনো অভিযাত্রী মারা যান, তাহলে তা শেরপার দায় নয় মোটেও।

হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে নেপালের শেরপারা একটি অবিচ্ছেদ্য নাম। হাসিখুশি উচ্ছল চেহারা, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি—এই হচ্ছে শেরপা গোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারির সঙ্গে শেরপা তেনজিং নোরগে যখন প্রথম এভারেস্ট জয় করেন, তখন হিমালয়ের বাসিন্দা শেরপাদের পরিচিতি দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর অনেকেই এভারেস্ট জয় করেন। তাদের পথপ্রদর্শক সহযোগী হিসেবে শেরপারা বরাবরই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। বলতে গেলে, হিমালয় অঞ্চল সফরে গেলে শেরপা গাইড ছাড়া চলা দায়। ২৯ হাজার ৩৫ ফুট বা ৮,৮৫০ মিটার উচ্চতার এভারেস্ট জয় করার অভিযানে নেমে এ পর্যন্ত কয়েকশো অভিযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আর তাতেই বোঝা যায়, এ অভিযান কত ঝুঁকিপূর্ণ আর দুঃসাহসের। সেই দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে বিরূপ পরিবেশে শেরপারা বাস করছে যুগ যুগ ধরে। মাউন্ট এভারেস্টের কাছে খুম্বু উপত্যকায় কয়েক হাজার শেরপার বাস। সারা নেপালে শেরপা আছে দশ হাজারের বেশি।

ব্রট কোবার্ন নামে একজন এভারেস্ট-বিশেষজ্ঞ শেরপাদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘উঁচু পাহাড়ে ওঠার সময় শেরপাদের মধ্যে অতিমানবের শক্তি দেখা যায়।’

হিমালয়ের কোলে শেরপাদের অনেক গ্রাম সমতল থেকে প্রায় ১৪ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত, অর্থাৎ যা কিনা ৪,২৬৭ মিটার উঁচুতে। এসব গ্রামে গাড়ি চলাচলের পথ দূরে থাক, হেঁটে চলার পথও নেই। অথচ শেরপারা সেখানে দিব্যি স্বচ্ছন্দে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, পিঠের ওপর অনেক ভারী বোঝা নিয়ে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যান।

কিছু শিশু রোজ হাজার দেড়েক ফুট উঁচু ঢাল বেয়ে উঠে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায়। মানে যার উচ্চতা প্রায় ১৫০ তলা বাড়ির সমান। তবে এভারেস্টে আরোহণের ঝুঁকির কাছে তাদের এ কষ্ট নস্যি। এই ঝুঁকি নিয়ে সর্বকনিষ্ঠ এভারেস্ট বিজয়ী হিসেবে বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছে যে দুই কিশোর ও কিশোরী, তারাও কিন্তু শেরপা। যার মধ্যে একজন তেম্বা শেরি। ২০০১ সালের ২২ মে মাত্র ১৬ বছর বয়সে এভারেস্ট জয় করে সে। একই সঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ এভারেস্ট বিজয়ী হিসেবে তেম্বা দীর্ঘ ২৭ বছরের রেকর্ড ভাঙে। ১৯৭৪ সালে ১৭ বছর বয়সে এভারেস্ট জয় করে ওই রেকর্ড গড়েন শম্ভু তামাং। তেম্বার আগে ১৪-১৫ বছরের কিশোরেরা এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু আরোহণজনিত ক্লান্তি, আঘাতের কারণে জখম, অক্সিজেন-সংকট—এসব কারণে কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তবে তেম্বার কথা আলাদা।

২০০০ সালের জুনেই সে এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছিল। চূড়া থেকে সে যখন ৭০ ফুটেরও (২২ মিটার) কম দূরে রয়েছে, এমন সময় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফিরে আসতে বাধ্য হয় সে। প্রচণ্ড বরফ পড়ায় তাঁর শরীরের কিছু অংশ অবশ হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা তাঁর ভালো র জন্য ডান হাতের তিনটি ও বাঁ হাতের দুটি আঙুল কেটে ফেলেন। এমন ঘটনায় তেম্বার এভারেস্ট জয়ের স্বপ্ন মিলিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে যে অসমসাহসী, পরের বছরই তা প্রমাণ করে।

২০০৩ সালের ২৪ মে এভারেস্ট জয় করে সর্বকনিষ্ঠ আরোহণকারী হিসেবে নতুন রেকর্ড করে মিং কিপা। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। তবে একা নয়, বড়ো বোন লাখপা শেরপা ও ভাই মিংমা জ্ঞালু শেরপাও তাঁর সঙ্গে এভারেস্ট জয় করে।

২০১৯ এর নভেম্বর থেকে বিশ্বজুড়ে করোনার প্রভাব পড়তে শুরু করল। দেখতে দেখতে হিমালয়কেও গ্রাস করল করোনা মহামারি। আর তার জেরে প্রথমবারের মতো বন্ধ হল এভারেস্ট অভিযান! ৩ হাজার শেরপা হয়ে পড়লেন বেকার। বাধ্য হলেন তাদের পেশা বদলাতে। ২৪ মার্চ কাঠমান্ডু থেকে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প লুম্বা যাওয়ার ফ্লাইট চলাচল বন্ধ

করে দিয়েছিল প্রশাসন। তার দু-তিনদিনের মধ্যেই হয়তো নেপাল সরকার অভিযাত্রীদের এভারেস্ট অভিযানের অনুমতিপত্র দিতে শুরু করত। কিন্তু করোনার জন্য সব ভেস্তে যায়। ২০২০-২১ এর এভারেস্ট অভিযান বন্ধ হয়ে যায় প্রথমবারের জন্য। সব থেকে খারাপ খবর ২০২০-২১ সালে নেপালে এভারেস্ট অভিযানের মরশুম শুরুই হয়নি। এভারেস্ট অভিযানের জন্য ৭৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয় নেপাল সরকার। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত চলে এই সময়। ২০২০-এর মার্চ থেকেই করোনার হানার জন্য এভারেস্ট অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় নেপাল সরকার। যার জেরে কর্মহীন হন প্রায় তিন হাজার শেরপা।

এই সময় সারা বিশ্বের বহু পর্যটক নেপালে থাকেন। কিন্তু এবছর একজন পর্যটকেরও দেখা নেই সেখানে। ভূমিকম্পে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরও নেপালে পর্যটকরা এসেছিলেন। এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পুরো খালি হয়ে রয়েছে। ২০১৯-এর মে মাসের শেষের দিকে এভারেস্ট অভিযানের সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে অভিযাত্রী, শেরপা ও গ্রাউন্ড স্টাফরা ফিরে এসেছিলেন। এবার সেখানে মরশুম শুরুই করা যায়নি। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, এভারেস্ট অভিযান থেকে নেপালের জিডিপি-র চার শতাংশ আয় আসে। সরকার আন্দাজ করেছিল, এবার অন্তত ২০ লাখ পর্যটক নেপালে ভিড় জমাবেন। কিন্তু কিছুই না হওয়ায় বিপাকে পড়ে সরকার। যার জেরে ভারতীয় মুদ্রায় ন'হাজার কোটি টাকা লোকসানের আশঙ্কা করছে নেপাল সরকার। ১১ লাখ মানুষের চাকরি সংকট রয়েছে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে সব থেকে সমস্যায় পড়েছেন শেরপারা। তাঁরা এবার পেশা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন।

গ্রামে চাষবাস করছেন অধিকাংশ শেরপা। এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের সব থেকে নিকটবর্তী গ্রামটি ২০ কিমি দূরে অবস্থিত। গ্রামের নাম খারিখোলা। এই গ্রাম থেকে সাধারণত বেস ক্যাম্পে পৌঁছোতে লাগে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা। কিন্তু শেরপারা তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোতে পারে। এই গ্রামে অধিকাংশ শেরপা অভিযাত্রীদের এভারেস্টে চড়তে সাহায্য করেন। এবার কাজ নেই। তাই আপাতত চাষবাস শুরু করেছেন তাঁরা। প্রবল আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে সেখানে। করে ফিরবে শেরপাদের হাল আর কবে থেকে আবার শুরু হবে এভারেস্ট অভিযান সেটাই এখন দেখার।

হিমালয়ের অলৌকিক ‘পাগলা মধু’

‘পাগলা মধু’র নাম শুনেছেন? এই পাগলা মধু শুধুমাত্র পৃথিবীর একটি স্থানে পাওয়া যায়। সেটি হল হিমালয়। হিমালয়ের মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে।

হিমালয়ের মৌমাছির কিছু বিশেষত্ব আছে। সেখানকার মৌমাছিগুলি সাধারণ মৌমাছির মতো নয়। আকারে এরা সাধারণ মৌমাছির থেকে অন্তত পাঁচ গুণ বড়ো এবং এরা অন্য মৌমাছির তুলনায় বেশি বিষাক্ত এবং এদের কামড় বা হুলের ব্যথাও অনেক বেশি।

মৌমাছিগুলির সাধারণ অবস্থান হল সুউচ্চ গ্রানাইটের পাহাড়ের কয়েকশো ফুট উঁচু কোনো এক খাড়া ঢালের গায়ে। হিমালয়ের মৌমাছিগুলো বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের মধু উৎপাদন করে। মধুর প্রকার সাধারণত মরশুমের ওপর নির্ভর করে। মৌসুমি ফুলের বিভিন্ন রস আরোহণ করে হিমালয়ান মৌমাছিগুলি মধুও উৎপাদন করে ভিন্ন ধরনের। তবে মার্চ ও এপ্রিল মাসে এরা এক ভিন্ন ধরনের মধু উৎপাদন করে।

পাঁচ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মধু তার ঔষধি গুণের জন্য দুনিয়া জুড়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অ্যালার্জি হোক বা আঘাতের ক্ষত, মধুকে চিকিৎসাক্ষেত্রে যতভাবে ব্যবহার করা হয়, অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যকে ততভাবে ব্যবহারের নজির নেই। মিশরের ফ্যারাওদের মৃত্যুর পর তাদের যাত্রার সঙ্গী কিংবা সদ্যোজাত শিশুর প্রথম খাবার-মধুর ব্যবহারের প্রচুর প্রমাণ রয়েছে।

নেপালের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে এমন এক মধু পাওয়া যায়, যা খেলে অনুভূত হয় অদ্ভুত মাদকতা। নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি খেয়ে ফেললে বাস্তব-অবাস্তব জ্ঞানও হারিয়ে ফেলতে পারেন আপনি!

নেপালকে সবাই আধ্যাত্মিকতা আর রহস্যমণ্ডিত জগতের সেতুবন্ধন হিসেবে দেখে। নেপালের দুর্গম ভূপ্রকৃতি আর অনন্য জীববৈচিত্র্যের মাঝে এমন কিছু জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়, যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। তেমনই এক জিনিস হল ‘পাগলা মধু’!

হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি উপত্যকায় বসবাস করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মৌমাছি—এপিস ডোরসাটা ল্যাবোরিওসা। এই মৌমাছিদের নেপাল, ভুটান, ভারত এবং চিনের ইউনান প্রদেশের হিমালয় পার্বত্য এলাকায় ৮,২০০ থেকে ১,৮০০ ফুট ওপরে পাওয়া যায়। তবে নেপালেই সবচেয়ে বড়ো মৌমাছির প্রজাতি রয়েছে, যারা তিন সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে আকার নয়, এই মৌমাছিদের বিশেষত্ব আসলে অন্য জায়গায়!

এই মৌমাছি রডোডেনড্রন নামে এমন এক গাছের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, যার মধুতে গ্রায়ানোটক্সিন নামে বিষাক্ত যৌগ থাকে। গ্রায়ানোটক্সিন হ্যালুসিনেশন ঘটাতে পারে। এই গ্রায়ানোটক্সিন মিশ্রিত মধু তাই চিকিৎসা দ্রব্য হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর এই মধু একমাত্র নেপালের কুলুং উপজাতির লোকেরা সংগ্রহ করে, তাও বছরে মাত্র দু’বার।

নেপাল হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল অন্নপূর্ণা পর্বতশ্রেণির পাদদেশে বসবাস এই কুলুং উপজাতির। একমাত্র এই উপজাতির সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার ফুট উঁচুতে চড়ে মধু সংগ্রহ করে। এই মধু সংগ্রহ তাদের সংস্কৃতির অংশ। তাদের জীবিকা নির্বাহের এটিই একমাত্র পদ্ধতি নয়। কিছুটা লোকাচার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই তারা এমনটি করে।

এক দশকেরও কিছুমাত্র আগে বিচ্ছিন্ন এই জনপদের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ ঘটে। এর পর থেকে এই অঞ্চলের মধু এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও এর বহু আগে থেকে এই অঞ্চলের মধু চিন, জাপান এবং কোরিয়ায় ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

জেনফোন, অ্যারিস্টটল এবং স্ট্রাবোর লেখায় এই মধুর উল্লেখ পাওয়া যায়। জেনোফোন তার বিখ্যাত ‘আনাবিস’ গ্রন্থে এক গ্রিক সেনাদলের উল্লেখ করেছেন, যারা বর্তমান তুরস্ক অঞ্চলে এরকম এক মধু পান করে অসুস্থ হয়ে যায়, আবার কয়েক ঘণ্টা পর সুস্থও হয়ে ওঠে। মাঝের এই সময়টিতে তারা যেন প্রবল ঘোরের মধ্যে ছিল। ফলে সেনাদল

এটিকে কোনো জাদুর প্রভাব ভেবেছিল। পরে তারা জানতে পারে যে তারা মধু খেয়েছিল।

৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন রোমান সেনাপ্রধান পম্পেই এশিয়া মাইনরে রাজা মিথ্রিদাতেসের সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন রাজা মিথ্রিদাতেস কৌশলে রোমান বাহিনীকে এই মধু পান করান এবং আক্রমণ করে পরাজিত করেন।

পশ্চিমি বিভিন্ন দেশে এই মধুকে ঔষধি দ্রব্য ভাবা হয়। সকালে খাওয়ার আগে অনেকে হালকা গরম দুধের সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণ মিশিয়ে পানও করে।

এই মধু পান করলে দেহে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তুরস্কের মধুর মতো নেপালি মধুতে অসুস্থ হতে কাউকে দেখা না গেলেও এই মধু ঝিমুনি, মুখে লালার বৃদ্ধি এবং হৃৎকম্পন ধীর গতির কারণ। এছাড়া বেশি পানে চোখের সামনে অবাস্তব কিছু ঘটার কথাও বলে অনেকে।

এক বিখ্যাত ডকুমেন্টারি মেকার এই মধু পান করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি অনেকটা মাদক সেবনের অনুভূতি দেয়, তবে অনেক ধীরগতিতে। অনেকের বিশ্বাস, এই মধু যৌনশক্তিও বৃদ্ধি করে। বহির্বিশ্বে এই মিথের ভিত্তিতেই নেপালি মধুর বাড়বাড়ন্ত হলেও মধুটির এই বিশেষ উপযোগিতা নিয়ে কোনো গবেষণা আজ অবধি হয়নি।

হিমালয়ের মৌমাছিরা অনেক রকমের মধু সংগ্রহ করে। মধু কেমন হবে তা নির্ভর করে কোন ঋতুতে মৌমাছি কোন ফুলের মধু সংগ্রহ করছে তার ওপর। যেমন বসন্তে নেপাল জুড়ে ফোটে রডোডেনড্রন। নেপালের জাতীয় ফুল এই রডোডেনড্রন। এই ফুল নীল এবং গোলাপি রঙের হয়। বসন্তকালে এই ফুলে ছেয়ে যায় নেপাল। হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতের পাদদেশ জুড়ে এই ফুল দেখতে অসাধারণ লাগে। এই ফুলের রেণু আর মধু আকর্ষণ করে এখানকার বিশাল আকারের মৌমাছিদের। মৌমাছিরা ফুলে ফুলে ঘুরে সংগ্রহ করে এই ফুলের মধু আর রেণু। তারপর সেই মধু জমা করে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত মৌচাকে।

এই মধু সংগ্রহ খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। গ্রামবাসীরা দল বেঁধে মধু সংগ্রহ করে, তাও বছরে মাত্র দু'বার। প্রায় ৩০ জনের মতো থাকে দলে। প্রত্যেকে মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার আগে দেবী রাংকেমির কাছে প্রার্থনা করে। ওদের বিশ্বাস, তিনিই তাদের রক্ষা করবেন। এর পর খাড়া পাহাড় বেয়ে প্রায় চার ঘণ্টার যাত্রা। তারপর সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গা, যেখান থেকে শুরু হবে মধু সংগ্রহের প্রস্তুতি।

মধু সংগ্রহের এই রীতি যেমন প্রাচীন, তেমনই প্রাচীন মধু সংগ্রহকারীদের পোশাকও। এত বড়ো মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের কাছে কোনো সুরক্ষাকারী পোশাক নেই। হাতের কাছে যেমন পোশাক পায়, তাই দিয়েই কাজ চালায়। অনেক গ্রীষ্মের গরমেও শীতের সোয়েটার আর ট্রাউজার পরে, কেউবা মশারি আর বাঁশ দিয়ে হেলমেটের মতো বানিয়ে মাথা ও চোখ রক্ষা করে।

পাহাড়ের গা-ঘেঁষে মৌমাছিরা ঝুলন্ত মৌচাকে মধু জমা করে। এখান থেকে মধু সংগ্রহ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে কিছু নির্ভীক মানুষ হাজার বছরের ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের কারণে জীবন বাজি রেখে মধু সংগ্রহ করে। প্রথমে তারা জংলি লতা এবং বাঁশ দিয়ে ঝুলন্ত মই তৈরি করে। বর্তমানে অবশ্য আঁশের তৈরি দড়ির ব্যবহার বাড়ছে মই বানাবার ক্ষেত্রে। তারা এই মই ঝুলিয়ে দেয় পর্বতের গা-ঘেঁষে, যেখানে মৌচাক রয়েছে। এর পর একজন দলপতির নির্দেশনায় দলের সদস্যরা মই বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। কয়েকজনের হাতে থাকে ২৫ ফুট লম্বা বাঁশ, যার মাথায় ছুরি বাঁধা থাকে মৌচাক কাটার জন্য।

কারও পিঠে থাকে বাঁশের ঝুড়ি এবং হাতে থাকে কয়েক মুঠো জ্বলন্ত খড়। সবার গায়েই থাকে ভারী এবং মোটা পোশাক। একদিকে গরমে নাজেহাল অবস্থা, অন্যদিকে এক হাতে ঝুড়ি আর বাঁশ সামলানো—এরকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মৌচাকের কাছে পৌঁছোয় তারা। কিন্তু আসল সমস্যা শুরু হয় এখান থেকে।

মৌচাকের যত কাছে তারা পৌঁছোয়, মৌমাছিরা তত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। খড়ের ধোঁয়ায় তারা দিশেহারা হয়ে যায়। প্রত্যেকের ওপর এই তিন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মৌমাছিরা

তাদের বিষাক্ত হুল নিয়ে আক্রমণ চালায়। এই অবস্থায় কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সমুদ্রপৃষ্ঠের হাজার ফুট ওপরে এক হাতে বাঁশ আর দড়ির মই ধরে রাখা অসম্ভব হলেও, কুলুং উপজাতির লোকেরা অবলীলায় কাজটি করে যায়। বাঁশের সঙ্গে লাগানো ছুরির খোঁচায় মধু ভরতি মৌচাক এসে পড়ে নীচে ধরে রাখা ঝুড়ির মধ্যে।

প্রতি খোঁচার সঙ্গে হাজার খানেক মৌমাছি আক্রমণ শুরু করে। তাদের জোড়াতালির পোশাক ঠেকাতে পারে না মৌমাছির আক্রমণ। তাও এই লোকেরা পর্যাপ্ত মধু সংগ্রহ করে তবেই ক্ষান্ত হয়। প্রত্যেকে যখন জীবন নিয়ে পাহাড়ে উঠে আসে, তখন সবাই ক্লান্ত-বিধ্বস্ত। সবার গায়ে কমপক্ষে চার-পাঁচটা মৌমাছির হুল। সকলে এর পর নদীতে গিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে। তবে সব ক্লান্তি-কষ্ট দূর হয়ে যায় এই অমৃত সুধা পান করলে।

এক মরশুমে মাত্র তিনদিনে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ গ্যালন মধু সংগ্রহ করা হয়। এর পর এই মধুকে ছাঁকনিতে দিয়ে মৌচাক আর মৃত মৌমাছির অবশিষ্টাংশ থেকে আলাদা করা হয়। তিন দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে এই মধু নিয়ে যাত্রা শুরু হয় গ্রামের দিকে।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই মধু বহির্বিশ্বে বিক্রি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের গ্রামের একমাত্র পড়াশোনা জানা ব্যক্তি—জাঙ্গি। তিনিই মধু বেচা কেনার সব কাজ করে থাকেন। এই গ্রামের মানুষদের মধ্যে তারই একমাত্র পাকা বাড়ি আছে শহরে। তার আয় কত—তা কেউই জানে না। এই মধু তিনি কত টাকায় বিক্রি করেন, তার খোঁজও কেউ নেয় না। গ্রামের লোকদের শুধু ভোজ্য তেল, ব্যাটারি, নুডুলস আর বিয়ার হলেই চলে!

তবে যা-ই হোক, এই 'পাগলা মধু' নেপালিদের পাগল করে না। যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই মধু সংগ্রহ করে, এই মধু সেবনে সাধারণ মানুষদের মতো তাদের নেশা হয় না। হয়তো বছরের পর বছর পান করার ফলে তাদের ওপর এর প্রভাব কম। তবে তারা যে ঘোরের মধ্যে থাকে, সেটি বোঝাই যায়।

বহির্বিশ্বে এই মধু এলএসডির প্রাকৃতিক রূপের মতো। ভেষজ চিকিৎসায় এর চাহিদা কম নয়। তবে জীবনের ঝুঁকি ও সে তুলনায় আর্থিক নিরাপত্তা না থাকার কারণে কুলুং উপজাতির লোকেরা ধীরে ধীরে এই পেশা ছেড়ে দিতে চাইছে। ফলে মধু আমদানি-রপ্তানিকারকদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত এই প্রাচীন ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখাও দুরূহ হয়ে পড়বে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কুলুং সম্প্রদায়ের মানুষেরা অনেকটাই বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। এক কথায় বলা যায় দেশের অন্যান্য অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে একেবারে আলাদা এদের বসবাস। হোংগু উপত্যকার পাশ থেকে বয়ে চলা হোংগু নদী আর তার আশেপাশের বনজঙ্গল ঘিরে একটি গ্রাম যার নাম সাদির। এই সাদির গ্রামটি জুড়েই তাদের পৃথিবী আবর্তিত। সাদির গ্রামের বাইরে যাওয়ার তাদের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। এই গ্রামের বৃদ্ধরা এখনও নেপাল বলতে শুধুমাত্র কাঠমুন্ডুকেই বোঝে। কাঠমাণ্ডু তাদের গ্রাম থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কাঠমান্ডুর দরবার স্কোয়ারে আলাপ হয়েছিল এক লোকগবেষকের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে জানতে চেয়েছিলাম পাগলা মধু নিয়ে। তা কথায় কথায় তিনি জানিয়েছিলেন, "কুলুং সম্প্রদায়ের মানুষরাই হিমালয় থেকে পাগলা মধু সংগ্রহের কাজ করেন। হিমালয়ের হোংগু উপত্যকার কয়েকশো ফুট উপরে পাগলা মধুর মৌচাক অবস্থিত। কুলুং সম্প্রদায়ের একজন মৌয়াল মাউলি ধান। মাউলির বাবাও ছিল একজন মৌয়াল। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বাবার হাতে মাউলির মধু সংগ্রহের হাতেখড়ি হয়।

বাঁশ আর দড়ির তৈরি ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে কয়েকশো ফুট উঁচুতে উঠে মধু সংগ্রহের কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল ছোটো মাউলির কাছে। মৌচাকটি পাথরের ওপর থেকে খুলে নেবার সময় মৌমাছি তার হাতে, পায়ে, মুখে সর্বত্র হুল ফুটাতে শুরু করলে ব্যথায় কাতর হয়ে যেত সে। তবু শক্ত করে দড়ি ধরে রাখতে হত দীর্ঘক্ষণ। মৌচাকটি সম্পূর্ণ আলাদা না করে নামতে পারত না সে।

কুলুং সম্প্রদায়ের সবাই মধু সংগ্রহের কাজটি বহু আগে ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় পনেরো

বছর তো হয়েছে তাদের এই পেশা ছেড়ে দেয়ার। তাই এর পর মাউলিকে একাই এই কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে।

কাজটি মাউলির জন্য কখনোই শখের বা নেশার ছিল না। সে এই কাজের ইতি টানতে চেয়েছে বহুবার। কিন্তু পারেনি। খাদ্যশস্য এবং শাকসবজিতে সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ থাকলেও তেল, লবণ, পোশাকসহ আরও কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে তার অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই আর কেউ কাজটি না করলেও মধু সংগ্রহের এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি তাকে করতেই হত। তিনি তার সম্প্রদায়ের শেষ ব্যক্তি যে এই মধু সংগ্রহের কাজ একাই দীর্ঘদিন করেছে।

মাউলির পরিবার বেশ বড়ো। তার তিনজন স্ত্রী ছিল। ছয়জন সন্তান রেখে তারা মৃত্যুবরণ করে। সন্তানদের মাউলিই পালন করেছে। তার দুই কন্যা বিধবা হবার পর তারাও তার সঙ্গে থাকতে শুরু করে। ফলে তার কাঁধে তার পাঁচজন নাতি-নাতনির দায়িত্বও ছিল। এভাবেই জীবনের ৪২ বছর কাটিয়েছেন মাউলি।

মাউলি ধানের বয়স এখন ৫৭ বছর। গত বছর জুলাই মাসেই নিজের কাজের সমাপ্তি টেনেছে এই মৌয়াল। কুলুং সম্প্রদায়ের শেষ ব্যক্তি হিসেবে মধু সংগ্রহ পেশার এবং রীতির ইতি টানে সে।

হয়তো মাউলির এই ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কখনোই জানতে পারতাম না। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির একটি টিম মাউলির অবসরের পুরো ঘটনাটি এবং তার অবসরের পূর্বের শেষ মধু সংগ্রহের ভিডিয়ো চিত্র ধারণ করে। যার ফলে ইতিহাসের একটি গোষ্ঠীর রীতির সমাপ্তির দলিল থেকে যাবে চিরকাল।

ভিডিয়োটিতে মৌয়াল মাউলির কর্মজীবনের ক্রান্তিলগ্নের কিছু মুহূর্তেরও অংশ রয়েছে। মাউলি বলে, ‘আমার সন্তানেরা স্কুলে পড়ালেখা করছে, তাদের আর এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে হবে না।’

মাউলি তার এই কাজ করতে করতে এখন ক্লান্ত। মৌয়াল পেশাটি ছেড়ে দিয়ে এখন বাকিটা জীবন সে নির্বিঘ্নে কাটাতে চায়।

মাউলি একটা ইন্টারভিউয়ে তার শেষ মধু সংগ্রহের বর্ণনা দিয়েছে বেশ প্রাণবন্তভাবে। তার সেই মধু সংগ্রহ ক্যামেরাবন্দি করে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেল। জুলাই মাসে মাউলি ধান তার সহযোগী আসধন কুলুংকে সঙ্গে নিয়ে শেষবারের মতো হোংগু উপত্যকায় চড়েছিল। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কর্মকর্তাদের বিস্ময় বাড়িয়ে দিয়ে কোনোরকম নিরাপত্তা দড়ি ছাড়াই উপত্যকার ওপর থেকে ঝুলানো বাঁশ এবং দড়ির তৈরি ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে আড়াইশো ফুট ওপরে উঠে যায় সে।

তার কাঁধে ঝোলানো ছিল একটি বড়ো বাঁশ তার সঙ্গে দড়িতে বাঁধা একটি ঝুড়ি এবং ধোঁয়া জ্বালানোর কিছু সরঞ্জাম। মৌচাক থেকে ১০ ফুট দূরত্বে থেকে বাঁশের আগায় ধোঁয়া জ্বালিয়ে সেটি মৌচাকের কাছে নেয়। ধোঁয়ার তীব্রতায় অল্পক্ষণের মধ্যেই মৌচাক থেকে মৌমাছিগুলি বেরিয়ে আসতে শুরু করে এবং মাউলির শরীরে হুল ফুটায়। অবাক করা বিষয়টি হল প্রতি মুহূর্তে এত এত হিমালয়ান মৌমাছির কামড় খাওয়া সত্ত্বেও মাউলি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। তার চেহারায় ব্যথার কোন ছাপ ছিল না। সে আপন সুরে গুণগুণ করে একটি মন্ত্র জপতে থাকে।

কুলুংদের বিশ্বাস মন্ত্রটি ক্রোধান্বিত মৌমাছিদের শান্ত করে। মন্ত্র জপতে জপতে পরিপূর্ণ মৌচাকটি কাঁধে ঝুলে থাকা ঝুড়িতে ভরে নেয় মাউলি। এই পুরো প্রক্রিয়াতে মাউলির দু’ই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ঝুলে থেকে বিষাক্ত সব মৌমাছির কামড় খেয়ে মধু সংগ্রহের কাজ করার এই অফুরন্ত শক্তি মাউলি কোথায় পায় সে কথা একমাত্র সে-ই জানে।

এই পেশাটিকে বাঁচিয়ে রাখা নিয়ে মাউলির কোনো খেদ নেই। বরং কুলুং সম্প্রদায়ের শেষ মৌয়াল হিসেবে দীর্ঘদিন পেশাটিকে বাঁচিয়ে রাখা নিয়ে সে গর্বিত। সে এটা ভেবেও গর্বিত যে, সে-ই তার সম্প্রদায়ের পাহাড়ে চড়া সর্বশেষ মৌয়াল।

সে এটা ভেবে শিহরিত হয় যে, তার ভিডিয়ো চিত্রটি দেখার পর পৃথিবীর মানুষ জানতে

পারবে যে নেপালের প্রত্যন্ত এক ছোটো গ্রামে এরকম একটি পেশা ছিল। মৌচাকের মৌমাছিগুলি যদি বুঝতে পেরে থাকে যে মাউলি আর তাদের বাসা ভাঙতে আসবে না তাহলে হয়তো তারাও অনেক খুশি হবে।

দরবার স্কোয়ারে সূর্য অস্তাচলে। নেপালি ভদ্রলোক মাউলির গল্প বলে একটু নিশ্চুপভাবে বসে রইলেন তারপর বললেন, “মাউলি আমার ভাই!”

সিক্রেট পরমাণু মিশন 'নন্দাদেবী'

১৯৬৪-এর ১৬ অক্টোবর। পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার চেয়ারম্যান মাও সে তুং খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন। কিন্তু নিজের স্বভাব মতোই গম্ভীর হয়ে তার সামনের বড়ো টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে আছেন। সব ঠিকঠাক থাকলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চায়না বিশ্বের শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আর তাতে ঘুম ছুটে যাবে আমেরিকার মত কিছু শক্তিধর দেশের। কিছুক্ষণের মধ্যে টিভির ঘড়িতে শুরু হল উলটো কাউন্ট ডাউন। দশ... নয়... আট...

দুম....

তাকলামাকান ও কুমতাগ মরুভূমির মাঝে দুরূহ প্রাকৃতিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা 'নপ নর' নিউক্লিয়ার টেস্ট বেস ক্যাম্পে সফলভাবে বিস্ফোরিত হল চায়নার প্রথম পারমাণবিক বোমা। চায়না পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় সবচেয়ে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল আমেরিকা। কোড-৫৯৬ নামে পরিচিত চায়নার এই পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পর্কে আগাম কোন গোয়েন্দা তথ্য জানতে না পারায় সকলের মাথায় চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেল। গোপন তথ্য পাওয়ার মতো স্যাটেলাইট সিস্টেম তখনও ততটা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। আমেরিকার সরকার উচ্চ মহল থেকে যে-কোনো উপায়ে চায়নার গুপ্ত পারমাণবিক কার্যক্রমের ওপর খবরদারি করার একটি কার্যকরী স্পাই নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য সিআইএ-কে কঠরভাবে নির্দেশ দিল।

১৯৬৪ সালের এই ঘটনার ঠিক একবছর আগে ১৯৬৩ সাল নাগাদ আমেরিকা এভারেস্ট অভিযানে একটি দল পাঠিয়েছিল। ১৯৬৪ সালে প্রথমবারের মত এভারেস্ট আরোহণ করা সেই দলের সদস্য বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার ও পর্বতারোহী ব্যারি বিশপ হিমালয় অভিযান সেরে দেশে ফিরেছে। ইউ এস এয়ারফোর্সের চিফ অফ স্টাফ কার্টিস লিমে হিমালয়ের গল্প শোনার জন্য নিজের কোয়ার্টারে ডেকে পাঠায় ব্যারিকে। ব্যারি হিমালয়ের সৌন্দর্য আর বিস্ময়কর নানা অভিজ্ঞতার কথা বলা শুরু করল। সেখানকার মানুষ, তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা, হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়া থেকে পশ্চিম তিব্বতের বিস্তীর্ণ মালভূমিকে যে কতটা অদ্ভুত আর সুন্দর দেখায় এসবই একমনে বলে যাচ্ছিল ব্যারি। লিমে গল্প শুনতে শুনতে ফোন লাগাল কোনো এক আধিকারিককে। তার মাথায় এমন কিছু একটা বিষয় তখন খেলে গেছে, যা ব্যারি জানে না।

এর ঠিক একবছর পরের ঘটনা, ১৯৬৫ সালে ইন্ডিয়ান নেভির অফিসার মনমোহন সিং কোহলি আর কিছুদিন পরেই ৯ জনের একটি দলকে নিয়ে এভারেস্ট অভিযানে যাবে। এর আগে দুবার চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। ভারতীয় অভিযাত্রীদের তাই খুব মন খারাপ। আগের দুটি অভিযানেও কোহলি ছিল। কিন্তু দলনেতার গুরুদায়িত্ব নিয়ে এবারেই প্রথম সে অভিযানে যাচ্ছে। আমেরিকা থেকে ব্যারি পৌঁছে যায় কোহলির কাছে। সে কোহলিকে সিকিমের জেমু গ্লেসিয়ারে নিয়ে যেতে চায়। ব্যারির এই আবদার শুনে একপ্রকার অবাক হল কোহলি। কারণ ব্যারি জানে যে কোহলি এভারেস্ট এক্সপেডিশনে যাচ্ছে এবং তা দেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কোহলি আঁচ করতে পারে কিছু একটা মাস্টারপ্ল্যানের ছক কষা হচ্ছে।

যথারীতি কোহলির নেতৃত্বে এভারেস্ট অভিযান হল। কোহলির নেতৃত্বে টিম সফল হল। চতুর্থতম দেশ হিসেবে ভারতের নাম উঠল এভারেস্ট শিখরে। অ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার বা 'আর্ক'-এর ফার্স্ট ডিরেক্টর রামেশ্বর নাথ ডেকে পাঠালেন কোহলিকে। আর বললেন, "এখন উল্লাস করার মতো সময় নেই তোমার। তোমার জন্য নতুন একটা মিশন অপেক্ষা করছে! আর এবারের মিশনটি অত্যন্ত গোপনীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

হেড কোয়ার্টারে দীর্ঘক্ষণ মিটিং চলল কোহলির সঙ্গে রামেশ্বরের। রামেশ্বর জানাল, "সি আই এ এবং ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো একসঙ্গে একটি মিশন হাতে নিয়েছে এবং মিশনটির দলনেতা বানানো হয়েছে কোহলিকে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ চিনের পারমাণবিক

দুরভিসন্ধির ওপর নজরদারি করার জন্যে একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা করছে আমেরিকা। কোহলি এবং তার পর্বতারোহী টিমকে সেই যন্ত্রটি নিয়ে যেতে হবে।”

এবার একটু বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দেওয়া যাক। ভিয়েতনামের যুদ্ধের লজ্জাজনক পরিস্থিতির পর চিনের উত্থানে আমেরিকান গোয়েন্দাদের তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। ততদিনে চিনও নিজের শক্তি জাহির করতে শুরু করেছে।

১৯৬৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় চিনও পারমাণবিক বোমার নাগাল পেয়ে যায়। এতে সবচেয়ে আতঙ্কিত হয় ভারত। যে সময়ে চিনের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আসে, তার ঠিক দুবছর আগে ঘটে গেছে ভারত-চিন যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষত তখনও সেরে ওঠেনি ভারতের। ভারতের সীমান্ত-ঘেঁষা চিনের পারমাণবিক পরীক্ষা ভারতের জন্য যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ ছিল।

অন্যদিকে চিনের উত্থান আমেরিকার জন্য ছিল বেশ চাপের। যে সময় চিন পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছে, তখন পুঁজিবাদের অভিভাবক হিসেবে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত রাশিয়া। সোভিয়েত রাশিয়ার হাত ধরে চিনের উত্থানকে আমেরিকা ভালো ভাবে নিতে পারছিল না।

ষাটের দশকের শুরুতেই আমেরিকা বিভিন্ন গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে জানতে পারে, চিন সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় পারমাণবিক বোমা বানানোর ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। সিআইএ-র একটি তার বার্তায় জানা যায়, ১৯৫৯ সালের অক্টোবরেই চিন লোপনরে নিউক্লিয়ার টেস্ট বেস স্থাপন করে। উদ্দেশ্য নিউক্লিয়ার ডিভাইসের পরীক্ষা চালানো। নজরদারি চালানোর জন্য চিনের ওপর দিয়ে ইউ-টু বিমানের ফ্লাইট বেশ বিপজ্জনক। তাই আমেরিকা চিন্তা করে, যদি হিমালয় পর্বতমালার কোনো একটার ওপর নজরদারি চালানোর জন্য কোনো যন্ত্র স্থাপন করা যায়, তাহলে অনেক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

রাজনীতি ও ঐতিহাসিক শত্রুতার কারণে আমেরিকা ও ভারত দুই দেশের কাছেই চিনের এই পারমাণবিক পরীক্ষা নজরদারির মধ্যে আনার তাড়া ছিল। এ লক্ষ্যে দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা যৌথভাবে কাজ করতে সম্মত হল। অনেক চিন্তাভাবনা, তর্ক-বিতর্কের পর সেই সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন সিআইএ-কে গোপন মিশন চালানোর অনুমতি দিলেন। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থের দিকটি বড়ো করে দেখা হল।

চিনের ওপর নজরদারির আর একটি উপায় ছিল তা হল স্যাটেলাইট। এরকম যন্ত্র দিয়ে অনেক ওপর থেকে নজরদারিতে আমেরিকা বেশ দক্ষ। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের সে সময়ে আমেরিকার প্রায় সব উন্নত স্যাটেলাইটই সোভিয়েত রাশিয়ার উপর মোতায়েন করা ছিল। যেসব স্যাটেলাইট বাকি ছিল আমেরিকার হাতে, সেসব দিয়ে আদতে চিনের ওপর পূর্ণ নজরদারি চালানো সম্ভব ছিল না আমেরিকার পক্ষে। তাই নজরদারি চালানোর মতো যন্ত্র পর্বতে স্থাপন করার পক্ষেই ছিল আমেরিকা।

অনেক তর্ক-বিতর্ক শেষে নন্দদেবী পর্বতের চূড়াকে নির্ধারণ করা হল। সেই পর্বত, যেখান থেকে বিখ্যাত গঙ্গা নদীর উৎপত্তি ঘটেছে। স্থানীয়দের কাছে এই পাহাড় খুবই পবিত্র স্থান হিসেবে পরিগণিত। এই স্থানটির ভৌগোলিক গুরুত্বও অনেক। নন্দাদেবী পাহাড়ের উত্তরে চিন, দক্ষিণে ভারত এবং পশ্চিমে পাকিস্তান। এখান থেকে চিনের পারমাণবিক মিসাইল পরীক্ষার ঘাঁটিও খুব বেশি দূরে নয়। এখান থেকে নজরদারি চালানোতে বেশি বেগ পেতে হবে না। চিনা গোয়েন্দারা এত দুর্গম অঞ্চল থেকে তাদের ওপর কেউ নজরদারি চালাতে পারে-এটি মাথায়ও আনবে না। তাই সবদিক বিবেচনা করে নন্দাদেবী ছিল নজরদারি চালানোর এবং ডিভাইস স্থাপনের একেবারে আদর্শ জায়গা।

পরিবেশগত অবশ্য কিছু সমস্যা ছিল। এই পর্বত ভারতের সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলোর মধ্যে একটি। তার সঙ্গে তাপমাত্রাও খুবই কম। আর তুষার-ঝড়ের ভয় তো আছেই। চূড়ায় ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য।

ভারতের তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং আমেরিকার গোয়েন্দা

সংস্থা সিআইএ-কে দায়িত্ব দিয়েছিল মিশন বাস্তবায়নের জন্য। ভারতের চার জন ও আমেরিকার নয় জন, মোট তেরোজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পর্বতারোহী নিয়ে নজরদারির ডিভাইস স্থাপনের জন্য টিম গঠন করা হল। অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল ভারতের ক্যাপটেন মনমোহন সিং কোহলিকে। ক্যাপটেন এমএস কোহলিকে বাদ দিয়ে বাকি সদস্যদের পরিচয় কঠোরভাবে গোপন রাখা হল।

দুই দেশের সদস্যদের নিয়ে গড়া এই টিমকে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হল আমেরিকার আলাস্কার। সিআইএ-র বিশেষ চার্টার্ড বিমানে তাদের বিশ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতার ম্যাককিনলি পাহাড়ে শুরু হল ট্রেনিং। 'গা গরম' করার পর তাদেরকে চূড়ান্ত মিশনের জন্য প্রস্তুত করা হল।

নন্দদেবীতে আরোহণ করা মোটেও সহজ নয় তা দু-দেশের সেনা আধিকারিকরা জানতেন। চিন সীমান্তের ৭৮১৬ মিটারের এই পর্বতটি মানুষের ধৈর্যের ও কষ্টের চরমতম পরীক্ষা নিতে পারে। এর চূড়ায় ওঠা তো অনেক পরের ব্যাপার। পর্বতটির পাদদেশে পৌঁছোনোর জন্যও কঠিন অধ্যবসায় প্রয়োজন। নন্দাদেবী পর্বতচূড়াটিকে চারপাশ থেকে আরও বেশ কিছু দুরূহ পর্বত দুর্গের মতো ঘিরে রয়েছে। যা এই পর্বতটির পাদদেশে পৌঁছোনো আরও বেশি কঠিন করে দেয়। নন্দাদেবীর কাছে পৌঁছোনোর একমাত্র সম্ভাব্য পথ হল ঋষিগঙ্গা গিরিসংকট, যার পথ লতা নামের এক গ্রাম থেকে শুরু হয়। পৃথিবীর অন্যতম খাড়া পর্বতগুলোর মধ্যে একটি হওয়ায় এখানে অত্যন্ত অভিজ্ঞ পর্বতারোহীদেরও চূড়ায় আরোহণে ব্যর্থতার উদাহরণ আছে প্রচুর। নন্দাদেবী পর্বতটিকে স্থানীয়রা দেবী হিসেবে পুজো করে। বেশ কয়েকটি মন্দিরও রয়েছে পর্বতটিকে উৎসর্গ করে। ধর্মীয় মতে, এই পর্বতে আরোহণ করা পর্বতটিকে অপবিত্র করার নামান্তর। এমন একটি অভিযানে যাবার মতো পর্যাপ্ত কুলি কিংবা শেরপা পাওয়া যাবে কিনা এমন অজস্র বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে দু-দেশের মধ্যে।

নজরদারি চালানোর যে ডিভাইসটি বানানো হয়, সেটির মোট ওজন ছিল ৫৬ কেজি। ৮-১০ ফুট উচ্চতার একটি অ্যান্টেনাও ছিল তার সঙ্গে। আর ছিল দুটি ট্রান্সিভার সেট।

পুরো ডিভাইসটি আসলে ছিল একটি সেন্সর, যেগুলি পারমাণবিক মিসাইল পরীক্ষার পর ভেসে আসা ওয়েভগুলি ধরতে পারবে। আর সেন্সরটিতে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহের জন্য নিউক্লিয়ার জেনারেটর বা SNAP তৈরি করে রাখা হয়েছিল। জেনারেটরে প্লুটোনিয়াম-২৩৮-এর নিউক্লিয়ার ক্যাপসুল ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে উদ্ভূত 'রেডিয়ো টেলিমেট্রি সিগন্যাল' ধরার সক্ষমতা ছিল ডিভাইসটির। আমেরিকার ও ভারতের এই যৌথ অপারেশন ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৬৫ সালের ১৮ অক্টোবর মিশন শুরু হল।

সিআইএ'র বিশেষ বিমানে আমেরিকান দলটি ভারতে এসে পৌঁছোল। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার খাতিরে স্বাভাবিকভাবেই দলের প্রতিটি সদস্যের নাম-পরিচয়, পেশা এমনকি বসবাসের ঠিকানাও ভিন্ন ছিল। তাদের কেউই ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের আসল নাম বা পরিচয় প্রকাশ করেনি।

বর্ষা শেষ হয়ে এলে কোহলির নেতৃত্বে সবাই নন্দাদেবীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। রাশিয়ার তৈরি একটি হেলিকপ্টারে করে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও অভিযানের সকল সদস্য ভারতের উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার গৌচারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি এয়ারফিল্ডে ল্যান্ড করল। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করেই তাদের নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারির মধ্যে নামিয়ে দেয়া হল। শুরু হল মিশন নন্দাদেবী।

সবাই নিরাপদেই নন্দাদেবীর পাদদেশে পৌঁছে গেল। বেস ক্যাম্প সেট করে কোহলী সিদ্ধান্ত নিল আরও ওপরে উঠার। শুরু হল দীর্ঘ বিপদসংকুল এক অভিযান। উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য সবাইকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পর পর থামতে নির্দেশ দিলেন কোহলি। যার জেরে অনেকটাই সময় চলে যাচ্ছিল। আবার সে বছরের ক্লাইম্বিং সিজন শেষ হতেও খুব

বেশিদিন ছিল না।

কষ্টকর এই অভিযানে সবাই যার যার রসদ সে নিজেই বহন করছিল। মিশনের ব্যাপারে যত কম মানুষ জানবে ততই ভালো এটাই ছিল ওপর মহলের নির্দেশ। সে-কারণে তেমন কোনো শেরপা বা পোর্টার রাখেনি তারা। কেবল যে সেন্সরটি স্থাপন করার জন্য এই কষ্টকর অভিযান, সেটির জেনারেটরটি বহন করার জন্য কিছু শেরপাকে নেওয়া হয়েছিল।

জেনারেটরটি ছিল নিউক্লিয়ার পাওয়ারড। ফুয়েল হিসেবে তাতে ছিল রেডিয়ো অ্যাকটিভ প্লুটোনিয়াম রড। একবার বসানো হলে জেনারেটরটি টানা দুবছর ধরে চল্লিশ ওয়াটের সমতুল্য পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে যাবে। এর অফিসিয়ালি নাম ছিল-SNAP 19C, System for Nuclear Auxiliary Power

রেডিয়ো অ্যাকটিভ প্লুটোনিয়াম তার নিজস্ব ধর্ম বজায় রেখে অবিরাম তাপ নির্গত করতে থাকে এবং যারা এটি বহন করত তারা একপ্রকার স্বস্তি নিয়েই কাজটি করত এটা থেকে নির্গত তাপের কারণে। কিন্তু সহজ সরল শেরপারা জানত না তারা যেটা পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা জিনিস হিরোশিমাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

শেরপারা না জানলেও এই পরিকল্পনা যাদের মাথা থেকে বের হয়েছিল তারা সবই জানত। যে কারণে তারা অভিযাত্রী দলের সবাইকে সাদা রঙের একটুকরো কাপড়ের মতো গাইগার ফেব্রিক দিয়েছিল, যা সবাই নিজ নিজ জামায় লাগিয়ে রাখত। এটি ছিল একধরনের নির্দেশক। কোনো প্রকার রেডিয়েশন লিক করলে সঙ্গে সঙ্গে টুকরোটি রং পরিবর্তন করে ফেলবে। যদিও কোহলির কড়া আদেশ ছিল কেউ যেন জেনারেটরটি টানা চার ঘণ্টার উপর একনাগাড়ে বহন না করে।

দীর্ঘ কষ্টকর ও মৃত্যুসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে কোহলি ও তার দল ১৮ অক্টোবর নন্দাদেবীর চব্বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় তাদের ক্যাম্প ফোর স্থাপন করে। আর এক-দেড় হাজার ফুট উঠলেই অর্ধেক কাজ তাদের শেষ হয়ে যাবে। তারপর শুধু সেন্সরটি জায়গা মতো বসিয়ে আরও একটি সফল অভিযান শেষ করে তারা সকলে বাড়ির পথ ধরবে। দীর্ঘদিন পর অবশেষে হয়তো মিলবে কাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম।

কিন্তু তাদের নিয়ে প্রকৃতির বোধহয় ভিন্ন ইচ্ছা ছিল। এতদিনের সুন্দর ঝকঝকে আবহাওয়া যেন চোখের পলকে কোনো এক অদৃশ্য ইশারায় মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। মেঘমুক্ত ঝকঝকে নীল আকাশ নিমেষেই ঢেকে গেল ভয়ংকর কালো মেঘে। সেইসঙ্গে শুরু হল প্রবল তুষারঝড়।

কোহলি ও তার দল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চব্বিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে। এই উচ্চতায় সামান্য ঝুঁকিও মৃত্যু ডেকে আনবে যে-কোনো সময়। দলনেতা হিসেবে কোহলি যাই করুক তা তাকে অনেক ভেবে চিন্তে করতে হবে। তার সামনে তখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় সবার ও নিজের জীবনের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যাওয়া, নয়তো প্রাণ বাঁচাতে নীচে নামতে শুরু করা। এই উচ্চতায় আবহাওয়ার মতিগতি সম্পর্কে কেউ কখনোই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না। এরকম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে সামিট দেওয়া আর নিজ হাতে নিজের কবর খোঁড়া একই কথা। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তার টিম সামিট করে সেন্সরটি স্থাপন করতে পারবে, তাও এই পরিস্থিতিতে তাদের নীচে নিরাপদে ফেরাটা বেশ চাপের। আর তার ফলাফল নিশ্চিত মৃত্যু।

অনেক চিন্তা করে কোহলি এই অভিযান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার কাছে অভিযানের থেকে মানুষের জীবনের মূল্য বেশি। সবদিক বিবেচনা করে কোহলি জেনারেটর এবং বাকি যন্ত্রপাতি সব কিছু ক্যাম্প ফোরেই রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক বোমাটিকে ঘাড়ে করে শুধু শুধু টেনে নীচে নামানোর কোনো অর্থ নেই তা কোহলি বুঝলেন। কোহলি তার দলকে জানালেন, সামনের সিজনে আবার তারা এসে সব ঠিক করবে আর যন্ত্রটি স্থাপন করবে নন্দাদেবীর চূড়ায়।

পর্বতারোহী টিমের পুরো পরিকল্পনা ধাক্কা খেল প্রকৃতির এহেন নির্মম আচরণে।

আমেরিকা ও ভারত এতবড়ো প্রজেক্ট অসফল হওয়ায় বেশ হতাশ হল।

কোহলি ফিরে এসে আধিকারিকদের জানালেন, প্রতিটি মুহূর্তেই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমে আসছিল। পর্বতারোহী টিমের ক্যাপটেন হিসেবে আমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল—হয় পুরো টিমের এখানে অবস্থান করা। নাহলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। নতুবা ফিরে যেতে হবে বেস ক্যাম্পে। আমি পুরো টিমকে নিয়ে বেস-ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

ফিরে আসার সময় নিউক্লিয়ার জেনারেটর ও সেন্সর-সমেত পুরো ডিভাইসটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখে কোহলির দল। তাদের প্রত্যাশা ছিল ঝড়ো আবহাওয়া শেষ হওয়ার পর পুনরায় আরোহণের পর সেন্সর ও স্ন্যাপ জেনারেটর খুঁজে কাজ শুরু করবেন।

১৯৬৬ সালের বসন্তে আবার মিশন শুরু করা হয়। পরের বছর নন্দাদেবীর অসম্পূর্ণ মিশনের ভার আবারও এসে পড়ে কোহলির ওপর। গতবারের সদস্যদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে কোহলি ছোটো একটি টিম গঠন করলেন। তবে এবার টিমে নতুন সদস্য বলতে কেবল একজন আমেরিকান নিউক্লিয়ার এক্সপার্ট। গতবছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ভারত ও আমেরিকা এটা বেশ ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিল যে নন্দাদেবী ক্লাইম্ব করা শুধু যে কঠিন তা নয়, এটি খুব বেশি বিপজ্জনক। তারা এটাও বুঝতে পেরেছিল যে সেন্সরটি তারা অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার কোনো পর্বত চূড়ায় বসিয়েও তাদের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে। কোহলির এবারের মিশনটি ছিল তাই সেন্সর ও জেনারেটরটি নন্দাদেবীর ওপরে ক্যাম্প ফোর থেকে নামিয়ে এনে পাশের আর একটি অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার পর্বত নন্দা কোর্ট চূড়ায় স্থাপন করা।

বেস ক্যাম্প পর্যন্ত নতুন মিশনটি কোহলি ও তার টিমের জন্য তেমন কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু কোহলির পুরো দুনিয়া বদলে গেল ক্যাম্প ফোর-এ পৌঁছোনোর পর ক্যাম্প ফোর-এ পৌঁছে কোহলি হতভম্ব হয়ে দেখল ডিভাইসগুলো যেখানে তারা যত্ন করে নিরাপদে রেখে গিয়েছিল, সেখানে সেগুলি নেই। আশপাশের সমস্ত এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও কিছুই পাওয়া গেল না। এত বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতিগুলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এই নিয়ে কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। এই খবরটি যদি মিডিয়ায় চলে যায় তাহলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তাই ওপর মহল থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। এই অভিযানের প্রতিটি সদস্য প্রচণ্ড রকম মানসিক চাপে ভুগতে লাগল। অজানা এক আশঙ্কায় প্রত্যেকে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

কোহলির টিম কোনোভাবেই সেই সেন্সর ও নিউক্লিয়ার জেনারেটর খুঁজে পাচ্ছিল না। বরফের স্তরের নীচে কোথায় সেই সেন্সর ও জেনারেটর আছে, যাকে শত চেষ্টার পরও পাওয়া যায়নি। সেই তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম-২৩৮ সমৃদ্ধ জেনারেটর ও সেন্সর খোঁজার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যায়নি।

১৯৬৭ সালে আর একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সেন্সর ডিভাইস ভারতে নিয়ে যায় নন্দাদেবীর পাশের চূড়া নন্দা কোটে বসানোর জন্য। কোহলি এবং আরও কিছু ভারতীয় পর্বতারোহীর সহায়তায় তারা এবার সফলভাবেই তাদের ডিভাইসটি বসিয়ে আসে মাউন্ট নন্দা কোটের চূড়ায়। কিন্তু তারা এই নজরদারি বেশিদিন বজায় রাখতে পারেনি। বিভিন্ন কারণে এক বছর পরেই ১৯৬৮ সালে আমেরিকা আবারও ভারতের সহায়তায় ডিভাইসটি ফিরিয়ে আনতে যায়। ভারতীয় পর্বতারোহী এইচ.সি.এস. রাওয়াতের নেতৃত্বে টিমটি নন্দা কোটের চূড়ায় পৌঁছে এমন এক দৃশ্য দেখতে পায়, যা দেখার জন্যে দলের সদস্যদের কেউ প্রস্তুত ছিল না।

যেখানে তারা যন্ত্রটি স্থাপন করে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে সবাই দেখল যন্ত্রটির কিছুই সেখানে নেই। এ যেন '৬৬ সালের অভিযান নতুন করে ফিরে আসল। তবে ওপর থেকে দেখে রাওয়াতের মনে হচ্ছিল ডিভাইসটা হয়তো বরফের নীচে চলে গিয়েছে। কয়েক ফিট

বরফ খুঁড়তেই এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দেখা পেল সবাই। দেখে মনে হচ্ছিল নন্দা কোটের গম্বুজ আকৃতির চূড়ায় জমে থাকা বরফের মধ্যে কেউ যেন নিখুঁত পরিমাপে গোল একটি গুহা-সদৃশ তৈরি করে রেখেছে। আর সেই বৃত্তাকার গুহার কেন্দ্রে যেন সম্রাটের মত বসে রয়েছে উত্তপ্ত জেনারেটরটি। জেনারেটর থেকে অবিরাম নির্গত হওয়া তাপের কারণে চারিদিকের ৮ ফিট বরফ গলে নিঁখুত একটি গোলকের আকৃতি নিয়েছে। তারা গুহাটির সুন্দর একটি নাম দিয়ে দিল-'ক্যাথেড্রাল ইন দ্য আইস'।

১৯৬৮ সালে আমেরিকা এই ত্রুটিপূর্ণ ডিভাইসটি নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং হারিয়ে যাওয়া ডিভাইসটি পরিবেশের ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভারত ৮ম ইন্দো-তিব্বতিয়ান বর্ডার পুলিশ ব্যাটালিয়নকে তপোবনে নিয়োজিত করে।

এই তপোবন বেশ অদ্ভুত জায়গা। ঋষিগঙ্গা তীরবর্তী এই স্থানে ছিল কোহলির ব্যাটালিয়ন। যা পরবর্তীকালে নন্দাদেবী ব্যাটালিয়ন নামে পরিচিত হয়। তারা নিয়মিত তেজস্ক্রিয়তা খুঁজে পাওয়ার জন্য ঋষি-গঙ্গার জল নিয়ে পরীক্ষা করত। তখন থেকেই মূলত নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারিতে সকল প্রকার পর্বতাভিযান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সেদিন থেকে আজ অবধি অনেক দিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু আজও কেউ জানে না সেই জেনারেটরটির কী হয়েছিল! কোথায় হারিয়ে গেল সেই জেনারেটরটি। অনেক অভিযান হয় পরে হারানো জেনারেটরটি খুঁজে পেতে। অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয় নন্দাদেবীতে। খোঁজা হয়েছে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন। কিন্তু আশানুরূপ কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

এবার একটু ভাবুন, নন্দাদেবী অভিযানে হারিয়ে যাওয়া সেই আড়িপাতা যন্ত্রগুলোর কী হল? আজও সেই তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম রডগুলোকে নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে নন্দাদেবী। হয়তো কোনোদিন হিমবাহ থেকে বেড়িয়ে এসে গঙ্গায় ভেসে উঠবে তেজস্ক্রিয় যন্ত্রটি। আবার হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। চায়না বা পাকিস্তানের কমান্ডোরা এসে চুরি করে নেয়নি তো যন্ত্রটি! প্লুটোপিয়াম ক্যাপসুলটি কোথায় আছে এখন? মাত্র ৫০ বছর হয়েছে। আরও ৮৫০ বছর ধরে এই ক্যাপসুল থেকে তেজস্ক্রিয়তা বের হতে থাকবে। আমাদের বোকামির ফলে পুরো হিমালয় দূষিত হয়ে যায়নি তো?

রহস্যে ঘেরা আলেকজান্ডারের বংশধরদের গ্রামে

পাহাড়-পর্বতে বেষ্টিত ভারতের হিমাচল প্রদেশ। সেই প্রদেশের একটি দুর্গম গ্রামের নাম মালানা। নানা কারণে এই গ্রামটি বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত, তবে রহস্যময়। প্রাচীন ভারতের অন্যতম গ্রাম। বলা হয়ে থাকে মালানা বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম। অন্তত মালানার অধিবাসীরা তা-ই মনে করেন। গ্রামটিকে অনেকে 'মালানা নালা' নামেও চিনে থাকেন।

এই গ্রামে প্রবেশের সবচেয়ে সহজ রাস্তাটি হল জারি নামক স্থান থেকে ট্যাক্সি করে যাওয়া। তবে আপনি চাইলেই এই গ্রামে প্রবেশ করতে পারবেন না। এই গ্রামে প্রবেশের আগে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষকে আপনার আগমনের কারণ জানাতে হবে এবং আপনার বায়োডেটা জমা দিতে হবে। আপনার আগমনের কারণে তারা সন্তুষ্ট না হলে আপনাকে মালানা গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আপনি পারমিশন পাবেন না ওই গ্রামে প্রবেশ করার। তাই মালানায় যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনাকে কারণ ঠিক করেই যেতে হবে। আর হ্যাঁ, আপনি সাংবাদিক হলে একটা এক্সটা অ্যাডভান্টেজ পাবেন। তাও সঠিক কারণ দেখাতে হবে আপনাকে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কুল্লু ভ্যালির পার্শ্ববর্তী 'পার্বতী' উপত্যকায় মালানা গ্রামের অবস্থান, যা আজও পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এক স্থান। নেই কোনো ভালো পথ। পাহাড়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে আপনাকে পৌঁছোতে হবে সেখানে। তার ওপরে আবার গ্রামটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,৬৫২ মিটার উঁচুতে।

হাজারো প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে সারা বিশ্ব থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে ভিড় জমায়। তারা কারা? শুধুই পর্যটক? নাকি আমাদের মতো অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষজন? নাকি নতুন স্টোরির খোঁজে সাংবাদিক কিংবা নতুন লেখার প্লটের খোঁজে লেখক?

আপনি শুনলে অবাক হবেন এইসব মানুষজন ছাড়াও এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ ভিড় জমান মালানাতে। যারা গাঁজার নেশা করেন তারা। আসছে গল্পে।

কুল্লু ভ্যালিতে মোট তিনটি পাহাড় রয়েছে। সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে মালানা নদী। আর সেই নদীর তীরেই সবুজ, পাহাড়ি এই গ্রাম। রহস্যময় এই গ্রামের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কোনো মিল নেই। এমনকি তাদের ব্যবহৃত ভাষা কানাসি বিশ্বের আর কোথাও প্রচলিত নেই।

একটু আগেই যেটা বলছিলাম, এক শ্রেণির মানুষ সব বাধা অতিক্রম করে এই মালানায় ভিড় জমান। যারা ভিড় জমান তারা মূলত বিশ্বের বড়ো বড়ো মাদকসম্রাট। মালানায় উন্নত মানের গাঁজা চাষ ও গাঁজা থেকে বিভিন্ন মাদক তৈরি করা হয়, যা সংগ্রহ করার জন্য মাদক সম্রাটরা মালানায় আসেন। মালানায় গাঁজা থেকে এমন কিছু মাদক তৈরি হয়, যা বিশ্বের আর কোথাও তৈরি করা সম্ভব হয়নি বলে কথিত আছে। মালানা গ্রামবাসীর মূল অর্থনৈতিক উৎসও এই মাদক ব্যাবসা।

১৯৯৪ এবং ১৯৯৬ সালে পরপর দু-বার বিশ্বের সবেচেয়ে ভালো এবং দামি হাশিশ উৎপাদনের রেকর্ডটিও মালানাবাসীর দখলে। গাঁজার সবচেয়ে ভালো প্রজাতিটিই এই অঞ্চলে জন্মায় এবং মালানাবাসীরা নিজস্ব পন্থায় এই গাঁজাকে প্রক্রিয়াজাত করে। বিভিন্ন দেশের মাদকসম্রাটরা মালানা থেকে হাশিস তৈরির বিশেষ প্রক্রিয়া জেনে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে বলেও জানা যায়।

মালানার অধিবাসীরা এইসব মাদক উৎপাদন পদ্ধতি গোপন রাখেন। নব্বইয়ের দশকে মালানায় একবার একসঙ্গে ১২ জন পর্যটকের লাশ পাওয়া যায়; তখন তাদের লাশ নিয়ে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল, এরা পর্যটকের বেশে মালানায় উৎপাদিত বিভিন্ন মাদকের ফর্মুলা গোপনে বা জোরাজুরি করে জেনে নিতে চেয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মালানার মাদক প্রস্তুতকারীরা তাদের হত্যা করে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে ফেলে রাখে।

গাঁজার উৎপাদন ভালো হয় পাহাড়ি ভূমিতে। এজন্য মালানা প্রাকৃতিকভাবেই গাঁজা চাষের উপযোগী। গাঁজা সরাসরি মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এ থেকে আরও উন্নত

মানের মাদক তৈরি করা যায়। এর মধ্যে চরস ও হাশিশ খুবই বিখ্যাত। এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত গাঁজার চুরুটের সঙ্গে চরসের বেশ মিল আছে। চরসে গাঁজা পাতার সঙ্গে বিভিন্ন ফুলের রস মিশিয়ে তা সেবন করা হয়। আর উন্নত প্রজাতির বাছাইকৃত গাঁজা বৃক্ষের যে স্থানে কুঁড়ি ধরে সেই স্থান থেকে সংগ্রহকৃত আঠা থেকে তৈরি করা হয় হাশিশ। মালানায় উৎপাদিত এই বিশ্বখ্যাত হাশিশকে মালানা ক্রিম নামেও অবিহিত করা হয়।

হাশিশ একটি প্রাচীন মাদক, যা নেশাদ্রব্য হিসেবে খুবই কার্যকরী। হাশিশ নিয়ে নানা কিংবদন্তি আছে। কথিত আছে, ক্রুসেডের সময়ে একদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের হাশিশ খাওয়ানো হত যাতে তারা প্রতিপক্ষের লোকদের নির্দ্বিধায় হত্যা করে ফেলতে পারে। ফলে হাশিশ অনেক আগে থেকেই ঘাতক মাদক। আর এই হাশিশের জন্যই সারা বিশ্বের অসংখ্য মাদকসম্রাট মালানায় ভিড় জমান।

মাদক সম্রাটদের পাশাপাশি এখন প্রতিবছর বেশ কিছু পর্যটকও মালানায় ঘুরতে যান। তবে সবার জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থাপনা। গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই একটি চেকপোস্ট। সেখানে আপনাকে তল্লাশি যতটা না মুখ্য, তার চেয়ে মুখ্য আপনি কী কারণে মালানায় প্রবেশ করতে চান তার সঠিক উত্তর দিতে পারা। যদি আপনি তাদের মনমতো উত্তর দিতে না পারেন তবে আপনাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হতে পারে। যেটা একটু আগেই বলছিলাম। কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভেতরে প্রবেশের পর কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারবেন না আপনি, এটাই আইন। কোনো কিছু স্পর্শ করে ফেললে গুনতে হবে জরিমানা। আপনি তাদের অভ্যন্তরীণ কোনো আলাপ-আলোচনা বুঝতে পারবেন না; কেননা তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা। সেই ভাষার নাম কানাসি। কানাসি নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে।

প্রথমত, সেখানে যেহেতু মাদকের মতো একটি নিন্দনীয় ব্যাবসা পরিচালিত হয়, যার সঙ্গে বিশ্বের বড়ো বড়ো মাদক ব্যবসায়ীদের সংযোগ, সেহেতু সেসব ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের থেকে নিজেদের কথাবার্তা গোপনে সেরে নিতে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তারা এই কানাসি ভাষা তৈরি করে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এটি স্বতন্ত্র একটি ভাষা, যা প্রাচীনকাল থেকেই এখানকার অধিবাসীরা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, এই ভাষা ভারত কিংবা বিশ্বের অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না। কানাসি ভাষার এই রহস্য উদঘাটন করার জন্য সুইডেনের বিখ্যাত আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা চালায়। সেখানকার এক গবেষক বলেন, কানাসি একটি অলিখিত এবং অপরিচিত ভাষা। স্পষ্টভাবে এ ভাষাকে বিপন্নপ্রায় ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তিনি আরও বলেন, কানাসি ভাষা চিন-তিব্বতি ভাষা পরিবারের অন্তর্গত, যা মালানা গ্রামে ব্যবহৃত হয়। ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবার থেকে কানাসি ভাষা পুরোপুরি আলাদা। ফলে এই ভাষা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি করে, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি ভাষাবিজ্ঞানের যে ছক, তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

তবে এই ভাষা এখনও ভাষাবিদদের কাছে রহস্যময়। হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইনস্টিটিউট অফ ট্রাইবাল স্টাডিজের পরিচালক ভি কে ভয়েড বলেন, “মালানাবাসীর ভাষার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার কোনো মিল নেই। এমনকি কুল্লু রাজ দরবারে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গেও এর কোনো মিল পাওয়া যায় না। এটি বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট ভাষা হতে পারে। তারা তাদের ভাষায় ব্যবহার করে এমন ৫০০-৬০০ শব্দ আমরা সংগ্রহ করে গবেষণা চালাচ্ছি। এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করছি, কোন শব্দটি কোন ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা সফলভাবে করতে পারলে বোঝা যাবে, তাদের ভাষার আদি উৎস কী।”

আমাদের কাছে কানাসি ভাষা এখন পর্যন্ত তাই রহস্যময়। শুধু তাদের ভাষাই রহস্যময় নয়; রহস্যময় তাদের ধর্মবিশ্বাসও। ভাষার মতোই প্রচলিত কোনো ধর্মেও তাদের বিশ্বাস নেই। অন্য কোনো ধর্মের সঙ্গে তাদের ধর্মের মিলও পাওয়া যায় না। একজন দেবতাকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মবিশ্বাস যাপিত হয়। সেই একমাত্র দেবতার নাম ‘জমলু ঋষি’। হিন্দু

পুরাণগুলোতে এই ঋষির নাম পাওয়া যায়। তাই ধারণা করা হয়, মালানাবাসী এখনও আর্য-পূর্ববর্তী সময়ের সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী।

ভারতবর্ষে সাধারণত দেখা যায়, প্রায় সকল দেবতার মন্দিরে পুজো হয়ে থাকে, কিন্তু জমলু ঋষির জন্য সে ধরনের কোনো পুজোর ব্যবস্থাপনা নেই। তবে উৎসবে তাকে সর্বশক্তিমান দেবতা হিসেবে স্মরণ করা হয়ে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে পুজো না করলেও সবার ঘরে ঘরে তার আধ্যাত্মিক বাণী সংরক্ষিত আছে। এছাড়া দুটি প্রাচীন মন্দির আছে, সেখানেও জমলু ঋষির বিভিন্ন বাণী দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে, কিন্তু কোনো পুজোর আয়োজন সেখানে হয় না।

মালানা গ্রামের পরিচালনা পদ্ধতিতে এই জমলু ঋষির প্রভাব অত্যধিক। সমাজের একজন তার প্রতিনিধিত্বের শক্তি লাভ করেন। তাকে ‘গুরু’ নামে অভিহিত করা হয়। সমস্ত গ্রাম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও তার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব থাকে সবার ওপরে।

লেখার প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম, মালানা কি বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম? এই উত্তর অনুসন্ধান করার আগে এই দাবি তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের আলোচনা আসলেই প্রাচীন নগর রাষ্ট্র গ্রিসের প্রসঙ্গ চলে আসে প্রথমেই। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রিসের রাজধানী এথেন্স ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শহরে যে রাজনৈতিক পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল তা থেকেই গণতন্ত্রের উৎপত্তি।

স্বভাবতই আমরা যখন মালানা গ্রামকে ‘প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক’ গ্রাম বলছি, তখন নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন গ্রিসের সঙ্গে এর কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে; আর তা হচ্ছে, এখানকার অধিবাসীরা মনে করেন তারা গ্রিক বীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বংশধর।

এখন আমরা তাদের এই দাবির ন্যায্যতা নিয়ে কিছুটা অনুসন্ধান করব। ঐতিহাসিকদের সূত্রানুসারে, তাদের এই দাবির পক্ষে-বিপক্ষে মতামত রয়েছে। পক্ষের দাবি অনুসারে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে যখন ভারত অভিযানে আসেন তখন তার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক শ্বেত সৈন্য ছিল। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে প্রায় ১৯ মাস অবস্থান করেন। কিন্তু যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন আর সকল সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

এমন একটি অংশকে তিনি হিমাচলের পাহাড়বেষ্টিত গ্রাম মালানায় বসবাস করার আদেশ দেন। সেসব প্রশিক্ষিত সৈন্যরা যখন সেখানে বসবাস শুরু করে, তখন তারা তাদের মূল জন্মভূমি গ্রিসের আদলেই শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করে। সেই ব্যবস্থাপনা এখনও পর্যন্ত বজায় আছে। হিমাচলের স্থানীয় এক লোকগবেষকের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে জানা যায়, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সঙ্গে বা গ্রিকদের সঙ্গে মালানার অধিবাসীদের যোগসূত্রের একটি বিষয় আছে।

কথিত আছে, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সেনাবাহিনীর একটি অংশ ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি বিচ্ছিন্ন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা ভারতের পাঞ্জাবে অবস্থিত পুরী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। সেসব সৈন্যদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে মালানার অধিবাসীদের মিল রয়েছে। পাশাপাশি সেসময়ের কিছু চিত্রকর্ম এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন একটি চিত্রকর্মযুক্ত তরবারি সেখানকার একটি মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে। তবে এই জন্মসম্বন্ধীয় সংযোগ ঐতিহাসিকদের দ্বারা স্বীকৃত নয়। এমনকি আমি সেখানকার অনেক অধিবাসীদের এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারেননি; অনেকেই জানেন না এই উপকথার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে।

গ্রিসের আদলেই মালানায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। আইনসভায় উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ দুটি ভাগ রয়েছে। উচ্চকক্ষের সদস্যরাই মূল ক্ষমতার অধিকারী। এই কক্ষের সঙ্গে আবার জমলু ঋষির একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক সদস্যই একমাত্র দেবতা জমলু ঋষির স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত।

মালানা গ্রামের এক বাসিন্দা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানিয়েছেন, দেবতাই চূড়ান্ত

ক্ষমতাবান। আমরা তার প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হই মাত্র। এখানে তিন ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তাদের মধ্য অন্যতম ‘গুরু’। ‘গুরু’ হলেন প্রকৃত দয়ার সাগর, তার দয়া সমস্ত গ্রামকে ঘিরে রাখে, আমাদের রক্ষা করে। তিনি আমাদের পক্ষ হয়ে জমলু ঋষির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

অন্যদিকে মালানার অধিবাসীদের গায়ের রং অনেকটা সাদা; হিমাচলের মানুষ থেকে অনেকটা ভিন্ন। শরীরের গঠনও গ্রিকদের মতো। ফলে এটিও তাদের গ্রিক সংযোগের দাবিকে শক্তিশালী করে।

সর্বোপরি, এই আইনসভার কারণেই মালানাদের গ্রিক সংযোগের দাবি সবচেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে। যদি তাদের এই দাবি সঠিক হয়ে থাকে তবে মালানাই প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, প্রাচীন গ্রিসে যেসব গণতান্ত্রিক এলাকা ছিল তা ‘নগর’ বা ‘নগর রাষ্ট্র’ আর মালানা হল ‘গ্রাম’ অর্থাৎ বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক গ্রাম। আর সেজন্যই মালানার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ সবুজে ঘেরা তাদের গ্রামকে বলে থাকেন ‘হিমালয়ের এথেন্স’।

যে গ্রামের অধিকাংশ জিনিস আজও রহস্যে ঘেরা। মাদকদ্রব্যের মধ্যে বিশ্বে চরস খুবই বিখ্যাত। হিমালয়ের এই অঞ্চলে উৎপাদিত গাঁজা থেকে তৈরি করা চরস পৃথিবী বিখ্যাত। আর এই কারণে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ এই গ্রামে শুধুমাত্র চরসের খোঁজে এই গ্রামে ঘুরতে যায় গবেষক কিংবা লেখক হিসেবে। আপনিও ভারতের ‘প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক’ গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে চলেই যেতে পারেন। হিমালয় প্রেমিক যারা হিমাচল যাবেন তারা কিন্তু অবশ্যই একটা চেষ্টা চালাবেন মালানা যাওয়ার।

রূপকুণ্ডের রহস্যময় ‘কঙ্কাল হ্রদ’

চলুন এবার যাওয়া যাক হিমালয়ের এক রহস্যময় পাহাড়ি হ্রদে। যে হ্রদে দীর্ঘকাল যাবত পড়ে রয়েছে প্রচুর মানুষের কঙ্কাল। একটা-দু’টো নয়, কয়েকশো কঙ্কাল। হিমালয়ের কোলে পাঁচ হাজার মিটার উচ্চতায় উত্তরাখণ্ডের রূপকুণ্ড হ্রদ ও তার চারপাশে দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের কঙ্কাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই এই হ্রদ ‘কঙ্কাল হ্রদ’ বা ‘রহস্য-হ্রদ’ নামেও পরিচিতি। এই কঙ্কাল নিয়ে কয়েক যুগ ধরে চলছে বহু গবেষণা।

হাওড়া থেকে ট্রেনে প্রথমে হরিদ্বার বা হলদোয়ানি অথবা কাঠগোদামও যেতে পারেন তারপর ভাড়া গাড়ি শেয়ার কিংবা বাসে কর্ণপ্রয়াগ। বাস চলে এই রাস্তায়, তবে বেশ কম। কর্ণপ্রয়াগ থেকে থারালি হয়ে লোহাজং কিংবা ওয়ান অবধি পৌঁছে যান। তারপর ৫ থেকে ৭ দিনের ট্রেকিং। এরপর ৭০ কিমি রাস্তা আপনাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

আট হাজার ফিটের উচ্চতায় লোহাজং স্থানটি বেশ শীতল ও মনোরম। ট্রেকিংয়ের দরকারি কিছু জিনিসপত্র ভুলে গেলে সব কিছুই কিনতে পাবেন এখানে। চাইলে ভাড়া নিতে পারেন। আরও ওপরে উঠলে টেন্টও ভাড়া মিলবে, কিনতেও পাবেন।

লোহাজং থেকে ৭ কিমি দূরে দিদিনা। যদিও অনেকেই গাড়িতে চলে যান ওয়ান নামক স্থানে। সেখান থেকেই ট্রেক শুরু করে। আপনি প্রকৃতি প্রেমিক হলে দিদিনা হয়ে চলুন। ওক-পাইন-রডডেনড্রনের জঙ্গলে দেখতে দেখতে চলুন। ছবিত মতো পাহাড় আর তার কোলে ছোট্ট ছোট্ট গ্রামগুলি বেশ সুন্দর। একদম হাতে আঁকা ছবির মতো।

নীলগঙ্গা নদী পার হলে আরও চড়াই বাড়বে। মেঘ রোদ কুয়াশা অতিক্রম করে পৌঁছে যান দিদিনায়। হোম-স্টে তে থেকে যান। আগে থেকে বুকিং থাকলে ভালো। দিদিনা মোটামুটি ৮০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত।

পরদিন ভোরবেলায় উঠে পড়ুন, ব্রেকফাস্ট সেরে যাত্রা শুরু করুন। জঙ্গনের মধ্যে দিয়েই কঠিন চড়াই পার হতে হবে। গাইড এবং পোর্টার সঙ্গে নেবেন অতি অবশ্যই। ঘণ্টা পাঁচেক হেঁটে খুপাল টপ। এখান থেকে এবার আলি বুগিয়ালের পথে যাত্রা শুরু।

আলি বুগিয়াল। এক বিস্তীর্ণ সবুজ এলাকা। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে আপনি অনেক তুষারশৃঙ্গ দেখতে পাবেন। আরও ঘণ্টা তিন-চারেক হেঁটে পৌঁছোন রেদিনীবুগিয়াল।

বেদেনীবুগিয়াল পৌঁছোতে প্রায় ৮-৯ ঘণ্টা সময় লাগবে। রাস্তা ১৪ থেকে ১৫ কিমি। বড্ড চড়াই হওয়ার জন্য একটু বিশ্রাম নেবেন। তারপর আবার হাঁটবেন। বেদেনীবুগিয়ালের উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফুট। এখান থেকে সোনালি রোদের মধ্যে দিয়ে কিছু দূরেই ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে ফরেস্টের বেশ কয়েকটি হাট ও কিছু সাদামাঠা কটেজ আছে। চাইলে টেন্টেও থাকতে পারেন। সবুজ ঘাসের কার্পেটের ওপর টেন্টে থাকার মজাই আলাদা।

সময় করে বেদিনীকুণ্ডটি দেখে নিন। আর তার পাশে থাকা ছোট্ট মন্দিরে পুজো দিন। বর্ষার পর কুণ্ডে যখন জল থাকে তখন নন্দাঘুন্টি আর ত্রিশূলের অসাধারণ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

পাথরনাচুনিতে ফরেস্ট হাট, কটেজ আছে। পাহাড়ের মাথায় কলু বিনায়কের মন্দির। কঠিন চড়াই রাস্তা। কলু বিনায়ক-এর ছোট্ট একটা মন্দির আপনার মন ভরিয়ে দেবে।

একটা দিন কাটান বাগুয়াবাসা ক্যাম্পে। তারপর আবার হাটা শুরু। এই পথে বরফ বাড়বে। আর বরফে হাঁটা একটু সমস্যার হবে। মনের জোরে হাঁটুন। ধীরে হাঁটুন কিন্তু সতর্কভাবে হাঁটুন। পা টিপে টিপে এবং সাবধানে। ‘ধ্যান হটি দুর্ঘটনা ঘটি’। একটি ভুল পদক্ষেপ আর মৃত্যু নিশ্চিত। প্রায় ঘণ্টা দশেক ট্রেক করে রেস্ট নিন।

কপালে থাকলে এই পথেই ব্রহ্মকমল, হেমকমলের মতো দুষ্প্রাপ্য ফুলগুলি দেখতে পাবেন। বরফ কেটে পথ বানাতে হতে পারে, তাই বরফ কাটার জিনিসপত্র অতি অবশ্যই সঙ্গে নেবেন।

রূপকুণ্ড পৌঁছে সেখানকার পরিবেশ দেখে আপনি মোহিত হয়ে যাবেন। হিমালয়ের

কোলে পাঁচ হাজার মিটার উচ্চতায় রূপকুণ্ড।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ মাইল উঁচুতে এর অবস্থান। এই হ্রদটি দেখতে সারা পৃথিবী থেকে মানুষজন আসেন। এবার এই হ্রদের বেশ কিছু অলৌকিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় আসি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই হ্রদে খুঁজে পাওয়া গেল ২০০টি মানুষের কঙ্কাল। বিশ্বজুড়ে খবরটি ছড়িয়ে গেল মিশাইলের বেগে। কৌতূহলের কেন্দ্রে চলে এল কঙ্কাল হ্রদ। গবেষক আর বিশ্লেষকরা একের পর এক তত্ত্ব আর মতামত দিতে লাগল। বেশিরভাগ জনের মতামত ভুল প্রমাণিত হতে লাগল। দেখতে দেখতে পৃথিবীর সেরা একটি রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল রূপকুণ্ড। আশ্চর্যের বিষয়, এই হ্রদের কঙ্কালগুলির কাদের আর কীভাবে সেখানে এল তার সমাধান কেউ খুঁজে পায়নি।

কঙ্কাল হ্রদ। কঙ্কাল ছড়িয়ে থাকার মধ্যেই এক রহস্য নিহিত আছে। যে রহস্য আজও পৃথিবীর অমীমাংসিত রহস্য হয়েই টিকে আছে। রূপকুণ্ড হ্রদে মানুষের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়ার কথা মিডিয়ার কল্যাণে বিশ্ববাসী জেনেছে।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটিশ পেট্রোল বাহিনী এই পথ ধরে এগোচ্ছিল তখন হঠাৎ চোখ আটকে যায় তাদের। মানুষের খুলি আর শরীরের হাড় দেখতে পেয়ে থামে তারা। প্রথমে একটি কঙ্কাল তারপর আর একটি। এক, দুই, তিন করে যখন কঙ্কালের বহর বাড়ছিল তখন তারা ভয়ংকর ভয় পেয়ে যায়। তারা সেবার ২০০ কঙ্কাল খুঁজে পেয়েছিলেন। এই দেহগুলো কাদের হতে পারে তা নিয়ে চালানো হয় গবেষণা। কিন্তু খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। ব্রিটিশ সেনার আধিকারিকরা ভাবলেন এই দেহগুলি জাপানি সৈন্যদের হতে পারে। কোনো দুর্যোগ, প্রাকৃতিক কারণে বা দস্যুদের হামলায় হয়তো তারা প্রাণ হারিয়েছে।

এর দীর্ঘদিন পরে আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্র কাজে লাগিয়ে কঙ্কালগুলির পরীক্ষা করে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনও কেউ নিশ্চিত করেনি যে এই মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছে, নাকি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের প্রাণ গেছে?

কেউ কেউ বলেছেন কঙ্কালগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০ অব্দের। কঙ্কালগুলি কাদের আর কঙ্কালগুলি হ্রদে কীভাবে এল তা এখনও পৃথিবীবাসীর কাছে অজ্ঞাত। পৃথিবীতে রহস্যের শেষ নেই। এখনও বহু রহস্যময় বিষয় রয়েছে যেগুলোর কোনো সুরাহা হয়নি। কঙ্কাল হ্রদে পাওয়া কঙ্কাল রহস্য তার মধ্যে অন্যতম।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে জানা যায়, রূপকুণ্ড হ্রদটিকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টজন্মের আগে থেকেই রহস্য চালু ছিল। তখন অনেক মুনি আর ঋষির নামে বিভিন্ন গল্প চালু ছিল হ্রদটিকে কেন্দ্র করে। তবে ১৯৪২ সালের দিকে একজন বনরক্ষী হঠাৎ হ্রদটি এবং অনেক গণকবর আবিষ্কার করেন। এ ঘটনায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যদিও পরবর্তীতে জানা যায়, কঙ্কালগুলো ১২ থেকে ১৫ শতকের সময়কার। কিন্তু মানুষের মনে আজও ভাবনা ঘুরপাক খায় এই ভেবে, কেন ১৬ হাজার ফুট উঁচুতে একসঙ্গে এতগুলো মানুষের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা কঙ্কালগুলো এবং প্রাপ্ত গহনা পরীক্ষা করে জানান, এগুলো কোনো রাজকীয় বাহিনী বা একদল তীর্থযাত্রীর। এমনও হতে পারে, এই মানুষগুলো কোনো তীব্র তুষারঝড়ের কবলে মারা গিয়েছিল। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হাজির করেন একদল নৃতত্ত্ববিদ। তাদের মতে, ওই অঞ্চলে বসবাসরত কোনো গোষ্ঠী গণহারে আত্মহত্যা করেছিল। এটাই রয়েছে এই রহস্যের মূলে।

আর একদল অবশ্য বলে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এই রাজকীয় বাহিনী বা তীর্থযাত্রী দলের মানুষগুলোর মৃত্যু হয়েছে। এ হ্রদটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ মাইল উঁচুতে অবস্থিত। অনেক পর্যটক এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ মানচিত্র ঘেঁটে এবং বছরের পর বছর অনুসন্ধান চালিয়েও হ্রদটির সন্ধান পায়নি। আবার এমনও হয়েছে, অল্প একটু চেষ্টাতেই অনেকে দেখতে পেয়েছেন হ্রদটিকে। সবচেয়ে বড়ো কথা—এটি সবাই দেখতেও পান না। এর

আশপাশের এলাকাও ছিল অতিরিক্ত ঠান্ডা। অনেকদিন পর্যন্ত কেউই এই হ্রদটির কথা জানত না। কারও বর্ণনায় এই হ্রদের কথা পাওয়া যায়নি। এটি একটি হিমবাহ হ্রদ। এটির অবস্থান ভারতের উত্তরখণ্ডে। এছাড়া অনেকে বলেন ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মানুষ জানত এই কঙ্কালগুলোর কথা। কারা এই হতভাগ্যরা? কীভাবে তারা মারা গেল? যুগের পর যুগ কৌতূহলী মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। এই হ্রদটির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ঠিক যে সময় থেকে এ হ্রদটি পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত হল, তখন থেকেই এর সঙ্গে রহস্যের ব্যাপারটি জুড়ে যায়।

এক প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ গবেষক তাঁর লেখায় লিখেছেন, "ভারতে অবস্থিত রূপকুণ্ড হ্রদটিকে মানুষজন রহস্যময় অভিশপ্ত কঙ্কাল হ্রদ হিসেবেই চেনে। এখানে ৫০০-র মতো মানুষের কঙ্কাল মিলেছে। এ কারণে রূপকুণ্ড হ্রদের নাম লোকমুখে হয়ে যায় কঙ্কাল হ্রদ। ১৯৪২ সালে নন্দাদেবী রিজার্ভ পার্কের রেঞ্জার এইচ কে মাধওয়াল এই কঙ্কালগুলো প্রথম আবিষ্কার করেন। প্রথমে মনে করা হয়েছিল এগুলো জাপানি সৈন্যদের কঙ্কাল, যারা ওই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডায় তারা মারা যায়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। স্থানীয় ব্রিটিশ প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করতে গিয়ে দেখল কঙ্কালগুলো অন্তত এক শতাব্দী প্রাচীন। অনেকে ভাবলেন এটা জম্মু-কাশ্মীরের রাজা জেনারেল জরাইয়ার সিংয়ের সেনাদের, যারা বালিতস্তান আক্রমণের সময় হারিয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ভারতীয় সরকার সেখানে সার্ভে টিম পাঠায়। তারা সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে রেডিয়ো কার্বন ডেটিং করে জানা গেল এগুলো অন্তত ১২ থেকে ১৫ শতাব্দীতে হবে। তখন অনেকে ধারণা করলেন এরা মোহাম্মদ বিন তুঘলকের সেনাবাহিনী হবে, যারা তিব্বত দখল করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে ১৯৫৬ সালের পদ্ধতি ছিল অনেক ত্রুটিপূর্ণ। অনেকে ধারণা করলেন এরা কোনো মহামারির শিকার হয়েছে।"

এ অঞ্চলের নীচের জনপদগুলোতে এই হ্রদ নিয়ে একটি লোককাহিনি প্রচলিত আছে, প্রাচীনকালে কনৌজের রাজা যশোয়াল এখানে আসেন নন্দাদেবীর উপাসনা করতে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসেন বাঈজি। এতে এই স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হয়। তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। তাদের ওপর শিলাবৃষ্টি হয় এবং তারা হ্রদের ভেতর নিক্ষিপ্ত হয়। অধিকাংশ মানুষ এই লোককাহিনিকে গালগল্প বলে ধরে নিলেও এর ভেতর কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী, কনৌজের রাজা যশোয়াল, তার রানি ও পরিষদবর্গসহ নন্দী দেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রার জন্য গিয়েছিলেন। আজও প্রতি ১২ বছর অন্তর রূপকুণ্ডে নন্দী দেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রার আয়োজন করা হয়।

বেশ কিছু কিংবদন্তিতে এই অদ্ভুতুড়ে হ্রদের উল্লেখ আছে। স্থানীয় আদিবাসী তো বটেই, গোটা বিশ্ববাসীর কাছেই রূপকুণ্ড একটি মৃত্যু-বিভীষিকার নাম। ২০০৩ সালে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের উদ্যোগে একদল গবেষক এই রহস্য ভাঙার উদ্যোগ নেন। এর নেতৃত্ব দেন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. উইলিয়াম সাঙ্। দলটিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ছিলেন। তাঁরা নানা হাড়গোড়ের নমুনা সংগ্রহ করেন। দলটি একটি বিশাল সাফল্য লাভ করে যখন তাঁরা একটি অক্ষত দেহ উদ্ধার করেন। হিমালয়ের বরফশীতল তাপমাত্রা দেহটিকে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। এতে তাঁরা ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করতে সুবিধা পেলেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কঙ্কালের খুলিতে অগভীর আঘাতের চিহ্ন পেলেন। পুনের ডেকান কলেজের প্রফেসার ডা. সুভাষের মতে এই অগভীর আঘাতের কারণ কোনো তুষারধস নয়, বরং গলফবলের মতো ছোটো কঠিন বস্তুর আঘাতের ফলাফল। একই সঙ্গে কয়েকশো মানুষ মাথায় একই রকম আঘাত পেল এবং মারা গেল এটা নিশ্চয়ই ওপর থেকে আঘাত করেছে। তাদের ধারণা এটা শিলাবৃষ্টি হবে। প্রফেসার ড. উইলিয়াম সাঙ্ স্থানীয় একটি পালাগানের কথা স্মরণ করেন, যেখানে বলা হয়েছে রুষ্ট দেবী পাপিষ্ঠদের ওপর এমন শিলা নিক্ষেপ করেন, যা পাথরের থেকেও ভারী। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা কাপড়, জুতা, কাচের চুড়ি, বাঁশের লাঠি উদ্ধার করেন। এ থেকে বোঝা যায় তারা তীর্থযাত্রী

ছিলেন। সেখানে এখনও বরফের নীচে ৬০০ দেহ চাপা পড়ে থাকতে পারে। এই নমুনাগুলো ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়ো কার্বন এক্সিলেটর ইউনিটে পাঠানো হয়। সেখানকার গবেষকরা জানান, নমুনাগুলো ৮৫০ খ্রিস্টপূর্বের। যা ১৯৫৬ সালের রিপোর্টের আরও বহু আগে। হায়দরাবাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় লাশের হাড়ের নমুনা থেকে তিনটি এমন জিন পাওয়া গেল, যা মহারাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের আর কোথাকারও মানুষের ভেতরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে আরও কিছু মানুষের চেহারা হিমালয়ের আশপাশের মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর। অতএব এটা বলা স্বাভাবিক যে, তীর্থযাত্রীরা স্থানীয়দের কুলি হিসেবে নিয়োগ করেছিল। রূপকুণ্ড থেকে স্থানীয় মানববসতির দূরত্ব ৩৫ কি.মি। তাই বাইরের লোকেরা স্থানীয়দের সহায়তা ছাড়া সেখানে যেতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। এটা ধারণা করা যায় আজ থেকে ১৩০০ বছর আগে এক হাজারের মতো লোক হিমালয়ের ওপরে অজানা পরিবেশে চলছিল। তাদের সঙ্গে কুলি হিসেবে ছিল স্থানীয়রা। সেখানে পুরুষ, মহিলা এবং শিশু ছিল। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হল। পালানোর কোনো উপায় ছিল না। শিলার আঘাতে একে একে মৃত্যুর মুখে পতিত হল সবাই। কিছুক্ষণের ভেতর রূপকুণ্ড হয়ে গেল এক মৃত্যুপুরী। তাদের দেহ হ্রদের উপর পতিত হল। কিছু বরফ চাপা পড়ল। দিন পেরিয়ে মাস হল, মাস পেরিয়ে বছর, তারপর শতাব্দীও কেটে গেল।

এক ব্রিটিশ লেখক তাঁর লেখায় লিখছেন, “ভারত বিশ্ব মানচিত্রে আলাদা সৌন্দর্য ধারণ করে আছে। এখানে আছে ঊষর মরুভূমি, আছে বরফাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। আছে রহস্যঘেরা কয়েকটি স্থানও। ককেশীয় অঞ্চলের মানুষদের কাছে ভারত ছিল তান্ত্রিকদের পুণ্যভূমি। আবার ইউরোপবাসীর কাছে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল, বুনো মানুষের বসবাস। কিন্তু যুগের হাওয়ায় এসব রহস্য এখন আর হালে পানি পায় না। কিন্তু তার পরও ভারতের কয়েকটি অঞ্চল ঘিরে মানুষের মধ্যে আজও রহস্য ঘুরপাক খায়। তেমনি একটি অঞ্চল হিমালয়ের রূপকুণ্ড হ্রদ। এই রূপকুণ্ড সত্যিই রূপের আধার। রহস্যের শেষ নেই যেন। কোথাও শুনতে পাওয়া যায় এই হ্রদে এমনও কিছু স্থান আছে, যেখান থেকে মানুষ আর কখনও ফিরে আসে না। সে রহস্য বুকে নিয়ে কঙ্কাল হ্রদ চির রহস্যের এক আধার হয়ে রয়েছে।”

এক জার্মান গবেষক লিখছেন, “রূপকুণ্ডের এই কঙ্কাল হয়তো জাপানিদের। সে-সময় জাপানিরা ভারতের মাটিতে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। এ অঞ্চলটিই ছিল ভারতে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। কিন্তু দুর্গম ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে শেষরক্ষা হয়নি। অতিরিক্তি ঠান্ডার কারণে জাপানি সৈন্যদের মৃত্যু ঘটে। সেখান থেকেই হয়তো এত কঙ্কাল।

পরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, কঙ্কালগুলো জাপানিদের নয়। বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে। ভূমিকম্প, আত্মহত্যা ইত্যাদি নানা তত্ত্ব বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে। ২০০৪ সালে রহস্যের একটা সমাধান পাওয়া যায়। জানা যায়, কঙ্কালগুলো প্রায় ১২০০ বছরের পুরোনো। অনুমান করা হয়, একদল তীর্থযাত্রী স্থানীয় গাইড বা পোর্টারের সঙ্গে যাত্রা করছিলেন। কিন্তু যাত্রা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যান তাঁরা।

খুলি ও কাঁধে আঘাতের চিহ্ন দেখে অনুমান করা হয়, সামনে থেকে এমন কিছু তাদের ওপর পড়েছিল, যা তারা সামলাতে পারেননি। আবার স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন, এই পাহাড় আসলে এক দেবীর বাসস্থান। বাইরের কেউ যদি এখানে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তবে তিনি নিজের শক্তি প্রয়োগ করে লোহার মতো কঠিন শিলা বর্ষণ করান, যাতে কেউ বেঁচে ফিরতে না পারে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গবেষণায় মৃত্যুর কারণ হিসেবে শিলাবৃষ্টিকে দায়ী করা হয়েছে।”

কিছু ব্রিটিশ গবেষকরা মিলে একটি টিম গঠন করে ও রূপকুণ্ড হ্রদে দীর্ঘ গবেষণা চালায়, তারপর তারা যে রিপোর্ট জমা দেয় তাতে উঠে আসে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ও রোমহর্ষক তথ্য। সেই রিপোর্টে দাবি করা হয়, রূপকুণ্ডে পাওয়া হাড়গুলির মধ্যে বেশ কিছু অন্তত আড়াই হাজার বছরের পুরোনো। কোনও এক অজানা কারণে সে সময়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে এত দূরে ভারতের হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় এসে মৃত্যু

হয়েছিল ভিনদেশি দলটির। কেন, কীভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছিল, কেনই বা তারা এখানে এসেছিল, তা অবশ্য এখনও অজানা। গবেষণাপত্রটি 'নেচার কমিউনিকেশনস' জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছে।

তবে গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, রূপকুণ্ডে পাওয়া সব কঙ্কাল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের নয়। জিন-পরীক্ষাতে বেশ কিছু তফাত ধরা পড়েছে এদের মধ্যে। যা থেকে বিজ্ঞানীদের অনুমান, এরা সকলেই কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না। এরা আলাদা-আলাদা গোষ্ঠীর। বিভিন্ন সময়ে রূপকুণ্ডে এসেছিলেন। অন্তত দু'টি পর্বে তারা এসেছিলেন।

লক্ষ্ণৌয়ের 'বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়োসায়েন্সেস'-এর এক গবেষক বলেন, "অনেক দিন ধরেই রূপকুণ্ড নিয়ে গবেষণা চলছে। কঙ্কালগুলো কাদের, তারা কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে মারা যায়, এসব নিয়ে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে যা জানা যাচ্ছে, তাতে এটুকু স্পষ্ট, সত্যিটা আমাদের কল্পনায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক বেশি জটিল।"

রূপকুণ্ডের ওইসব কঙ্কাল থেকে পাওয়া ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ভারতে পাওয়া সব চেয়ে প্রাচীন মানুষের ডিএনএ সেগুলি। জিনগতভাবে ভিন্ন অন্তত তিনটি গোষ্ঠীর। হায়দরাবাদের 'সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি'-র কুমারস্বামী থঙ্গরাজ বলেন, "একাধিক গোষ্ঠীর কঙ্কাল যে রয়েছে, সেটা আমরা প্রথম জানতে পারি ৭২টি কঙ্কালের মাইটোকনড্রিয়াল ডিএনএ পরীক্ষা করে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ডিএনএগুলির সঙ্গে বর্তমান ভারতের মানুষের সঙ্গে অনেক মিল। আবার কিছু ডিএনএ-র সঙ্গে পশ্চিম ইউরেশিয়ার জনগোষ্ঠীর মিল প্রচুর।" পরীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া কঙ্কালগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগের ২৩টি কঙ্কালের সঙ্গে ভারতের বর্তমান মানুষের জিনগত মিল পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ১৪টি কঙ্কালের সঙ্গে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার বাসিন্দাদের সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষ করে ক্রিট ও গ্রিসের। এবং শেষ তথা তৃতীয় ভাগের কঙ্কালগুলির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দাদের জিনগত মিল রয়েছে।"

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এয়াডাওয়িন হার্নের কথায়, "আমরা সত্যি চমকে গিয়েছি। বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রাচীন বাসিন্দাদের কঙ্কালগুলি নিয়ে। এ ধাঁধা তাহলে আর ভারতে আটকে রইল না। প্রশ্ন তুলে দিল, তা হলে কি অত বছর আগেও পৃথিবীর সম্পূর্ণ অন্য প্রান্ত থেকে রূপকুণ্ড দর্শনে আসত মানুষ!"

রুদ্রাক্ষের যত অলৌকিক গল্প

রুদ্রাক্ষ কিনতে হরিদ্বারের একটা বেশ নামজাদা দোকানে গেছি। দোকানদার রুদ্রাক্ষ দেখাচ্ছেন। দাম বলছেন। হাতে নিয়ে দেখছি। চোখের সামনে এনে দেখছি, এসব চলছে। একটা একমুখী রুদ্রাক্ষ দেখে বেশ মনে ধরল। দামটা বেশ বড়ো অঙ্কের। কিন্তু নেব যখন ঠিক করে ফেলেছি তখন কী আর করা যাবে। দোকানদারের কাছে এক গ্লাস জল চাইলাম। দোকানদার এনে দিল। আমি তাতে রুদ্রাক্ষ ফেলে দিলাম। আর তারপরই সিদ্ধান্ত নিলাম রুদ্রাক্ষটি আমি নেব না। দোকানের মালিককে সেকথা বলতেই উনি মৃদু হাসলেন ও বললেন, ইয়ে মাল আপকো সারা দুনিয়ামে নেহি মিলেগা। আমি তাকে সরাসরি বললাম রুদ্রাক্ষটা জাল। মালিক হাঁ হয়ে শুনলেন আমার কথা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "জাল! কেয়া বোল রহে হো আপ! আপ সাবিত কর সকেঙ্গে ইয়ে জাল হ্যায়।" আমি শুনে বললাম প্রমাণ তো আপনার চোখের সামনে। দোকানের মালিক হঠাৎ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলেন যদি আমি রুদ্রাক্ষটা জাল সেটা যদি প্রমাণ করতে পারি তো তিনি ওই রুদ্রাক্ষটি আমায় গিফট দেবেন।

ব্যস আমি আবারও এক গ্লাসে পরিষ্কার জল আনালাম আর একমুখী রুদ্রাক্ষকে সেই জলে ফেলে দিলাম। পরীক্ষা শেষ দেখা গেল সেই একমুখী রুদ্রাক্ষটি জলে ভাসছে। রুদ্রাক্ষের নিয়মই তাই, আসল হলে ডুবে যাবে আর নকল হলে ভাসবে।

অনেক চেষ্টা করেও মালিক তাকে ডোবাতে পারলেন না।

নির্দিষ্ট একটি গাছের বীজ হল রুদ্রাক্ষ। পাহাড়ের একটি উচ্চতায় এই গাছ দেখা যায়। হিমালয়ের কোলে রুদ্রাক্ষগাছ দেখা গেলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই গাছের কাঠ দিয়েই রেলের স্লিপার তৈরি হয়। তাই প্রচুর সংখ্যক রুদ্রাক্ষ গাছ কেটে ফেলায় ভারতে এই গাছের সংখ্যা কমে এসেছে। নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় রুদ্রাক্ষগাছ হয়। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেও রুদ্রাক্ষগাছ দেখা গেলেও হিমালয়ের কোলে যে রুদ্রাক্ষ হয়, তার গুণগত মান বেশি ভালো।

রুদ্রাক্ষ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। রুদ্র+অক্ষ = রুদ্রাক্ষ। যার অর্থ হচ্ছে—রুদ্রদেবের চক্ষু। রুদ্র কথাটা এসেছে—রুদ+নিচ-রোদি (রোদন করানোর (কর্তৃ) অর্থাৎ যিনি রোদন করান। পুরাণে আছে, ব্রহ্মা কল্পারম্ভে সৃষ্টি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় এক বালক মূর্তি তার ললাট হতে আবির্ভূত হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে ইতস্তত ভ্রম করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাকে রুদ্র নামে অবহিত করে রোদনে নিবৃত্ত হতে বললেন এবং তাকে রুদ্র, ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব ইত্যাদি অষ্ট নামে ডাকতে লাগলেন। ইনিই একাদশ মূর্তিতে একাদশ রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। এই একাদশ রুদ্র হচ্ছেন—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্নু, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, এবং ঈশ্বর। শিবের সংহার মূর্তিকেই বলে রুদ্র।

পুরাণ বলছে, ত্রিপুরাসুরের বধের পর শিবের আঁখি থেকে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়েছিল। এই অশ্রুবিন্দু থেকে এই বৃক্ষ ও ফলের উৎপত্তি। ইংরেজিতে যাকে বলে, utrasum beadl

সাধারণত রুদ্রাক্ষের মালা গেঁথে গলায় পরা হয়। ১০৮ টি রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালাটি গাঁথা হয়। একটি রুদ্রাক্ষকে লকেট হিসেবে রেখেও অনেক মালা গাঁথা হয়। একটি একটি করে রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালা গাঁথাই নিয়ম। এই অতিরিক্ত রুদ্রাক্ষটিকে বলে বিন্দু। রুদ্রাক্ষের মালায় বিন্দু থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। না হলে রুদ্রাক্ষ থেকে নির্গত শক্তি বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি ওই মালা পরেছেন, তার মধ্যে এক ধরনের আলস্য দেখা দিতে পারে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য কম করে ৮৪টি রুদ্রাক্ষ ও একটি বিন্দু লাগবেই। রুদ্রাক্ষের মালা সুতো বা রেশম দিয়ে বাঁধা উচিত। বেশি টাইট করে রুদ্রাক্ষের মালা গাঁথা ঠিক নয়। এতে রুদ্রাক্ষের ভেতরে ফাটল ধরতে পারে। রুদ্রাক্ষের মালা সব সময় পরে থাকা যায়। শুধু গরম জলে ও কেমিক্যাল যুক্ত সাবান দিয়ে স্নান করার সময় এই মালা খুলে রাখবেন।

এই রুদ্রাক্ষের মালাতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ জাত-পাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই রুদ্রাক্ষ চারটি রঙে পাওয়া যায়। ১. শ্বেতবর্ণ, ২. রক্তবর্ণ, ৩. পীত্ বা হলুদবর্ণ ৪. কালো বা শ্যামবর্ণ। বলা হয়ে থাকে—এই শ্বেতবর্ণ বা সাদা রঙের রুদ্রাক্ষ ব্রাহ্মণগণ ধারণ করবেন. রক্ত বা লাল আভাযুক্ত রুদ্রাক্ষ ক্ষত্রিয়গণ ধারণ করবেন। পীত্ বা হলুদ আভাযুক্ত রুদ্রাক্ষ বৈশ্যগণ ধারণ করবেন। আর শ্যাম বা কালো রঙের আভাযুক্ত রুদ্রাক্ষ শূদ্র-জাতির লোকেরা পরিধান করবে। পণ্ডিতদের অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য কৃতিত্ব অবশ্য প্রাপ্য। হাস্যকর এই ব্যবস্থা।

রুদ্রাক্ষের মালা সবাই পরতে পারেন। বিশেষ করে কাজের সূত্রে যাদের এদিক-ওদিক ঘুরতে হয়, তাদের জন্য এই মালা বিশেষ উপকারী। এই কারণেই সাধু-সন্ন্যাসীরা রুদ্রাক্ষ পরেন। কারণ বিশেষ করে আগেকার দিনে সাধু-সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। যে কোনো স্থান থেকে এক ধরনের শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তি সবার জন্য অনুকূল না-ও হতে পারে। রুদ্রাক্ষ প্রতিকূল শক্তির সামনে ঢাল হিসেবে কাজ করে। রুদ্রাক্ষের শক্তি সেই প্রতিকূলতাকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

রুদ্রাক্ষ একমুখী থেকে ২১ মুখী পর্যন্ত হতে পারে। এই বিভিন্ন ধরনের রুদ্রাক্ষের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। যে কোনো এক ধরনের রুদ্রাক্ষ কিনে মালা গেঁথে গলায় ঝুলিয়ে দিলেই হয় না। কোন রুদ্রাক্ষের কী কাজ, তা জেনে তবেই ধারণ করা উচিত। একমুখী রুদ্রাক্ষের শক্তি সবচেয়ে বেশি। তাই অনেকেই একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে আগ্রহী। কিন্তু যে কেউ তা ধারণ করে নিলে, ফল কিন্তু ভালো হবে না। যে কারওর জন্য সবচেয়ে উপকারী ও নিরাপদ হল পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে পারে।

রুদ্রাক্ষের দানাগুলির মধ্যে একরকম অদ্ভুত চুম্বকীয় শক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি নিহিত থাকে। এটা শুধু সাধুসন্তদের কথা নয়। আধুনিক বিজ্ঞান, এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা স্বীকার করে। বস্তুগত দিক থেকে এর গুণ বা প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও রুদ্রাক্ষের চাহিদা ও প্রয়োগ দিন দিন বাড়ছে।

রুদ্রাক্ষের গাছ খানিকটা আমাদের জলপাই গাছের মতো দেখতে। তবে পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে দু-চারটে গাছ থাকলেও রুদ্রাক্ষের গাছ এখানে নজরে পড়ে না। আসলে এটি পাহাড়ি অঞ্চলের একটা বুনো গাছ। ভারতের হিমালয়ের জঙ্গলে অর্থাৎ উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ইত্যাদি জায়গায় এমনকি দক্ষিণ ভারতেও এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া, তিব্বত, চিনের কিছু অংশে, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন গাছের দেখা পাওয়া যায়। বর্তমানে এই গাছের ফলের ব্যবসায়িক মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্য, কেউ কেউ এর চাষ শুরু করেছেন। কিন্তু সেটা চোখে পড়ার মতো নয়।

ভৌগোলিক ও জাতিগত কারণে এই ফলের বিভিন্ন আকার, অর্থাৎ ছোটো থেকে বড়ো ও আকৃতি অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রাকৃতি থেকে চ্যাপটা, গোল ইত্যাদি হয়। যেমন ইন্দোনেশীয় রুদ্রাক্ষ আমাদের বুনো কুলের মতো হয়। নেপালের রুদ্রাক্ষ গোল হয়। এখানেই গোল একমুখী রুদ্রাক্ষ দুর্লভ হলেও পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের রুদ্রাক্ষ একমুখী ও অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি হয়।

আদি শঙ্করাচার্য রুদ্রাক্ষ ধারণ করতেন। এমনকি তার ভাবধারায় যে সব সন্ন্যাসী আছেন, তারা সবাই রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের অনেকেই রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকদিন রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করতেন। জপ্ শেষে মায়ের পাদপদ্মে এই মালা রেখে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে শরীর ছাড়ার আগে এই রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে জপে বসেছিলেন। রুদ্রাক্ষের মালা জপ্ করতে করতেই তার মহাসমাধি হয়েছিল। ভারত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, প্রণবানন্দজি এই রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করতেন এবং সবাইকে ধারণ করতে বলতেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভোলানন্দ গিরি, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী নিগমানন্দ, বাবা লোকনাথ, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাখ্যাপা, আনন্দময়ী মা-র মতো

একাধিক সাধক সাধিকারা রুদ্রাক্ষ ধারণ করতেন। শুনলে হয়তো অবাক হতে পারেন অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী রুদ্রাক্ষ ধারণ করতেন। যেমন ইন্দিরা গান্ধি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করতেন এই রুদ্রাক্ষ মালাটি তিনি সাধিকা আনন্দময়ী মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ভারতের হাজার হাজার যোগী-সন্ন্যাসী আজও এই রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেন।

ভারতের একাধিক মঠ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে গেলে দেখবেন সন্ন্যাসীদের শরীর ছাড়ার পরে, তাদের স্মৃতিজড়িত ঘরে, সেই রুদ্রাক্ষের মালাটি যত্ন করে রাখা আছে। ওই সাধক বা সাধিকা যে মালাটি ব্যবহার করতেন তা আশ্রমে বা মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

সবাই অবশ্য জাতপাতের বিচারে বা হিসেব করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন না। আসলে সমস্ত জাতির লোক তা সে ব্রাহ্মণ হোক বা চণ্ডাল হোক, গুণবান হোক বা গুণহীন হোক, রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে, দ্রব্য বা ফলের গুণ ধারণকারীকে আশ্রয় করবে, এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এটা সত্য যে, প্রকৃতির যে কোনো দ্রব্য বা ব্যক্তি কিছু না কিছু গুণ তার চারিদিকে বিচ্ছুরিত করছে। তন্মাত্রার মধ্যে এইসব গুণ মিশে যায় এবং কাছাকাছি জিনিস বা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। তা সে আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, ঔষধের গুণ আপনাকে প্রভাবিত করবে। তা সে ঔষধের গুণ আপনি জেনেই খান আর না জেনেই খান।

এখন কথা হচ্ছে, সাধুরা ভগবানকে পাওয়ার জন্য, বা রমতাজীবন কাটানোর জন্য রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, এটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সাধারণের জন্য, রুদ্রাক্ষ ধারণের কি আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? দেখুন রুদ্রাক্ষের প্রশংসা শুধু হিন্দু শাস্ত্রে বা পুরাণে আছে তাই নয়, বর্তমানে, ইউরোপ ও আমেরিকাতে পর্যন্ত এই রুদ্রাক্ষের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। ওইসব দেশে, রুদ্রাক্ষের অলৌকিক এবং ঔষধীয় গুণ সমূহের সম্পর্কে নিত্য-নতুন গবেষণা হচ্ছে। এর ফলে, এই অদ্ভুত বুনো ফলের অদ্ভুত শক্তি ও গুণ সমূহ প্রকাশ হচ্ছে। একজন ব্রিটিশ গবেষক লিখছেন, রুদ্রাক্ষের দ্বারা অসম্ভব কাজকেও সম্ভব করা যেতে পারে। ভ্রমণকারী ব্যক্তির পথের বাধা দূর হতে পারে। মানুষ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে। এমনকি তারা বলছেন, রুদ্রাক্ষের দ্বারা জীবনের দিশার পরিবর্তন হতে পারে। আমেরিকার গবেষক শ্রীমতী সুসন একটি গবেষণাপত্রে লিখছেন, রুদ্রাক্ষের প্রয়োগে ইপ্সিত সন্তান লাভ করা যেতে পারে। শারীরিক দুঃসাধ্য রোগ নিরাময় হতে পারে। আসলে রুদ্রাক্ষের যে সব আশ্চর্যগুণ নিহিত আছে, তা এখনও অপ্রকাশিত। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে রুদ্রাক্ষের যে গুণাগুণ বলা হয়েছে সেটা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। হাজার এক রোগে রুদ্রাক্ষের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছের মূল দিয়েও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে অনেক রোগের উপশম করা হয়।

কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, বহু সাধু-সন্তরা গলায়, হাতে এগুলো পরিধান করে থাকেন। এর কারণ কী? এর প্রথম কারণ, যারা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকতে চায়, তাদের এই রুদ্রাক্ষের মালা এক অসাধারণ একাগ্রতা এনে দেয়। চিত্ত ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়। একে আপনি দ্রব্যগুণ বলতে পারেন। একজন স্বামীজি বলছিলেন, একমুখী রুদ্রাক্ষ নিয়ম মতো ধারণ করলে, সে বারো দিনের মাথায় সংসার ত্যাগ করবে। অর্থাৎ সংসারের সঙ্গে তার এমন তিক্ততা সৃষ্টি হবে, যে সে আর সংসারে থাকতে পারবে না। তবে সুখের কথা হচ্ছে, সেই একমুখী রুদ্রাক্ষ অতি দুর্লভ, একমাত্র নেপালে সেটি পাওয়া যায়। তাও সাধারণ মানুষ এটি সংগ্রহ করে কাছে রাখতে পারবে না। এটি নাকি রাজপরিবারের সম্পত্তি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সাধুদের জীবনে রুদ্রাক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। সাধুদের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। সেখানে দু-ধরণের শক্তিই থাকে ভাল খারাপ। এই দুই শক্তির মধ্যে ভালো শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করার ক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয় কারণ, এঁরা যেখানে যা পায় তাই খায়। আপনার শরীরের পক্ষে অনুপযোগী কোনো খাবারের এমনকি জলের ওপরে যদি রুদ্রাক্ষের মালা রাখেন অর্থাৎ মালাটা উঁচু করে ধরেন, তবে উপযুক্ত খাদ্যের ওপরে মালা ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে, খারাপ বা বিষাক্ত খাবার হলে

মালা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ, ঘুরবে। ফলত সাধুরা খাবার গ্রহণে সতর্ক হতে পারবে। রুদ্রাক্ষের মালা ধারণকারী সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি সময় না খেয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ ক্লান্তিহীন জীবনের জন্য, এই মালা খুব উপকারী। এছাড়া এঁরা অনেক সময় জলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। সেখানে সাহসী থাকবার জন্য, এমনকি হিংস্র জীব জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই রুদ্রাক্ষ নাকি অব্যর্থ কাজ করে।

চতুর্থ কারণ, এই মালা ধারণ করলে যেমন একাগ্রতা বাড়ে, তেমনি ধ্যানস্থ অবস্থায় শরীরে কোনো খিদেবোধ থাকে না, ফলত যতক্ষণ ইচ্ছে ধ্যানে নিমগ্ন থাকা যায়।

এই রুদ্রাক্ষের প্রায় ৬৫ ভাগ পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা এবং বোর্নিও দ্বীপে, ২৫ ভাগ পাওয়া যায় নেপালে, সবিশেষে ভোজপুর জেলায় এবং বাকি সব ভারত-বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

পরিপক্ক রুদ্রাক্ষ গাছের শেকড়ে ঝাউ-শিমুল গাছের মতো অধিমূল বা বা ট্রেসিং দেখা যায়। গাছের ফল দেখতে গাঢ় নীল রঙের, যে কারণে এর ইংরেজি এক নাম ব্লুবেরি বিডস্। মূলত রঙটা নীল দেখা যায় স্ট্রাকচারাল টেক্সচার-এর কারণে, যেমন দেখা যায় ময়ূরের পেখমে। এই ফলের বহিরাবরণ সরিয়ে নিলে রুদ্রাক্ষ বেরিয়ে পড়ে, যা হতে পারে বহুমুখী। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই ফল মৃগীরোগীদের জন্যে উৎকৃষ্ট। হিমালয়ের সাধুরা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একে ব্যবহার করেছেন। স্বাদে টক বলে নেপালের মানুষ তৈরি করেছেন আচার-জাতীয় মুখরোচক খাবার। প্রাচীনকালে বসন্ত-গুটির প্রলেপে এবং যক্ষ্মা ও শ্লেষ্মার আধিক্যে ব্যবহৃত হত রুদ্রাক্ষ-ঘষা ক্বাথ।

রুদ্রাক্ষ ফলের এই বহুমূল্য বীজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর মুখ অর্থাৎ লোকিউল বা বীজকোষের বিভাজন-রেখার গভীর দাগই বিশেষ প্রয়োজনীয়। মুখ-সংখ্যা দিয়েই এর গুণের পরিমাপ ও দাম নির্ধারিত হয়। সাধারণত পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষই দেখতে পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। তবে ১ থেকে শুরু করে ৩৮ মুখী পর্যন্ত রুদ্রাক্ষের সন্ধানও পাওয়া যায়। সহজলভ্য নয় বলে ১৪ থেকে ২১ মুখী রুদ্রাক্ষের মূল্য বেশি। গৌরীশঙ্কর, ত্রিযুতি রুদ্রাক্ষ-জগতে পরিচিত হলেও সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। গৌরীশঙ্কর রুদ্রাক্ষ দেখতে দুটি রুদ্রাক্ষ-বীজ একসঙ্গে জোড়া দেওয়া মনে হয়, যাকে শিব ও পার্বতীর প্রতীক বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধদের দেখা যায় কলাবতীর শক্ত বীজের সঙ্গে রুদ্রাক্ষের দানা মিশিয়ে সংকর মালা তৈরি করতে। যাবতীয় নানামুখী রুদ্রাক্ষের মধ্যে সবচেয়ে দুর্লভ বোধ হয় সুশ্রী এবং গোলাকার একমুখী রুদ্রাক্ষ, যা আজকাল মেলা ভার। শোনা যায় ভারতের এক ধনী কোম্পানির মালিকের কাছে ৭০ লক্ষ টাকা দামের একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে।

অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মানবকুলে রুদ্রাক্ষের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় সরবরাহ নেই। আমাদের প্রতিবেশি রাজ্য নেপালে সবচেয়ে বেশি রুদ্রাক্ষের চাষ হয়, কিন্তু তা প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট নয়। রুদ্রাক্ষের সব বীজকোষে বীজ থাকে না, প্রায় ২০ শতাংশ শূন্য থাকে। শক্ত বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের জন্যে সময় লাগে ৬ মাস। নেপালের মতো উপযুক্ত আবহাওয়া না পেলে এই গাছ তেমন ফলবতী হতে পারে না। উভলিঙ্গী ফুল হওয়া সত্ত্বেও এসব গাছে ফুল ধরতে ৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত লেগে যায়। একটা গাছে যদি ফল ধরে হাজার দুয়েক, তবে তার প্রায় অর্ধেক ঝরে পড়ে অপরিপক্ক অবস্থায়। ফলে চাহিদা মেটাতে অসাধু উপায় অবলম্বন করতে হয়।

এখন বিভিন্ন ধাতুর গুঁড়ো মিশিয়ে উৎকৃষ্ট আঠা দিয়ে আজকাল তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম রুদ্রাক্ষের মালা, বাজুবন্ধ ও ব্রেসলেট, যা সাধারণ দৃষ্টিতে বোঝা দুষ্কর। তবে বীজকোষের বিভাজন রেখাগুলো সূক্ষ্মভাবে দেখলে অনেকটা টের পাওয়া যায়। এসব নকল রুদ্রাক্ষ গরম জলে সেদ্ধ করলে আঠা খুলে যায়।

কৃত্রিম রুদ্রাক্ষ তৈরির আর একটি বিশেষ উপাদান হল গ্যালালিথ। এটা তৈরি হয় দুধের ক্ষীরের সঙ্গে ফরম্যালডিহাইড মিশিয়ে। গ্যালা শব্দের অর্থ দুধ আর লিথ অর্থ পাথর, যে-কারণে এর আর এক নাম মিল্ক-স্টোন। এই পাথর এক সময় প্রচুর ব্যবহৃত হত বোতাম,

চিরুনি ইত্যাদি তৈরিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুধের আকাল পড়াতে গ্যালালিথ-এর ব্যবহার কমে যায় কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না। জলনিরোধক, শক্ত, সহজে রং গ্রহণকারী এবং দীর্ঘস্থায়ী এই বস্তুকে ধারালো হাতিয়ার দিয়ে কেটে তৈরি হচ্ছে রুদ্রাক্ষ। এসব হল কৃত্রিম রুদ্রাক্ষ, কিন্তু ভদ্রাক্ষ নামে আর এক প্রকারের বীজের কথা শোনা যায় যা দেখতে না কি অবিকল রুদ্রাক্ষের মতো, কিন্তু কার্যকারিতায় এক নয়। যে-কোনো রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা করার একটি উপায় হল, একটি দানা সুতোয় ঝুলিয়ে দুপাশে তামার মুদ্রা রাখলে চৌম্বকীয় আবেশে দানাটা একটু ঘুরে যায়। এই চৌম্বকীয় আবেশই রুদ্রাক্ষের মূল গুণ, যার জোরেই এত কেরামতি।

বিভিন্ন শাস্ত্রে এক থেকে চোদ্দমুখী পর্যন্ত রুদ্রাক্ষ ব্যবহারের যে নিয়ম, আচার ও অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে রুদ্রাক্ষ যে এক থেকে চোদ্দমুখী পর্যন্ত হয়ে থাকে সে-বিষয়ে বিশদে বলা হয়েছে। মুখ অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখলে রুদ্রাক্ষের গায়ে চোদ্দটি পর্যন্ত শিরা বা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। আসলে রুদ্রাক্ষটি যদি ঠিক মাঝ বরাবর কাটেন তবে দেখতে পাবেন সেখানে চোদ্দটি গর্ত আছে। আর গর্তের মধ্যে চোদ্দটি বীজ আছে। যা থেকে রুদ্রাক্ষ গাছ হতে পারে। তো এক-একটা রুদ্রাক্ষ ফলের মধ্যে এমনি এক থেকে চোদ্দটি পর্যন্ত গর্ত দেখা যায়। আপনি যদি রুদ্রাক্ষটাকে এক্সরে করেন, তো দেখতে পাবেন, রুদ্রাক্ষের মধ্যে এমনি সব গর্ত আছে। যে রুদ্রাক্ষে যতগুলো গর্ত সেই অনুযায়ী বাইরে দাগ দেখা যায়। বা বলা যেতে পারে, সেই রুদ্রাক্ষের ততগুলো কোয়া। এই শিরা বা কোয়া অনুযায়ী রুদ্রাক্ষকে ১৪ ভাগে ভাগ করা হয়। এর এক-একটার এক এক রকম গুণ বা শক্তি আছে। যেমন :

একমুখী রুদ্রাক্ষ

রুদ্রাক্ষের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রেণিকে 'শিব' নামে অভিহিত করা হয়। রুদ্রাক্ষের যেসব গুণাগুণের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সে সমস্তই এ শ্রেণির রুদ্রাক্ষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। খুবই দুর্লভ শ্রেণির রুদ্রাক্ষ এবং অত্যন্ত মূল্যবানও বটে। বলা হয়, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে মানুষ অপরাজেয় হয়। বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঘটে। রুদ্রাক্ষের উজ্জীবন করতে হয়, 'ও ওইং মন্ত্র ১০৮ বার উচ্চারণ করে ডান বাহুতে বা কণ্ঠে এ রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে লোকপ্রভাবিনী শক্তির স্ফুরণ ঘটে। রাশিচক্রে রবিগ্রহ, পাপপীড়িত, পাপ গ্রহদৃষ্ট, নীচস্থ পাপযুক্ত বা যে-কোনোভাবে পীড়িত হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কারপূর্বক জপ করে ধারণ করলে রবিগ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট হয়। আগেই বলা হয়েছে এটি দুর্লভতম রুদ্রাক্ষ। এই একমুখী রুদ্রাক্ষের দেবতা স্বয়ং শিব। বেশিরভাগ রুদ্রাক্ষ পঞ্চমুখী অর্থাৎ পাঁচটি গর্তসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এটিতে কেবলমাত্র একটি গর্ত থাকে। বলা হয়ে থাকে, এই একমুখী রুদ্রাক্ষের দর্শনেও পুণ্য হয়। পূজন বা ধারণ করতে পারলে তো কথাই নেই। একমুখী রুদ্রাক্ষ যিনি কাপাল জোরে পেয়ে গেছেন, তিনি যে সৌভাগ্যশালী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইনি জীবনের সমস্ত বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত থাকেন। আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান ও অনুভূতি তার বিনা আয়াশে হয়ে থাকে। মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে এই একমুখী রুদ্রাক্ষ লাভ করে থাকেন। এটি পাবার পরে, জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না। যাঁর কাছে এটি আছে, এমনকি যিনি এর পুজোঅর্চনা করবার মতো সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তিনি অবশ্যই নমস্য। শোনা যায়, অবতার গোরখনাথের গুরুদেব, কৌল-অবধূত মৎস্যেন্দ্রনাথের কাছে, অর্থাৎ নেপালের পশুপতিনাথের মন্দিরে এই একমুখী রুদ্রাক্ষ ছিল, এবং এখনো সেটা সুরক্ষিত আছে। ওঁ হ্রীংনমঃ।

গৌরীশঙ্কর রুদ্রাক্ষ ও গণেশরুদ্রাক্ষ:

এই একমুখী রুদ্রাক্ষের সঙ্গে, আরও দুটি রুদ্রাক্ষের কথা বলা দরকারি, যা প্রকৃতির এক অপূর্ব এবং আশ্চর্য্য সৃষ্টি। যার মধ্যে একটি হচ্ছে, গৌরীশঙ্কর রুদ্রাক্ষ, ও অন্যটি গণেশ

রুদ্রাক্ষ। এই রুদ্রাক্ষ দুটি প্রাকৃতিক ভাবে একটু অন্য রকম। প্রথমটি অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর রুদ্রাক্ষ আসলে দুটি রুদ্রাক্ষের প্রাকৃতিক মিশ্রণ। প্রাকৃতিক ভাবে দুটি রুদ্রাক্ষ একত্রে জোড়া থাকে। এটি বিভিন্নমুখী হতে পারে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক গর্ত থাকতে পারে এর ভেতরে। ভাগ্যক্রমে যদি এটি দুটি শিরা ওয়ালা হয় তবে এটি একমুখী রুদ্রাক্ষের মতো কাজ করে। গৌরীশঙ্কর রুদ্রাক্ষের পুজো হয়। এটি ধারণযোগ্য নয়।

গণেশ রুদ্রাক্ষ সাধারণত একটাই রুদ্রাক্ষ, কিন্তু এই রুদ্রাক্ষের গায়ে একটি গনেশের শুঁড়ের মতো দেখতে পাওয়া যায়। এটিও বিভিন্নমুখী হতে দেখা যায়, বেশিরভাগই ৫ মুখী। তবে এটি যে-কোনো মুখী হতে পারে। আসলে এটি যতমুখী হবে সেই অনুযায়ী ফল দান করবে। এটির দেবতা শ্রী শ্রীগণেশ। এই গণেশ রুদ্রাক্ষের সাধারণত পুজো করা হয়। এটি ধারণ করা হয় না।

দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ

এজাতীয় রুদ্রাক্ষকে 'হরগৌরী' নামে অভিহিত করা হয়। এ রুদ্রাক্ষ ধারণে মনের একাগ্রতা, জীবনে শান্তি এনে দেয়। অজ্ঞাতসারে গোহত্যা-জনিত পাপের স্খলন হয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সম্পর্কে চেতনার সঞ্চার করে। মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে এই রুদ্রাক্ষের উজ্জীবন হয়। মন্ত্র পাঠ করে ডান হাতে বা কণ্ঠে এ রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ত্রিজন্মসঞ্চিত পাপরাশি দূরীভূত হয়। রাশিচক্রে কেতুগ্রহ নীচস্থ, পাপপীড়িত বা যে-কোনোভাবে অশুভ হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক 'ওঁ শ্রীং' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে ধারণ করলে কেতুগ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট হয়।

ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ

এজাতীয় রুদ্রাক্ষের নাম 'অগ্নি'। অতীত পাপ বিনষ্ট করে, মানুষের সৃজনীশক্তির বিকাশ সাধন করে, চিরকর্মচঞ্চল জীবনীশক্তিকে উন্নীত করে, ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ করে। মন্ত্রপাঠ করে দু'বাহুতে ধারণ করলে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হয়। রাশিচক্রে মঙ্গল বা যে-কোনোভাবে পীড়িত হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কারপূর্বক 'ওঁ ধ্রুং ধ্রুং মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে ধারণ করলে মঙ্গল গ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট হয়।

চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ

জ্যোতিষশাস্ত্রে এর নাম 'ব্রহ্মা'। মনের ক্রিয়াকলাপের ওপরে এ শ্রেণির রুদ্রাক্ষের প্রভাব চমৎকার। সে-কারণে উন্মত্ততা, অনিদ্রা, বিষাদময়তা ইত্যাদি মানসিক রোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা হয়। এ রুদ্রাক্ষ ধারণে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। তুচ্ছ বিষয়ে মানসিক অস্থিরতার উপশম হয়, মানসিক অবসাদ দূর হয়, উদ্বেগ, ভয়, খিটখিটে স্বভাব ও আত্মহনন-চিন্তা ইত্যাদির প্রকোপ হ্রাস করে, বক্তৃতা-ক্ষমতা, কর্মতত্পরতা ও বুদ্ধি-বৃদ্ধির উন্মেষকারক এ রুদ্রাক্ষ মন্ত্রপাঠ করে কণ্ঠে ধারণ করতে হয়। রাশিচক্রে চন্দ্রগ্রহ নীচস্থ, পাপযুক্ত ও পাপপীড়িত হয়ে দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, অষ্টমে-দ্বাদশে অবস্থান করলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কার করে ওঁ হ্রীং হ্রং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ডান হাতে ধারণ করলে চন্দ্রগ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট করে বিভিন্ন শান্তি ও সুখ আনয়ন করে।

পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ

সর্বাধিক পরিচিত এবং সর্বত্রই এ রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। এ রুদ্রাক্ষ দুই শ্রেণির হয়ে থাকে। এর নাম 'কালাগি রুদ্র'। এ রুদ্রাক্ষ ধারণে নিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণ ও নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের পাপ অপনোদন হয়, মানসিক প্রশান্তি আসে। শিবের পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র সহযোগে সন্ধ্যাকালে দেহের যে-কোনো অংশে ধারণ করলে অখাদ্য ভোজনজনিত পাপ নষ্ট হয়। রাশিচক্রে শনিগ্রহ, রবিযুক্ত হলে লগ্নে, দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে, দ্বাদশে অবস্থান করলে বা যে কোনোভাবে শনিগ্রহ পাপপীড়িত, নীচস্থ ও অশুভ গ্রহযুক্ত হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক 'ওঁ হ্রীং মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ধারণ করলে শনিগ্রহের

সমস্ত অশুভ ফল নষ্ট হয়।

ষড়মুখী রুদ্রাক্ষ

এজাতীয় রুদ্রাক্ষের নাম 'কার্তিকেয়'। ছাত্রদের পক্ষে ও যারা দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন তাদের পক্ষে এ রুদ্রাক্ষ বিশেষ উপকারী। জ্ঞানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ রুদ্রাক্ষর চমত্কার কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়। মন্ত্রযোগে রুদ্রাক্ষ উজ্জীবন করা হয়। ভূত-প্রেতাদি দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিকাররূপে ধারণীয়। মানসিক অবসাদ, স্বভাবের উগ্রতা ও নানা রোগের উপকারকারী এ রুদ্রাক্ষ। রাশিচক্রে শুক্র কন্যায় নীচস্থ, অশুভ গ্রহযুক্ত দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশে অবস্থান করলে বা অশুভ হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক 'ওঁ ওইং হ্রীং মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ধারণ করলে শুক্রগ্রহের সমস্ত অশুভ ভাব নষ্ট হয়।

সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষ

এ শ্রেণির রুদ্রাক্ষের নাম অনন্ত মাতৃকা। এ রুদ্রাক্ষ ধারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থ মান, যশ ও প্রতিপত্তি লাভের পথ সুগম হয়ে থাকে। রাশিচক্রে রাহুগ্রহ রবি ও চন্দ্র যুক্ত হয়ে লগ্নে দ্বিতীয়ে, চতুর্থে, পঞ্চমে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে, নবমে, দশমে এবং দ্বাদশে অবস্থান করলে বা কোনোভাবে অশুভ হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উক্ত রুদ্রাক্ষ উজ্জীবন করতে হয়। "ওঁ হ্রীং মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর উক্ত রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে ধারণ করলে রাহু গ্রহের সমস্ত কুফল বিনষ্ট হয়।

অষ্টমুখী রুদ্রাক্ষ

এই রুদ্রাক্ষের দুটি নাম বিনায়ক ও বটুকভৈরব। শনিগ্রহ ও রাহুর অশুভ প্রভাব খর্ব করে। এ রুদ্রাক্ষ ধারণে হঠাৎ আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। দুষ্কৃতীকারীদের হাতে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাশিচক্রে শনি ও রাহু অশুভ থাকলে উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক পুরুষের ডান বাহুতে এবং স্ত্রীলোকের বাম বাহুতে ধারণীয়। 'ও রুং রং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর উক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সমস্ত অশুভ প্রভাব দূরীভূত হয়।

নবমুখী রুদ্রাক্ষ

এ রুদ্রাক্ষের নাম মহাকাল ভৈরব। ধারণে জীবনে উন্নতির সূচনা যায়, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জয়লাভ করা হয়। দুর্ঘটনা ও হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। ধারণের পূর্বে মন্ত্র উচ্চারণ করে এ রুদ্রাক্ষের উজ্জীবন বা প্রাণসঞ্চার করেনাতে হয়।

মন্ত্রপাঠের পর উচ্চারণ করতে হয়। বুদ্ধিবৃত্তিজনিত কাজকর্মের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রচুর সুফল দান করে এ রুদ্রাক্ষ। রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহ মকরে নীচস্থ, মকরস্থানে অবস্থান করলে, বা মকরস্থ হলে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করলে কিংবা কোনোভাবে অশুভ হলে এ গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কারপূর্বক 'ওঁ হ্রং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে এবং স্ত্রীলোকের বামবাহুতে ধারণ করলে সকল অশুভ বিনাশ হয়।

দশমুখী রুদ্রাক্ষ

এ শ্রেণির রুদ্রাক্ষ দুর্লভ। এর নাম মহাবিষ্ণু। মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, খ্যাতি, সম্মান, পার্থিব সমৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সহায়ক এ রুদ্রাক্ষ। প্রেতাদি কর্তৃক অনিষ্টকর প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। রাশিচক্রে বুধ গ্রহ নীচস্থ শত্রুযুক্ত ও শত্রুক্ষেত্রগত, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করলে বা কোনোভাবে পীড়িত হলে উক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সংস্কার করে ও হ্রীং মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ধারণ করতে হয়। মন্ত্রপাঠ ও জপ করে জপের পর উক্ত রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে ধারণ করলে সমস্ত অশুভ দূরীভূত হয়।

একাদশমুখী রুদ্রাক্ষ

এটি একটি বিশেষ জাতের রুদ্রাক্ষ। এর নাম মহামৃত্যুঞ্জয়। মেয়েদের নানা অসুখের ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সুফল প্রদানকারী, আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটলে, আত্মহনন চিন্তা এসে মন ও মেজাজ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে উঠলে এ রুদ্রাক্ষ ধারণে তার উপশম হয়। মন্ত্র উচ্চারণযোগে রুদ্রাক্ষ উজ্জীবিত করে ধারণ করা প্রয়োজন। রাশিচক্রে শুক্র ও মঙ্গল অশুভ থাকলে মন্ত্রে যথাবিধি সংস্কার করে 'ওঁ হ্রীং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ডান হাতে ধারণ করলে সমস্ত অশুভ প্রভাব নাশ হয়।

দ্বাদশমুখী রুদ্রাক্ষ

এর নাম অর্ক বা আদিত্য। এ রুদ্রাক্ষ রবি ও রাহুর অশুভ প্রভাবকে প্রশমিত করে। রবি যখন মকরে বা কুম্ভরাশিতে অবস্থিত হয়ে অশুভদশা প্রাপ্ত হয় তখন এ রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সকল কুফল নষ্ট হয়। ব্যবসায়িক মন্দা বা অসাফল্য নিবারণ করতে মন্ত্র সহযোগে এ রুদ্রাক্ষকে উজ্জীবন করে ধারণ করতে হয়। 'ওঁ হ্রাং হ্রীং মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর রুদ্রাক্ষটি কণ্ঠে ধারণ করলে সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়।

ত্রয়োদশমুখী রুদ্রাক্ষ

এর নাম কাম। এর ধারণে সর্বভাবেই কামনীয় বিষয়ের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। এ রুদ্রাক্ষ ধারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হয়। চিন্তামণি মন্ত্র সহযোগে এ রুদ্রাক্ষ উজ্জীবন করতে হবে। অতঃপর 'ওঁ ক্ষৌং নমঃ' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ডান হাতে ধারণ করলে সমস্ত পাপ দূর হয় ও সকল মনোরথ সিদ্ধ হয়। এর ধারণে চন্দ্র ও শুক্রের অশুভ প্রভাব নাশ হয়ে থাকে।

চতুর্দশমুখী রুদ্রাক্ষ

এই রুদ্রাক্ষ শ্রীকণ্ঠ নামে পরিচিত। এই রুদ্রাক্ষ ইন্দ্রিয় সংযমে সাহায্য করে। পঞ্চমুখ হনুমানমন্ত্র সহযোগে একে উজ্জীবিত করতে হয়। মন্ত্রপাঠ করে বীজমন্ত্র জপ করে ধারণ করলে শুক্রগ্রহের সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়। ওঁ তমাং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর ধারণ করলে বৃহস্পতি ও রবির সমস্ত অশুভ প্রভাব নষ্ট হয়ে থাকে।

স্কন্দপুরাণানুযায়ী রুদ্রাক্ষ ধারণের কিছু নিয়ম ও বিধি আছে। সেগুলি না মেনে ধারণ করলে ফল তো দূরের কথা, উলটে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। শুদ্ধ চিত্তে সঠিক মন্ত্রোচ্চারণাদি করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে তার সুফল অবশ্যই মেলে। আর অন্যদিকে যেহেতু নকল রুদ্রাক্ষের বা কুলবীজের মালার সংখ্যাই অধিক, প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে প্রতি মুহূর্তে। তাই বিশেষজ্ঞের মতে রুদ্রাক্ষ ঠিকমতো না চিনে ধারণ করা উচিত নয়।

মহাভারতের সেই 'স্বর্গের সিঁড়ি'-র খোঁজে

মহাভারতে মহাপ্রস্থানের যে পথে যুধিষ্ঠির গিয়েছিলেন সেই পথের খোঁজ ধরে আমরা যাব স্বর্গের সেই সিঁড়ি খুঁজতে। উত্তরাখণ্ড দেবভূমি। আর পাণ্ডবদের সেই পথ অনুসরণ করে এই উত্তরাখণ্ডের সতপন্থের পথে যাব আমরা। সতপন্থের পথে যাওয়ার আগে আমরা একটু মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথে পর্বটা একটু ঝালিয়ে নিই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলে গেলেন। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংসকাল শুরু হয়ে গেল। বলরাম যোগাসনে বসে দেহত্যাগ করলেন। গান্ধারীর অভিশাপ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণও জরাব্যাধের তিরের আঘাতে দেহত্যাগ করলেন।

দারুক সারথির মাধ্যমে খবর পেয়ে অর্জুন দ্বারকায় পৌঁছোলেন। গিয়ে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই ভাই-ই দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পারলৌকিক ক্রিয়া অর্জুন নিজে সম্পন্ন করলেন এবং হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের শোকে পাণ্ডবদের আর রাজ্য শাসনের কথা মনে ছিল না। যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে সবাই ঠিক করলেন যে তাঁরা মহাপ্রস্হানে যাবেন। দ্রৌপদীর জেদে অগত্যা তাঁকেও সঙ্গে নিতে হল।

পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার দিয়ে স্বর্গপথে রওনা হলেন পাণ্ডবরা। পূর্বমুখে তাঁরা অগ্রসর হলে অগ্নিদেব এসে পথ রোধ করে কিছু খাদ্য চাইলে অর্জুন তাঁর গান্ডিব ধনুকসহ সব দিব্য অস্ত্র অগ্নিকে দিয়ে দিলেন।

তারপর একের পর এক বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী অতিক্রম করে পাণ্ডবেরা মেঘনাদ পর্বতে গেলেন। সেখানে দানবদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁরা কেদার পর্বতে আরোহণ করলেন। তারপর উত্তরমুখে রওনা হলে পথে এক ভীষণা রাক্ষসী তাঁদের পথ আটকালে ভীম অবলীলাক্রমে রাক্ষসীকে নিপাত করেন। পাণ্ডবরা ভদ্রকালী পর্বতে এলে এখানকার কালীমূর্তি ভদ্রকালী যুধিষ্ঠিরকে বর প্রার্থনা করতে বললে যুধিষ্ঠির জোড়হাতে কালীর নিকট কলিকালে জাগ্রত থাকার বর চাইলে মা কালী বললেন, তথাস্তু।

এর পর তাঁরা হরিপর্বতে গেলে সেখানকার হিমশীতল পরিবেশে প্রচণ্ড ঠান্ডায় দ্রৌপদী কাহিল হয়ে পড়লেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ করলেন। ভীম তা দেখে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "কোন পাপে দ্রৌপদীর মৃত্যু হল?" ধর্মরাজ উত্তরে ভীমকে বললেন, "পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি থাকার পাপে দ্রৌপদীর মৃত্যু হল।"

আবার শুরু হল তাদের পথচলা। বদরিকাশ্রমে গিয়ে তাঁরা দেখা পেলেন দ্রোণপুত্র অমর অশ্বত্থামার। সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর সহদেবের মৃত্যু হল। ভীম আবার যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "জ্যোতিষীরূপে ভাই সহদেবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই জানা ছিল। তাও সে কেন মারা গেল?"

উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, "পাশা খেলায় আমাদের হার হবে জেনেও সে আমাদেরকে সাবধান করেনি। বারণাবতে আমাদের পুড়িয়ে মারা হবে জেনেও আমাদের সতর্ক করে দেয়নি—এই ছিল তার পাপ।"

এর পর তাঁরা গেলেন চন্দ্রকালী পর্বতে। সেখানে নকুলের মৃত্যু হল। পরবর্তী বিশ্রামস্হল নন্দীঘোষ পর্বতে অর্জুন দেহত্যাগ করলেন। ভীম জানতে চাইল নকুল আর অর্জুনের মৃত্যুর কারণ। প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন-"কর্ণের সঙ্গে যখন আমার যুদ্ধ হয় তখন নকুল আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম দেখেও আমার সাহায্যে সে অগ্রসর হয়নি। এই ছিল তার পাপ।" আর অর্জুনের পাপ হল-"সে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসত দ্রৌপদীকে। আর সব কিছুকে ও হেয় জ্ঞান করত।"

চলতে চলতে এর পর সোমেশ্বর পর্বতে মৃত্যুবরণ করলেন ভীমসেন। হাহাকার করতে লাগলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। এক এক করে স্মরণ করতে লাগলেন ভীমের বীরত্ব কাহিনি। তারপর তাঁর মনে হল ভীম এতক্ষণ তাকে জিজ্ঞেসা করছিল কে কোন পাপে মারা গেল,

কিন্তু ভীম কেন মারা গেল? অমনি ধর্মরাজের মনে পড়ল-পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যবস্তুর ওপর প্রচুর লোভ ছিল ভীমের। খাবার জিনিস দেখলে সে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারত না। খাবারের লোভই কাল হল ভীমের।

এবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির একা ধীরে ধীরে স্বর্গের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল একটি কুকুর। গন্ধর্ব পর্বত আরোহণের সময় হিমালয়বাসী মুনি-ঋষিগণ এক এক করে দেখা করতে আসলে তিনি প্রত্যেককে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

এইভাবে চলতে চলতে স্বর্গের দ্বারদেশে উপনীত হলেন যুধিষ্ঠির। দ্বারপাল দেবরাজ ইন্দ্রকে সংবাদ দিলে, ইন্দ্র রথ নিয়ে এলেন। কিন্তু দেবরাজের কি ইচ্ছা হল, তিনি একবার যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিনি যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত হলেন।

কুকুরের রূপ ধরা ধর্ম, ব্রাহ্মণকে কামড়াতে গেলে ব্রাহ্মণ হাতের লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে কুকুরটিকে প্রহার করলেন। তখন কুকুররূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণের প্রহার থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে বললেন। তখন যুধিষ্ঠির হাতজোড় করে কুকুরটিকে না মারতে বলায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রাগ আরও বেড়ে গেল। ব্রাহ্মণ রেগে কুকুরটিকে বললেন, "আজ আমার হাত থেকে তোর পরিত্রাণ নাই।" যুধিষ্ঠির তখন কুকুরটির প্রাণভিক্ষা চেয়ে তার সঞ্চিত পুণ্যের অর্ধেক ব্রাহ্মণকে দান করলেন।

ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের মহানুভবতা দেখে। যুধিষ্ঠির এও জানিয়ে দিলেন তিনি স্বর্গে গেলে তার সঙ্গে কুকুরটিও যাবে। কারণ হিসেবে যুধিষ্ঠির জানিয়ে দেন এই কুকুরটি শেষ অবধি তার সঙ্গে এসেছে। সে তার শরণাগত। তিনি তাকে ছাড়তে পারবেন না। যুধিষ্ঠির জানান কুকুরটির জন্য যদি তাকে মর্ত্যে থেকে যেতে হয়তো তিনি তার জন্যও প্রস্তুত। যুধিষ্ঠির ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তখন ধর্ম নিজের রূপধারণ করল। নিজের পরিচয় দিলে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন। ধর্ম বললেন, "বৎস তুমি আমার পুত্র। আমার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তোমার জন্ম।" ততক্ষণে পাশে দাঁড়ানো একজনের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনি দেবরাজ ইন্দ্র। ইনি রথ নিয়ে এসেছেন তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। পদব্রজে অনেক ক্লেশ সহ্য করেছ তুমি। পুত্র, এবার রথে আরোহণ কর।" দেবরাজ ইন্দ্রের ইঙ্গিতে সারথি রথ নিয়ে এলে সকলে তাতে আরোহণ করে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হলেন। স্বর্গপুরে বিরাট সংবর্ধনার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে স্বাগত জানানো হল।

সশরীরে একমাত্র যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গিয়েছিলেন। আমরা যুধিষ্ঠিরের পথ ধরেই হাঁটব। এখন স্বর্গের পথে যাওয়া যাক।

সেই চিরপরিচিত হরিদ্বার। হড় কি পৌরি ঘাটে সন্ধ্যারতি দেখে সেই রাতটা হরিদ্বারে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ুন বদ্রীনাথের পথে। হৃষীকেশ লছমনঝুলা, রামলা হয়ে একে একে পার হয়ে যান দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, একটি যাচ্ছে কেদারনাথের দিকে। অন্যটি বদ্রীনাথের দিকে। আমরা যাব বদ্রীনাথের পথে। এই পথে আপনাকে সবমিলিয়ে পার হতে হবে পাঁচটি প্রয়াগ। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও শেষে বিষ্ণুপ্রয়াগ।

পঞ্চপ্রয়াগ অতিক্রম করতে করতে অলকানন্দার গা বেয়ে পৌঁছে যান বদ্রীনাথ। হরিদ্বার থেকে ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। দূরত্ব জাতীয় সড়ক-৫৮ ধরে প্রায় ২৭৬ কিমি। হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ-শ্রীনগর-রুদ্রপ্রয়াগ-কর্ণপ্রয়াগ -চামোলি-গোপেশ্বর হয়ে জোশীমঠ। মাঝেমধ্যে শুধু একটু যাত্রাবিরতি। রাস্তার ধারে কিছু খেয়ে নিন। আপনি চাইলে জোশীমঠে একটা দিন থেকে যেতেও পারেন।

গাড়োয়াল হিমালয়ের কোলে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার এক পবিত্র শহর জোশীমঠ। পাহাড়ি এই শহরটি সাগরপৃষ্ঠ থেকে ৬১৫০ ফুট উচ্চতায়। আগে অঞ্চলটির নাম ছিল

জ্যোতির্মঠ। পরে লোকমুখে হয়ে যায় জোশীমঠ। জ্যোতির্মঠ হল 'উত্তরামণ্য মঠ' বা বলা যেতে পারে উত্তরের মঠ। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চার মঠের মধ্যে অন্যতম। আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চারপ্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জোশীমঠ, পুরী, দ্বারকা ও শ্রীনগিরি।

আদি শঙ্করাচার্যের সনাতন নীতি মতে জ্যোতির্মঠ হল বেদের অথর্ববেদ'। কথিত আছে আদি গুরু শঙ্করাচার্য উত্তরাখণ্ড যাত্রাকালে প্রথম পৌঁছোন জোশীমঠ। শঙ্করাচার্যের আশ্রমের নামও তাই জ্যোতির্মঠ। এখানেই শঙ্করাচার্য ব্যাসমুণির বেদান্ত দর্শনের ওপর ভাষ্য দেন। এখান থেকেই শঙ্করাচার্য বদ্রীনারায়ণ ধাম দর্শনের জন্য রওনা হন। সেখানে পৌঁছে বদ্রীনারায়ণ শিলার ওপর মূর্তি এবং মন্দির স্থাপন করেন।

জোশীমঠ ব্যস্ত পাহাড়ি শহর। খুবই প্রাচীন শহর। কার্তিকেয় পুরাণেও জোশীমঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। পার্বতীপুত্র কার্তিকের নামে এই শৈল শহরটির নাম ছিল কার্তিকেয়পুরা। ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বৃক্ষ 'কল্পবৃক্ষ' গাছটিরও সন্ধান পাওয়া যায় এই জোশীমঠেই। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে ১২০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন এই কল্পবৃক্ষটি।

অলকানন্দা ও ধৌলিগঙ্গার অপরূপ মিলিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে জোশীমঠে। চারপাশে হিমালয়ের উদাত্ত প্রকৃতি। সুউচ্চ গিরিশোভিত দৃশ্যপট আর নদীসংগমের দিকে তাকিয়ে শুধু অপার মুগ্ধতায় চেয়ে থাকা।

জোশীমঠে প্রচুর দেবদেবীর মন্দির, আছে। হনুমান, গৌরীশঙ্কর, গণেশ, সূর্য, নৌ-দেবীর মন্দির রয়েছে। অষ্টম শতকে নির্মিত আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠটি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ মঠ। এখানে বদ্রীনারায়ণ ও রাজেশ্বরী দেবীর মন্দিরও রয়েছে। অদূরে একটি পবিত্র গুহার সন্ধান পাওয়া যায়। কথিত আছে সেই গুহায় আদি শঙ্করাচার্য তপস্যা করতেন। ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার তথা নরসিংহরূপী নারায়ণমূর্তি সংবলিত উল্লেখযোগ্য মন্দির নরসিমা মন্দির। শতাব্দী প্রাচীন মন্দির। এখানে নরসিমা ভগবানের মূর্তিটির দক্ষিণ হস্ত চুলের মতো সরু। জনশ্রুতি, এমন একটা সময় আসবে যখন সেটি ভেঙে বা নষ্ট হয়ে যাবে—তখন বদ্রীনাথের কাছে জয় বিজয় পর্বত দুটিও ধূলিসাৎ হবে এবং বদ্রীনাথধামের বদ্রীনারায়ণ মূর্তিটিও অদৃশ্য হয়ে যাবে বর্তমান মূল মন্দির থেকে। প্রবল তুষারপাত ও শৈত্যর দিনে যখন বদ্রীনারায়ণ মন্দির বন্ধ থাকে ছ'মাসের জন্য—সেই সময়টুকু এই নরসিংহ মন্দিরেই ভগবান বদ্রীনারায়ণের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। জোশীমঠকে সেই জন্য বদ্রীনারায়ণের 'শীতকালীন প্রার্থনাস্থলও' বলা হয়ে থাকে।

স্থানীয় পুরোহিত ও ধর্মগুরু সম্প্রদায় মনে করেন, ভবিষ্যতে যখন বদ্রীনারায়ণ মন্দিরটি থাকবে না, তখন জোশীমঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত শালগ্রাম শিলার আদলে 'ভবিষ্য বদ্রী' হিসেবে পুন:প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস, বর্তমান কেদারধামের মূর্তিও একদিন অনুরূপ ভাবেই অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং 'ভবিষ্য কেদার মন্দির' নামে এই স্থানে পুনর্জন্ম হবে ছোটো এক শিবলিঙ্গ হিসেবে।

স্থানীয়রা হিন্দিতে কথা বললেও স্থানীয়দের উচ্চারণে গাড়োয়ালি টান রয়েছে। প্রচুর হোটেল, রিসর্ট, দোকানপাট, মন্দির নিয়ে জমজমাট জোশীমঠ। এখান থেকেই বদ্রীনাথধাম এবং গুরুগোবিন্দ ঘাটের ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার জাতীয় উদ্যানে যাওয়ার সড়কপথ। পাহাড় সংলগ্ন হোটেলগুলির অবস্থানও বেশ সুন্দর। প্রায় প্রতিটি হোটেলের ঘরের জানালা বা বারান্দা থেকেই হিমালয়ের চুড়ো দৃশ্যমান।

জোশীমঠ থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে আছে তপোবন। এই মনোরম অঞ্চলটির কথা অনেকেই জানেন না। প্রাকৃতিক একটি উষ্ণ প্রস্রবনও আছে সেখানে। তপোবনের সামনেই প্রবাহিত ধৌলিগঙ্গা। অসামান্য তার রূপ। এই পাহাড়ি শহরাঞ্চলগুলিতে কিছুটা বেশি সময় পর্যন্ত সূর্যালোক থাকে। তার পরই হঠাৎ করে নামে অন্ধকার। রাতের জোশীমঠ মায়াবী। দূরের জনপদের আলোগুলো জানান দেয় তার অস্তিত্বের রাতে জোশীমঠ একেবারে নিরালা নিঝুম এক চুপকথার শহর।

পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা ঘরবাড়ির ভেতর জ্বলা আলোগুলোকে জোনাকি বলে মনে হয়।

ভারতীয় সেনা ১৯৬২ সালের ইন্দো-চায়না যুদ্ধের সময় থেকেই বদরিকাশ্রম তথা এই পুরো গন্ধমাদন রেঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন।

তীর্থমাহাত্ম্যের দিক থেকে বদ্রীনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ। উত্তরাখণ্ডের চারধামের অন্যতম এই বদ্রীনাথ। বাকি তিনটি ধাম হল কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী। উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত বদ্রীবিশাল। কালো পাথরের তৈরি ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি এখানে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে রয়েছে। মন্দিরের সামনে দিয়ে বয়ে গিয়েছে অলকানন্দা ও পাশেই তপ্তকুণ্ড পঞ্চশীলা। অর্থাৎ নারদ, নৃসিংহ, বরাহ, গরুড়, ও মার্কণ্ডেয় এবং পঞ্চতীর্থ, যথা ঋষিগঙ্গা, কুর্মধারা, নারদকুণ্ড, প্রহ্লাদকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড মূল মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে। মন্দিরটি ১৫ মিটার উঁচু।

তবে বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই মন্দিরের প্রধান দেবতা বদ্রীনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার থেকে অনুমান করা হয় যে বৈদিক যুগে এই মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কয়েকটি উপাখ্যান অনুসারে, এই মন্দিরটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত একটি বৌদ্ধ ধর্মক্ষেত্র ছিল। নবম শতাব্দীতে আদি শঙ্কর এটিকে একটি হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। এই মন্দিরের স্থাপত্য বৌদ্ধবিহারগুলির স্থাপত্যের অনুরূপ। মন্দিরের সুচিত্রিত প্রবেশদ্বারটিও বৌদ্ধ মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য। তা দেখেই কেউ কেউ এই মত প্রকাশ করেছেন।

অন্য মতে, নবম শতাব্দীতে আদি শঙ্করই প্রথম বদ্রীনাথকে একটি তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, ৮১৪ থেকে ৮২০ সাল পর্যন্ত ছ'বছর তিনি এই অঞ্চলে বাস করেছিলেন। বছরে ছ'মাস তিনি বদ্রীনাথে ও বাকি ছয়মাস কেদারনাথে থাকতেন। হিন্দুরা আরও মনে করে যে, বদ্রীনাথের মূর্তিটি তিনিই অলকানন্দা নদী থেকে উদ্ধার করে তপ্তকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণের কাছের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে, পারমার রাজা কনক পালের সাহায্যে আদিশঙ্কর এই অঞ্চলের সকল বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেছিলেন। রাজার বংশধরেরা বংশানুক্রমে এই মন্দিরের দেখাশোনা করতেন এবং মন্দিরের খরচ নির্বাহের জন্য কয়েকটি গ্রাম দান করেছিলেন। মন্দিরের পথের গ্রামগুলি থেকে যে আয় হত তা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। পারমার শাসকদের 'বোলন্দা বদ্রীনাথ' অর্থাৎ, 'কথা-বলা বদ্রীনাথ' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাদের অন্যান্য উপাধি ছিল 'ধর্মবিভব' ও 'ধর্মরক্ষক শিরোমণি'।

বদ্রীনাথের সিংহাসনটি প্রধান দেবতার নামাঙ্কিত। ভক্তেরা মন্দিরে যাওয়ার আগে রাজার কাছে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে গাড়ওয়ালের রাজা বদ্রীনাথের মূর্তিটি বর্তমান মন্দিরে সরিয়ে আনেন। গাড়ওয়াল রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে বদ্রীনাথ মন্দির ব্রিটিশদের অধীনে আসে। তবে গাড়ওয়ালের রাজা মন্দিরের ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে থেকে যান।

প্রাচীনকাল থেকে এই মন্দিরটিকে বহুবার মেরামত করতে হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে গাড়ওয়ালের রাজারা মন্দিরটিকে প্রসারিত করেন। ১৮০৩ সালের হিমালয়ের ভূমিকম্পে মন্দিরটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর জয়পুরের রাজা এটিকে পুনর্নির্মাণ করেন। ২০০৬ সালে রাজ্য সরকার বদ্রীনাথ-সংলগ্ন এলাকায় কোনো রকম নির্মাণকাজ আইনত নিষিদ্ধ করে দেয়।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, এই স্থানে বিষ্ণু ধ্যানে বসেছিলেন। হিমালয়ের একটি অঞ্চলে মাংসভুক সন্ন্যাসী ও অসাধু লোকজন বাস করত। এই স্থানটি তার থেকে দূরে ছিল বলে বিষ্ণু ধ্যানের জন্য এই স্থানটিকে নির্বাচিত করেন। ধ্যানের সময় বিষ্ণু এখানকার দারুণ শীত সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তার স্ত্রী লক্ষ্মী একটি বদ্রী গাছের আকারে তাকে রক্ষা করেন। লক্ষ্মীর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু এই অঞ্চলের নাম দেন বদরিকাশ্রম। বিখ্যাত ব্রিটিশ গবেষক আটকিনসনের মতে, এই অঞ্চলে এক সময় একটি বদ্রী গাছের জঙ্গল ছিল। কিন্তু সেই

জঙ্গল আজ আর দেখা যায় না। এই মন্দিরের বদ্রীনাথ-রূপী বিষ্ণুর মূর্তিটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। পুরাণ অনুসারে, এক ঋষি লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পদসেবা করতে দেখেন। তাই দেখে তিনি বিষ্ণুকে তিরস্কার করেছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণু বদ্রীনাথে এসে দীর্ঘ সময় পদ্মাসনে বসে তপস্যা করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বদ্রীনাথের উৎপত্তি সম্পর্কে আর একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই উপাখ্যান অনুসারে, রাজা ধর্মের দুই পুত্র ছিল-নর ও নারায়ণ। এঁরা হিমালয়ে পর্বতরূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁরা ধর্মপ্রচারে জন্য এই স্থানকে নির্বাচিত করেন এবং হিমালয়ের বিভিন্ন বৃহৎ উপত্যকাগুলিকে বিবাহ করেছিলেন। আশ্রম স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গার অনুসন্ধানে এসে তাঁরা পঞ্চবদ্রীর অন্যান্য চার বদ্রীর সন্ধান পান। যেগুলি হল: বৃধা বা বৃধবদ্রী, যোগবদ্রী, ধ্যানবদ্রী ও ভবিষ্যবস্ত্রী। অবশেষে তারা অলকানন্দা নদী পেরিয়ে উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণের সন্ধান পান এবং এই স্থানটির নামকরণ করেন বদ্রীবিশাল।

পঞ্চবদ্রী নামে পরিচিত পাঁচটি বিষ্ণু মন্দিরের একটি হল বদ্রীনাথ মন্দির। পঞ্চবদ্রী হল: বদ্রীনাথের বিশালবদ্রী, পাণ্ডুকেশ্বরের যোগধ্যান বদ্রী, সুবেনে জ্যোতির্মঠ থেকে ১৭ কিমি দূরে অবস্থিত ভবিষ্যবদ্রী, জ্যোতির্মঠ থেকে ৭ কিমি দূরে বৃধবদ্রী ও কর্ণপ্রয়াগ থেকে ১৭ কিমি দূরে আদিবদ্রী। বদ্রীনাথ মন্দির হিন্দুদের পবিত্রতম চারটি তীর্থ 'চারধাম'-এর অন্যতম। চারধাম তীর্থগুলি হল রামেশ্বরম, বদ্রীনাথ, পুরী ও দ্বারকা। যদিও এই মন্দিরের আদি ইতিহাস স্পষ্ট জানা যায় না, তবু অদ্বৈতবাদীরা আদি শঙ্করকে চারধামের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। আদি শঙ্কর ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করার সময় যে চারটি মন্দিরকে মঠের নিকটবর্তী মন্দির হিসেবে নির্বাচিত করেন সেগুলি হল: উত্তরে বদ্রীনাথে বদ্রীনাথ মন্দির, পূর্বে পুরীতে জগন্নাথ মন্দির, পশ্চিমে দ্বারকায় দ্বারকাধীশ মন্দির ও দক্ষিণে শৃঙ্গেরীতে সারদাপীঠ মন্দির।

সম্প্রদায়গত ভাবে চারধাম মন্দিরগুলি শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভক্ত হলেও, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরা চারধাম মন্দিরগুলিতে তীর্থ করতে যান। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীকে বলা হয় 'ছোটো চারধাম'। বিংশ শতাব্দীতে মূল চারধাম থেকে এই তীর্থগুলিকে আলাদা করার জন্য 'ছোটো' শব্দটি যুক্ত হয়। আধুনিক কালে এই তীর্থগুলিতে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ও এগুলিকে 'হিমালয়ের চারধাম' নামেও চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

ভারতের চার প্রান্তে অবস্থিত চারধাম মন্দিরগুলিতে জীবনে অন্তত একবার তীর্থ করতে যাওয়া হিন্দুরা পবিত্র কর্তব্য মনে করেন। প্রথাগতভাবে, এই তীর্থযাত্রা পূর্বদিকে পূরী থেকে শুরু হয় হয় এবং রামেশ্বর ও দ্বারকা হয়ে বদ্রীনাথে পৌঁছায়।

মন্দিরের ঠিক নীচে তপ্তকুণ্ড নামে একটি উষ্ণ গন্ধক প্রস্রবণ রয়েছে। এটির ঔষধিগুণ আছে বলে মনে করা হয়। অনেক তীর্থযাত্রী মনে করেন, মন্দিরে যাওয়ার আগে এই কুণ্ডে স্নান করা আবশ্যক। এই প্রস্রবণের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৫৫ সে. (১৩১ ফা); অন্যদিকে প্রস্রবনের বাইরে এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১৭ সে. (৬৩ ফা)-এর নীচে থাকে

বদ্রীনাথ মন্দিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হয়। নাম, 'মাতা মূর্তি কা মেলা'। গঙ্গার পৃথিবীর অবতরণকে উপলক্ষ্য করে এই উৎসব আয়োজিত হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, বদ্রীনাথের মা গঙ্গাকে পৃথিবীর জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বারোটি শাখায় ভাগ করে দিয়েছিলেন। তারই সম্মানে এই উৎসব পালিত হয়। যে স্থানে এই নদী প্রবাহিত হয়েছিল, তাই পবিত্র বদ্রীনাথ ভূমি নামে পরিচিত হয়।

জুন মাসে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দিরে বদ্রী-কেদার উৎসব আয়োজিত হয়। আটদিন-ব্যাপী এই উৎসবে সারা হিমাচলের বিখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

বদ্রীনাথ মন্দিরের নিত্যপুজোর অঙ্গ প্রতিদিন সকালে মহাভিষেক, অভিষেক, গীতা পাঠ ও ভগবদ্‌পুজো। সান্ধ্যপুজোর অঙ্গ গীতগোবিন্দ ও আরতি। অষ্টোত্তরম্ ও সহস্রনাম প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রপাঠও সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। আরতির পর বদ্রীনাথের মূর্তি থেকে সকল অলংকার সরিয়ে নিয়ে চন্দন লেপন করা হয়। পরদিন নির্মাল্য দর্শন অনুষ্ঠানের সময় সেই

চন্দন ভক্তদের দেওয়া হয় প্রসাদ হিসেবে। সকল অনুষ্ঠানই ভক্তদের সামনে পালিত হয়। উল্লেখ্য, কোনো কোনো হিন্দু মন্দিরে এই প্রথা নেই। সেখানে কিছু কিছু অনুষ্ঠান লোকচক্ষুর অন্তরালে পালিত হয়।

সাধারণত মিষ্টি ও শুকনো পাতা ভক্তদের প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালের মে মাস থেকে পঞ্চামৃত প্রসাদ দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রসাদ স্থানীয়ভাবে তৈরি হয় ও স্থানীয় বাঁশের ঝুড়িতে করে দেওয়া শুরু হয়।

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিজয়াদশমীর পর শীতকালের জন্য মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। মন্দির বন্ধ হওয়ার দিন একটি 'অখণ্ড জ্যোতি' নামে একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যেটি ছয় মাস টানা জ্বলে। সেই দিন ভক্ত ও মন্দিরের আধিকারিকদের সামনে প্রধান পুরোহিত বিশেষ পুজো করেন। বদ্রীনাথের মূর্তিটিকে কাল্পনিকভাবে মন্দির থেকে ৬৩ কিমি দূরে জ্যোতির্মঠের নৃসিংহ মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়। এপ্রিল মাসে বসন্তপঞ্চমী তিথিতে মন্দিরটি আবার খুলে দেওয়া হয়। তীর্থযাত্রীরা মন্দির খোলার দিন মন্দিরে উপস্থিত হন অখণ্ড-জ্যোতি প্রদীপটিকে দেখার জন্য।

হিন্দুরা যেসব মন্দিরে তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পারলৌকিক ক্রিয়া সারেন, বদ্রীনাথ মন্দির সেগুলির অন্যতম। ভক্তেরা গর্ভগৃহে বদ্রীনাথের মূর্তিটি পুজো করেন এবং অলকানন্দা নদীতে স্নান করেন। লোকবিশ্বাস অনুসারে, মন্দিরের পুকুরগুলিতে স্নান করলে পাপ দূর হয়।

বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন সেরে এবার যাওয়া যাক ভারতের শেষ গ্রাম 'মানা'-র উদ্দেশে। মানা থেকেই শুরু হবে হেঁটে ভ্রমণ। মানা, বদ্রীনাথ থেকে সাড়ে ৩ কিলোমিটার দূরত্বে। অলকানন্দার ওপর দিয়ে লোহার সেতু অতিক্রম করে এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে পড়বে নারায়ণ পর্বত, ডানদিকে নীচে অলকানন্দা, আর নদীর ওপারে নরপর্বত।

'মানা' সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। 'মানা' ভারতের শেষ গ্রাম। এখানে প্রচুর ভ্রমণার্থী আসেন। যারা বদ্রীনাথ দর্শনে আসেন তাদের কম-বেশি সবাই মানা যান। 'মানা' গ্রাম হলেও এখানকার জনবসতি বেশ ঘিঞ্জি। এখানকার অলিগলি যে-কোনো ছোটো শৈল শহরকেই মনে করিয়ে দেবে। মিনি তিব্বত বলতে পারেন। আর একটু গেলেই পৌঁছে যাবেন তিব্বতে।

'মানা'-র ওপর দিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলে পৌঁছোনো যায় মানা পাস'। আর এখানে দেখা যায় বেশ কিছু বুগিয়াল। বুগিয়াল শব্দবন্ধটি গাড়োয়াল ভাষায় প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। 'বুগিয়াল' শব্দটির অর্থ হল 'পশুচারণ ক্ষেত্র'।

মানা পার হলেই শুরু তিব্বত, তাই সাধারণ মানুষ, ভ্রমণার্থীর পাশাপাশি ভারতীয় সৈন্যদের আনাগোনা মুহুর্মুহু চোখে পড়ে এখানে।

'মানা'-তেই অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সরস্বতী নদী। দুটি নদীর রং দুরঙের। অলকানন্দার জল ঘোলা আর সরস্বতীর সবুজ। এই দুই নদীর মিলনস্থল কেশব প্রয়াগ নামে পরিচিত।

যে সরস্বতী এলাহাবাদের প্রয়াগে অন্তঃসলিলা সেই সরস্বতী এখানে খরস্রোতা। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর নাম এলেও সরস্বতীকে দেখতে পাওয়া যায় না। সেই সরস্বতী এখানে ভয়াবহ। সরস্বতী নদীর ভয়াবহ গর্জন শুনে আপনার ভয় লাগতে পারে। কথিত আছে, পাণ্ডবদের অন্তিম যাত্রাপথের ওপরেই এই সরস্বতী নদী পড়ে এবং এর ভয়াবহতা পাণ্ডবগণের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে, তখন মধ্যম পাণ্ডব ভীম একটিমাত্র পাথরের সাহায্যে সেতু নির্মাণ করেন, যা 'ভীমপুল' নামে আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। মানা গ্রাম থেকে বসুধারা জলপ্রপাতের চড়াই রাস্তার ওপরই আছে এই পুল। এই পুলের ওপর দিয়েই পাণ্ডবগণ স্বর্গের পথে এগিয়ে যান। এই পথে অ্যাডভেঞ্চারের আশায় অনেক ভ্রমণার্থী বসুধারা জলপ্রপাত দেখতে যান।

এই 'মানা' গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেবের গুহা দেখতে

পাওয়া যায়, যা ‘ব্যাসগুফা’ নামে পরিচিত। এই গুহাতেই বসেই ব্যাসদেব পুরো মহাভারতের কথা বলে যান। এর ঠিক ১০০ মিটার দূরত্বে গণেশ গুহা। যেখানে বসে সিদ্ধিদাতা গণেশ মহাভারত লিখেছিলেন। গণেশগুম্ফা’ নামেও পরিচিত, মহাভারতের লেখনী রূপ প্রদান করেন এই জায়গায় বসে শুনলে একটু চমকে যেতে পারেন।

ব্যাসদেব তাঁর ব্যাসগুফাতেই নাকি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন, তাই তাঁর নাম হয় ‘বেদব্যাস’।

প্রাচীন মুনি-ঋষিদের অদ্ভুত নানারকম ক্ষমতা থাকত তা নানা জায়গায় আপনারা পড়ে থাকবেন, কিন্তু যত বিচিত্র ধরনের ম্যাজিক যদি দেখতে চান তাহলে আপনাকে এই পথে যেতে হবে তবে। তবে অত্যন্ত সন্তর্পণে পথ চলবেন, অবশ্যই চোখ কান খোলা রাখবেন।

সতপন্থ’-র সমগ্র পথ যেমন আপনাকে দেবে প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য, তেমনই শিখিয়ে দেবে জীবনের কঠিন সত্যকে। আপনার ছোট্ট একটা ভুল পদক্ষেপ হতে পারে জীবনের শেষ পদক্ষেপ। এই ভেবে স্বর্গারোহনের পথে পা বাড়াবেন। কোনো খারাপ চিন্তা, বৈষয়িক ভাবনা মন মধ্যে আনবেন না। পরমাত্মা স্মরণ করে বেরিয়ে পড়ুন।

প্রথমেই আমরা যাব ‘লক্ষ্মীবন’। অলকানন্দাকে বাম দিক দিয়ে রেখে হাঁটতে থাকুন। মানাপাস অলকানন্দার ডান দিকে পড়বে। মানা থেকে লক্ষ্মীবনের দূরত্ব কমবেশি ৯ কিলোমিটার। চারিদিকে গমের খেত, তার চারপাশ পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দুদিকে একটানা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। লাইন দিয়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ফ্রেমবন্দি করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি।

কিছুটা দূর এগোনোর পর দেখতে পাবেন একটি ছোটো মন্দির। অলকানন্দার বামতীরে নির্জন স্থানে রয়েছে এই মন্দির। এই মন্দিরের দেবী একজন পাহাড়ি মাতা। দেবীমূর্তিটি অসাধারণ মন্দিরটিও দেখতে বেশ।

পুরাণ মতে এই দেবী ছিলেন দুই পর্বতভ্রাতা নর ও নারায়ণের জননী। ‘নর’ ও ‘নারায়ণ’ এই দুই ভাই তপস্যার জন্য নাকি গৃহত্যাগী হন। প্রচণ্ড উদ্‌বেগে মাতা যখন তাঁদের খুঁজতে আসেন, তাঁকে দেখে গৃহত্যাগী দুইভাই দুটি পর্বত হয়ে স্থানু হয়ে যান।

তখন মাতার দুঃখ দেখে এই স্থানে ঋষি নারায়ণ, মাতার বসবাসের সম্মতি দেন। সেই থেকেই একা মাতা এই নির্জন মন্দিরে অধিষ্ঠান করেন। আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উতরাই খেলা। একটা বাঁক ঘোরার পর ডানদিকে অলকানন্দার অন্য দিকে অনেক দূরে চোখে পড়বে বসুধারা জলপ্রপাত।

বামদিকে পাহাড়, ডানে নীচে, অনেক নীচে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। পাহাড়ের প্রান্ত দিয়ে খানিকটা উতরাই পার হয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে যাওয়ার পর শুরু হবে পাথুরে চড়াই রাস্তা। ঝুরঝুরে বালিমাটি। আর ছোটো-বড়ো পাথরে ভরতি খাড়া রাস্তা।

ধীরে ধীরে সন্তর্পণে এগোবেন। এর মধ্যে বিভিন্ন পাহাড়ি পাখির ডাক শুনতে পাবেন। পরিবেশের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। একটু দূর থেকেই চোখে পড়বে অলকানন্দার ওপর বিশাল আকারের হিমবাহ, ঠিক যেন বরফের পুল।

এগিয়ে চলুন হিমবাহের দিকে। অপূর্ব দৃশ্য, নারায়ণ পর্বত থেকে বরফের বিশাল আস্তরণ অলকানন্দায় মিশেছে, এ হল ‘ধান্য হিমবাহ’। এই আস্তরণ বহু প্রাচীন। বরফের মধ্যে মধ্যে উকি দিচ্ছে বিশাল আকারের পাথর। কত যুগ ধরে যে এই বরফ আর পাথর তাদের আস্তরণ সৃষ্টি করেছে, কে জানে!

হিমবাহের পুরো অংশটাই শক্ত নয়, মাঝে মাঝে ঝুরঝুরে বালিমাটির সঙ্গে বরফ গলে মিশে কাদা, আবার কোথাও কোথাও ফাটলও তৈরি হয়েছে।

এরই মধ্যে আমাদের গাইড দক্ষ পায়ে অতিক্রম করালেন ধান্য হিমবাহ। তারপর বেশ কিছুটা চড়াই উঠতেই চমক। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, মধ্যে মধ্যে ছোটো ছোটো ঝোপ-’চামতোলি

বুগিয়াল', যা ঘাসতোলি বলেও পরিচিত।

বেশ কিছুক্ষণ পাথুরে রাস্তা, তারপর হিমবাহ অতিক্রমের পর সবুজ পরিবেশ মনকে বেশ ভালো করে দেবে।

বিশ্রাম নিয়ে নিন কিছুক্ষণ। সেখানে প্রতিটা পাহাড়ের সৌন্দর্য, প্রতিটি বাঁকের দৃশ্যপটের বদল, প্রতিটি বাঁকে নতুন কিছু আপনাকে মন্ত্রের মত টানবে। পথের শারীরিক দুর্বলতা নিমেষে ম্লান হয়ে যাবে। রাস্তার ডান দিকে বয়ে চলা অলকানন্দার ঠিক ওপারে দেখতে পাবেন বসুধারা জলপ্রপাত। পুরাণ বলছে সেটি হল অষ্টবসুর তপস্যাক্ষেত্র। জলপ্রপাতের নীচে বরফের উঁচু ঢিবি।

প্রচণ্ড হওয়ার বেগ থাকায় জলপ্রপাতের সব জল নীচ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারছে না। ধোঁয়ার আকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বাতাসে। আবার হাঁটাপথ শুরু। বেশ কিছুক্ষণ পর অনেকটা সবুজ অংশ চোখে পড়বে। হাঁটার গতিটা একটু বেশি। তবে বেশিদূর যেতে হল না, আবার রুক্ষতা শুরু, গতি শ্লথ।

দিনে দিনে হাঁটতে শুরু করলে একটু বেলার দিকে পৌঁছে যাবেন লক্ষ্মীবন। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১২,০০০ ফুট উচ্চতা। 'লক্ষ্মীবন' অঞ্চলে অলকানন্দার গতি খুব ধীর, জলও কম। বোঝা যায় হিমবাহের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় জলের পরিমাণ বেড়েছে। লক্ষ্মীদেবী নাকি এই লক্ষ্মীবনেই তপস্যা করেছিলেন। এই জায়গা সত্যিই তপস্যা করারই জায়গা। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকুন। থাকলে দেখবেন আপনার অশান্ত মন যথেষ্ট শান্তি লাভ করেছে। মন স্থির হয়েছে।

লক্ষ্মীবনের চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা, নিস্তব্ধ এক সমতল সবুজক্ষেত্র। লক্ষ্মীবনের এক দিক ঢালু হয়ে অলকানন্দায় মিশেছে।

ওই ঢালে রয়েছে প্রচুর ভূর্জ গাছ। গুল্ম চরিত্রের এই গাছগুলোর আকার পরিণত আমগাছের মতো, কিন্তু কাণ্ডের ধর্ম পেয়ারার সঙ্গে মিলে যায়; অর্থাৎ, বাকল মোচনেই রেচন ত্যাগ। খয়েরি ছাল খুলে খুলে আছে, যেটি হল বিখ্যাত ভূর্জপত্র। যাতে পুরাকালে লেখা হত, পুঁথির পর পুথি তৈরি হত।

সেদিন বিশ্রাম নিন। এর পরের রাস্তা বেশ বিপদসংকুল, তবে এ রাস্তায় কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাও হয়েছে। দু-কিলোমিটার মত অতিক্রম করার পর ছোটো-বড়ো পাহাড়ে ঘেরা অঞ্চল -'বান ধার'। এখানে পাথর ঘেরা প্রকৃতিসৃষ্ট কয়েকটি গুহাও চোখে পড়বে।

আর একটু এগোতেই দেখতে পাবেন একটি পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত একটি বিশাল পাথর। গাইডের কথা অনুযায়ী ওটা নাকি 'ভীমের গদা'।

তারপর রাস্তা আরও বেশ চড়াই। অলকানন্দাকে আপনার ডান দিকে রেখে এবার আমাদের যেতে হবে নীলকণ্ঠ পর্বতকে বাঁ দিকে রেখে অর্ধ পরিক্রমা করে সতপন্থ হিমবাহ ধরে।

রাস্তা ক্রমশ বাম দিকে বাঁক নিচ্ছে। বাঁকের কাছে অন্য আর একটি হিমবাহ এসে সতপন্থ-র হিমবাহে মিশেছে—'ভগীরথ খড়্গা'। এই দুই হিমবাহ মানে, সতপন্থ ও ভগীরথ খড়্গা-এর সংগম তৈরি করেছে একটি নদী উপত্যকা। উপত্যকার নাম, 'অলকাপুরী'।

কুবেরের নগরী অলকাপুরী। এই অলকাপুরী থেকেই অলকানন্দার উৎপত্তি বলা হয়। কালিদাসের মেঘদূতের চারটে লাইন একটু গুন গুন করে নিন। যদি কবিতা ভালোবাসেন।

এই ভগীরথ খড়্গা হিমবাহ ধরে যদি পাঁচ থেকে ছয় দিন ট্রেকিং করতে পারেন তো এই পথ ধরে পৌঁছে যেতে পারেন গোমুখ।

সামনেই নীলকণ্ঠ পর্বতের গা বেয়ে নেমে এসেছে অজস্র ঝর্না -'সহস্রধারা"।

সামনে যতদূর দৃষ্টি যাবে পর্বতজুড়ে শুধু একের পর এক জলধারা। মহাভারত অনুযায়ী, মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রাকালে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন তির দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এই সহস্রধারা।

সারা বছর জলরাশির খামতি থাকে না, তবে বর্ষায় এর ভয়াবহতা মারাত্মক হয়ে যায়।

আবার প্রচণ্ড ঠান্ডায় বরফ হয়ে যায়। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখায় এই পথের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

যাই হোক, এই জলপ্রপাতগুলির মধ্যে পাঁচটা বেশ বড়ো জলপ্রপাত। পুরাণ মতে এই পাঁচটি জলপ্রপাতকে একসঙ্গে 'পঞ্চধারা তীর্থ' বলা হয়। এই পঞ্চধারা 'প্রভাস', 'পুষ্কর', 'গয়া', 'নৈমিষ' ও 'কুরুক্ষেত্র' নামে পরিচিত। মহাদেবের নির্দেশে পঞ্চতীর্থের দেবতারা এখানে তপস্যা করেন। এগিয়ে চলুন সহস্রধারাকে বামে রেখে। কিছুটা এগিয়ে অল্প চড়াই পার হতেই শুরু পাথরের পথ। ডানদিকে দেখা মিলবে বিশাল হিমবাহ। অন্যদিকে 'বালাকুন শৃঙ্গ'। বাঁ দিকে নীচে বয়ে চলেছে সহস্রধারার জলধারা।

অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর এক অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলুন। পাহাড় আপনাকে শেখায় উদারতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংযম, সহ্যক্ষমতা, সহযোগিতা। আর তার পাশাপাশি দেখিয়ে দেয় হিংস্রতা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ বদল। এই আনন্দ আর কষ্টসহিষ্ণুতা এই দুই মিলেই জীবন।

প্রকৃতির সঙ্গে যেখানে পুরাণের হাতছানি, সেখানেই এমনিতেই আগ্রহ বাড়ে। আগে থেকে বিষয়গুলি জানা থাকলে জানার উৎসাহ বাড়ে। পাহাড়ি পথে বিচিত্র পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে আপনি অনেক কিছুর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যান। আর যদি একটু-আধটু পুরাণের জ্ঞান থাকে তো আপনি আলাদা একটা আমেজ পাবেন নিশ্চিত।

রাস্তার প্রায় কিলোমিটার দুয়েক যাওয়ার পর দেখা মিলবে গোলাকার একটি সবুজক্ষেত্র। এই সমতলভূমি অতিক্রম করলেই সামনে একটা বিশাল চড়াই। সেটা অতিক্রম করতেই প্রবল হওয়ার দাপট অনেকটা কনখল থেকে হৃষীকেশে প্রবেশ করার মতো। চারপাশের পর্বতশৃঙ্গগুলো বরফে মোড়া। পায়ের নীচে বরফ। কখনো কখনো সেই বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ জল ধারা। বাঁক পেরোতেই গোলাকার সবুজ ঘাসে ঢাকা খেলার মাঠের মত জায়গা, নাম-'চক্রতীর্থ'। বোল্ডারে ভরতি, রুক্ষ এলাকার মাঝে সবুজের ছোঁয়া। আপনার পেছনে 'বালাকুন', বাঁয়ে 'নীলকণ্ঠ', আর সামনের ডানদিকে 'চৌখাম্বা'। একটা উতরাই পেরিয়ে অসাধারণ একটা জায়গা। সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে। জায়গাটার নাম চক্রতীর্থ। পুরাণ ঘেঁটে জানা যায় মহাভারতের যুদ্ধ শেষে প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র গেঁথে রেখেছিলেন এখানে।

চক্রতীর্থে ক্যাম্প করতে পারেন। তাঁবু খাটিয়ে ফেলুন। তাঁবু খাটানোর জন্য আগে জায়গা নির্বাচন করুন। পাহাড়ে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যখন-তখন পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরখণ্ড, বরফখণ্ড নামতে পারে। আর অতি অবশ্যই আশেপাশে জলের উৎসটা একটু দেখে নেবেন। জল এবং সমতলভূমি এই দুই-ই খুব দরকার।

চক্রতীর্থ সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায়। ঠান্ডাটা একটু বেশিই লাগবে। উপযুক্ত গরম জামাকাপড় নিয়ে যাবেন। না হলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। এখান থেকে নীলকণ্ঠের যে রূপ আপনি দেখবেন তা অসাধারণ। চক্রতীর্থে যথেষ্ট ঠান্ডা। হাওয়ার তীব্রতা ব্যাপক। ভোর থেকেই তোড়জোড় শুরু করুন। তারপর ও নমঃ শিবায় বলে বেরিয়ে পড়ুন 'সতপন্থের পথে। চক্রতীর্থ থেকে সতপন্থের দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। তবে চড়াই রাস্তা এবং বেশ বিপজ্জনক। চক্রতীর্থ চারিদিকের পাহাড় দেখতে দেখতে বিপদসংকুল পথে কোনো মতে দুটো পা রাখার জায়গার পথ ধরে এগিয়ে চলুন। অনুমান প্রায় দুশো ফুটের খাড়াই রাস্তা। একটু এদিক-ওদিক হলেই সিধা নীচে। ভ্যানিশ! অনেক আগেই নীচে চক্রতীর্থকে ছেড়ে এগিয়ে চলা। সূর্যের আলোয় পাহাড়ের গায়ের বরফ চিকচিক করে উঠছে। ছোটো ছোটো পাথরখণ্ড একের পর এক সাজানো রয়েছে। এরকম সাজানো এক চিহ্ন থেকে, আগের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যেতে হবে। রাস্তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রচুর নড়বড়ে পাথর পাবেন যাত্রাপথে। শুনতে ৫ কিলোমিটার মনে হচ্ছে, কিন্তু পাঁচঘণ্টার মতো মনে হবে। তুষারধ্বসের (avalanche) শব্দ শুনলে সতর্ক হয়ে যাবেন।

মেঘের মধ্য দিয়ে হাঁটার ফলে দিকভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা প্রবল। চৌখাম্বা ও নীলকণ্ঠের

অবস্থান দেখে হাঁটুন। আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন হলে হয় গাইডের কথা শুনে চলুন, না হলে মারাত্মক বিপদে পড়বেন। সঙ্গে অতি অবশ্যই কম্পাস রাখবেন। পারলে পুরো রুটের রুটম্যাপটি নিয়ে পড়াশোনা করে নিন। ডানদিক বামদিক প্রত্যেকটি স্থানের অবস্থান রাখুন নিজের নখদর্পণে। তা না হলে বেশ মুশকিল।

চড়াই-উতরাই মিশিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে দেখবেন দিঘির ন্যায় জলাশয়। কোনটা বরফে ঢাকা কোনোটা আবার একটু-আধটু জলের অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে। সামান্য বাঁক ফিরতেই চোখের সামনে ত্রিকোণাকার 'সতপন্থ তাল'। 'সত' অর্থাৎ সত্য আর 'পন্থ' অর্থাৎ পথ 'সত্যের পথ'। যে সত্যের পথ ধরে পাণ্ডবরা হেঁটেছিলেন, সেই পথ ধরে এযুগে আমারও হাঁটলাম। এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

সতপন্থ তালের চারপাশই ঢালু। রয়েছে 'মহাদেবে'-র একটি পাথরের ছোটো মন্দির, যার ভেতর অধিষ্ঠান করছে 'শিবলিঙ্গ', সঙ্গে ডুগডুগি বাঁধা ত্রিশূল। সতপন্থ তাল পাহাড় ঘেরা স্বচ্ছ জলের ত্রিকোণাকার জলাশয়।

স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী, এর তিন দিকে নাকি তিন ধ্যানরত দেবতার অধিষ্ঠান; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এঁরা বছরের একটি বিশেষ শুভদিনে এই জলাশয়ে স্নান সারেন। বলা হয়, সতপন্থ তালের জলে স্নান করলে নাকি যে-কোনো ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই জলে এমন কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া আছে যা আমাদের শরীরে আলাদা একটা বল এনে দেয়।

সতপন্থ তাল জনমানবশূন্য, তবে এই তালের অপর প্রান্তে পাথরের কুঠিতে থাকেন এক সন্ন্যাসী। কম কথা বলেন।

দিনে-রাতে তুষারপাত অবশ্যম্ভাবী। তাই তাঁবু ঠিক জায়গায় করবেন। তাপমাত্রা যথেষ্ট নীচের দিকে থাকবে, তাই নিজেকে যতটা সম্ভব প্রোটেকশনের মধ্যে রাখুন। তাঁবুর খুটি ঠিকমতো করে গাঁথবেন নচেৎ বিপদে পড়বেন।

সতপন্থ থেকে এবার আর এক বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ুন। তবে যার শরীরে কুলোবে না তাকে জোর দেবেন না। সতপন্থের স্বচ্ছজলে তাকিয়ে থাকুন। পারলে ধ্যান করুন কিছুটা সময়। ভালো লাগবে।

এবার বেরিয়ে পড়ুন দু-কিলোমিটার দূরের 'সোমকুণ্ড আর সূর্যকুণ্ড দেখতে। যাত্রা শুরু 'সোমকুণ্ড'-এর দিকে। সতপন্থ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে এগিয়ে চলুন। আপনার বামদিকে পড়বে নীলকণ্ঠ পর্বতের উত্তর-পশ্চিম পরিসর। ডানদিকে সতপন্থ হিমবাহ। আর অন্যপ্রান্তে বালাকুন পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম পরিসর। এর অন্যদিকে আছে ভগীরথ খড়্গা হিমবাহ। চড়াই-উতরাই পার হয়ে ১৫,৮০০ ফুট উচ্চতায় সোমকুণ্ড। বৌদ্ধদের কিছু নিশানা পতাকা, স্তূপীকৃত পাথরখণ্ড দেখতে পাবেন।

এবার প্রাণভরে চারপাশে চোখ রাখুন। মেঘ কুয়াশা আর এক বিচিত্র স্বর্গীয় অনুভূতি। চোখের সামনে নীলকণ্ঠ ও চৌখাম্বার সংযোগস্থল। আপনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবেন। আর আপনার মন বলবে স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে তো তা এখানেই। আপনি আর কিছুটা পথ গেলেই স্বর্গারোহণ। একটু ভেবে দেখুন মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবদের মধ্য থেকে যুধিষ্ঠির একমাত্র এই পথ ধরে সশরীরে স্বর্গে গেছিলেন। তারপর যুগের পর যুগ কত মানুষ এই পথ ধরে স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। বিপজ্জনক বিপদসংকুল পথে শুধুমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় কেউ কেউ ঝাঁপ দিয়েছেন সোজা এই পথ ধরে। মোক্ষলাভের আশায় ঈশ্বরের নাম করতে করতে কত সাধারণ মানুষ সাধু যোগী মহাত্মা এই পথে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

আপনার চোখের সামনে মহাভারতের সেই 'স্বর্গদ্বার'। দূরে মেঘ কুয়াশায় ঢাকা এক অলৌকিক পথ। শিশির বাষ্প মেশা এক পথ দৃশ্যমান। মানস চক্ষে দেখা যাচ্ছে আবছা একটা সিঁড়ি। ওটাই কি তবে স্বর্গের সিঁড়ি। যুধিষ্ঠির নাকি এই সিঁড়ি পর্যন্তই গিয়েছিলেন, তারপর স্বর্গের রথ তাঁকে সশরীরে নিয়ে গেছিল স্বর্গে।

দ্রৌপদী প্রথা'র রহস্য

মহাভারতে দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী থাকা নিয়ে আজও নানা আলোচনা সমালোচনা হয়ে থাকে। একজন স্ত্রীর কিনা পাঁচ স্বামী! আর সে রকম প্রথা যদি আজকের দিনেও মেনে চলা হয় তো আপনি তাকে কীভাবে দেখবেন? আপনি কি জানেন ভারতের এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে আজও মহিলারা দ্রৌপদীর মতো একাধিক স্বামীকে নিয়ে সংসার করেন?

গাড়োয়ালে স্বামী বিবেকানন্দও এই প্রথা দেখে চমকে উঠেছিলেন। আর সেই রীতি কি নিছক প্রথা, নাকি মানুষের তৈরি সংস্কার নাকি প্রাচীন কালের সাক্ষ্য বয়ে চলা নিছক এক কুসংস্কার! কোনটা? এই উত্তরের খোঁজে প্রথমেই পৌঁছে গিয়েছিলাম উত্তরাখণ্ড।

উত্তরাখণ্ডের সেই গ্রামে যাওয়ার আগে আমরা একটু জেনে নিই দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী থাকার নেপথ্যে কী কারণ ছিল। কেন দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে হয়েছিল পঞ্চপাণ্ডবকে। মহাভারতের কাহিনিতে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের একমাত্র স্ত্রী যিনি অনেক জায়গাতেই অভিভাবিকা। তাদের নানাভাবে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ থাকতে শিখিয়েছেন। শেষদিন পর্যন্ত পাশে থেকেছেন।

দ্রৌপদীর প্রকৃত নাম যাজ্ঞসেনী। যজ্ঞের আগুন থেকেই তার জন্ম। বলা হয়ে থাকে পৌরাণিক পঞ্চবতী বা পঞ্চকন্যার নাম উচ্চারণ করলে সকল পাপ দূর হয়ে যায়। 'পঞ্চকন্যা" বলে প্রসিদ্ধ যে-পাঁচজন পুরাণের নারী, তারা হলেন—সীতা, সাবিত্রী, অহল্যা, দ্রৌপদী ও অরুন্ধতী। এছাড়া অন্য আর এক দলের মতে, পৌরাণিক 'পঞ্চকন্যা' হলেন অহল্যা, কুন্তি, দ্রৌপদী, তারা ও মন্দোদরী। এই দুই অভিমতের পঞ্চকন্যার ভেতরেই যে দু-জন নারীর উপস্থিতি দেখা যায়, তারা সীতা-সাবিত্রীও নয়, কুন্তী-মন্দোদরীও নয়। তাঁরা হলেন দ্রৌপদী ও অহল্যা।

স্বয়ম্বর সভায় নিজে পছন্দ করে অর্জুনকে মাল্যদান করার পরেও কেন তাঁর মতো এক তেজস্বিনী নারী অন্যের চাপিয়ে দেওয়া পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী হতে অস্বীকৃতি জানালেন না, এটার ব্যাখ্যা দু-তিন রকম। একটি পূর্ব জন্মের গল্প। দ্বিতীয়টি যুধিষ্ঠিরের কাছে মাতৃআজ্ঞা ছিল শিরোধার্য অর্থাৎ তোমারা যা এনেছো তা সমান ভাগে ভাগ করে নাও। আর তৃতীয় ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা যা হল সে-সময়ে নারীর মতামতের কোনো মূল্য ছিল না কেউ তা বিশেষ গ্রাহ্য করত না।

মহাভারত লেখা হয়েছিল ক্ষত্রিয় যুগে অর্থাৎ সে-যুগে রাজতন্ত্রে পুরুষতন্ত্রের দাপট ছিল অনেক বেশি। তবে একটা সত্যি কথা দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভা থেকে যুধিষ্ঠির কিন্তু আগে বের হয়ে যান। সে মা'কে এসে জানাতেই পারতেন যে ভাইয়েরা সয়ম্বর সভা থেকে রাজকন্যা জিতে আনছে। বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠির তা জানান না কুন্তীকে। কারণ যুধিষ্ঠির ভালোভাবেই জানতেন সুন্দরী দ্রৌপদীকে পাঁচ ভাই-ই মনে মনে কামনা করেছে। সেই জায়গায় সে বাড়ির বড়ো ছেলে হিসেবে দ্রৌপদীকে লাভ করলে ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ বাড়বে। আর যদি পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দ্রৌপদীকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে কেউ কারো প্রতি রুষ্ট হবে না। কৌশলী যুধিষ্ঠির তাই ব-কলমে এই খেলা খেলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে দ্রৌপদীর মাধ্যমেই কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের প্রথা শেষ হয়ে যায়। কারণ দ্রৌপদীর সন্তানেরা কেউই আর বেঁচে থাকেনি। যুদ্ধের শেষে এবং যে কায়দায় অশ্বত্থামা ঘুমন্ত শিশুদের হত্যা করে, তাকে স্রেফ একটা আচম্বিত যবনিকাপাত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু নিহত হলেও তার ঔরসজাত ভ্রূণ তখন তার স্ত্রী উত্তরার গর্ভে। সেই সন্তান পরীক্ষিৎ-ই শেষে রাজা হল। যাই হোক মহাভারতের মজার বিষয় হল মহাভারতের হাজারো ব্যাখ্যা হয়। যে যেভাবে নিজের মতো যুক্তি দিতে পারেন।

পান্ডবরা বকরাক্ষস বধের পর পাঞ্চাল রাজ্যের দিকে যাত্রা করেন। তখন মহামুনি ব্যাসদেবের সাথে তাঁদের দেখা হয়। তখন ব্যাসদেব প্রসঙ্গক্রমে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত পান্ডবদেরকে বলেন—"কোনো তপোবনে সর্বাঙ্গসুন্দরী সর্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করতেন। নাম নলায়ণী। সেই রমণী উপযুক্ত পতি লাভ না করতে পেরে অত্যন্ত ব্যথিতা

হয়েছিলেন। তখন তিনি উপযুক্ত পতি লাভের ইচ্ছায় মহাদেবের তপস্যা করতে শুরু করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তার সমক্ষে উপস্থিত হলে, মহীয়সী সর্বগুণসম্পন্ন পতিলাভের বর প্রার্থনা করেন। কিছুটা ইতস্তত হওয়ায় সেই রমণী পাঁচবার শিবের কাছে একই বর প্রার্থনা করেন। তখন শিব বললেন, "হে ঋষিকন্যা আমার বরের প্রভাবে তুমি পাঁচ পতি প্রাপ্ত হবে।" তখন ঋষিকন্যা বললেন, "প্রভু আমি তো আপনার কাছে এক পতি প্রার্থনা করেছি।" শিব বললেন, "কিন্তু একই প্রার্থনা পাঁচবার করেছ তাই তুমি পঞ্চস্বামী প্রাপ্ত হবে।"

ব্যাসদেব পাণ্ডবদের বললেন, "সেই ঋষিকন্যাই এখন দ্রুপদের কন্যারূপে যজ্ঞ থেকে জাত হয়েছে। তাঁর সাথেই তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের বিয়ে হবে। তাই তোমরা পাঞ্চালদেশ যাও।" একথা বলে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন। তারপর পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজ্যে এসে এক কুমারের গৃহে আশ্রয় নিলেন।

দ্রুপদরাজ কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন কিন্তু অগ্নি থেকে উদ্ভূত কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য অগ্নিধারণক্ষম উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন প্রয়োজন। তাই রাজা দ্রুপদ এক বিচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে দ্রৌপদীর জন্য রাজা ও রাজপুত্রগণ আসতে লাগলেন।

পান্ডবগণও ব্রাহ্মণবেশে সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। বড় বড় ক্ষত্রিয় মহারথীগণ সেখানে দ্রুপদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলেন, ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন সেখানে অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করে পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে জয় করলেন। তারপর পান্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে কুটিরে ফিরে এলেন। ভীম ও অর্জুন মাতা কুন্তীর উদ্দেশে বললেন, "মা, আজ এক রমণীয় বস্তু ভিক্ষা লাভ করেছি।" কুন্তী দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা পান্ডবগণকে না দেখেই বললেন, "তোমরা যা এনেছো তা সকলে মিলে ভোগ করো।" পরে তিনি দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, "হায়। আমি বড়োই কষ্টের কথা বলে ফেলেছি।"

ব্যাসদেব বলছেন, "মানুষের বিবাহে এরূপ বিধান নেই, তবে পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবতার, দ্রৌপদী স্বর্গলক্ষ্মীর অবতার সুতরাং পূর্বসুকৃতিবশত মহাদেবের অনুগ্রহে দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের পত্নী হবেন।"

তারপর কুন্তী দ্রৌপদীর হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন-"পুত্র ভীম ও অর্জুন দ্রুপদ কন্যাকে আমার কাছে ভিক্ষা বলায়, আমিও অনবধানবশত ভিক্ষা মনে করেই বলে ফেলেছি—তোমরা সকলে মিলে ভাগ করে নাও। আমার এই কথা কীভাবে সত্য হতে পারে, এ বিষয়ে যা সঙ্গত হয়, কোনো পাপ যেন দ্রৌপদীকে স্পর্শ করতে না পারে ও দ্রৌপদীও যেন তাতে সম্মত হয় তার উপায় বলো।" কিছুক্ষণ চিন্তা করে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করার কথা বললে অর্জুন মায়ের বাক্যের প্রতি নিষ্ঠা হেতু তাতে অস্বীকৃতি জানালেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন ব্যাসদেবের বাক্য স্মরণ করলেন। তারপর তিনি বললেন, "কল্যাণীয়া দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হবে।" তখন কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর কৃষ্ণসহ সকলেই দ্রুপদরাজ প্রাসাদে গমন করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। তখন দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "স্বয়ং ধর্মের প্রতিভূ আপনি কীভাবে এমন অধর্ম করতে পারেন? তখন যুধিষ্ঠির বললেন—"মহারাজ, ধর্ম অতি সূক্ষ্ম বিষয়; সুতরাং, আমরা এর গতি বুঝতে পারি না; তাই প্রাচীনেরা যে পথে গিয়েছেন, আমরাও সেই পথের অনুসরণ করে চলি।"

এমন সময় মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। যথাসম্মান প্রদানের পর দ্রুপদ ব্যাসদেবের নিকট দ্রৌপদীর বিবাহের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন-"একটি স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হবে, অথচ তাতে কেন পাপ হবে না?"

তখন ব্যাসদেব দ্রুপদের হাত ধরে তাকে নিয়ে অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। তারপর ব্যাসদেব দ্রুপদকে পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন, "মহারাজ, পুরাকালে নৈমিষারণ্যে দেবতারা এক যজ্ঞ করছিলেন। সেই যজ্ঞের যম পুরোহিত

হওয়ার কারণে মানুষদের মারছিলেন না। পৃথিবীতে মানুষ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবগণ যজ্ঞস্থানে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে একটি স্বর্ণপদ্ম গঙ্গায় ভেসে আসতে দেখে উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন, এক রমণী গঙ্গায় নেমে রোদন করছে ও তাঁর অশ্রুবিন্দু হতে স্বর্ণপদ্ম সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে রমণী ইন্দ্রকে নিকটবর্তী হিমালয়ের ওপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে এক যুবক এক যুবতীর সাথে পাশা খেলছিল। তারা ইন্দ্রের আগমনে তাঁকে সম্মান না জানানোয় ইন্দ্র ক্রোধিত হলেন। বাক্যবাণ প্রয়োগ করলেন। যুবক ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্রই ইন্দ্র পাথরের ন্যায় স্থবির হয়ে পড়লেন। পাশাখেলা শেষে যুবকবেশী শিব ক্রন্দনরত রমণীকে বললেন, ইন্দ্রকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। রমণীর স্পর্শে ইন্দ্র চেতনা ফিরে পেল শিব তাকে তার বল দ্বারা একটি পর্বতকে সরাতে বললেন। পর্বত সরিয়ে ইন্দ্র সেখানে চার তেজস্বী পুরুষকে গর্তের ভেতর দেখতে পেলেন।

তখন শিব বললেন, "এরাও তোমারই মতো ইন্দ্র ছিল। অহংকারে মত্ত হওয়ার কারণে আমি তাদের আবদ্ধ করে রেখেছি। তুমিও সেখানে প্রবেশ করো।" তখন ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে শিবের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। তখন শিব বললেন, "তোমরা মর্ত্যে গিয়ে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করো।"

তখন পূর্বের ইন্দ্রগণ বললেন, "আমরা মর্ত্যলোকে যাব, তবে আমাদের ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাধ্যমে জননীর গর্ভে স্থাপন করুন।"

মহাদেব তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করার অঙ্গীকার করলেন। তবে, পঞ্চম ইন্দ্র মহাদেবকে বললেন, দেবগণের কার্য সম্পাদনের জন্য আমি আমার অংশকে পঞ্চম ইন্দ্র করে পাঠাব। পূর্বের ইন্দ্রগণই এবার যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর পূর্বে মহাদেব যে স্বর্গলক্ষীকে তাঁদের পত্নী হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, তিনিই দ্রৌপদীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তারপর ব্যাসদেব দ্রুপদকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে পান্ডবগণের পূর্বের ইন্দ্ররূপ দর্শন করালেন। তা দর্শন করে দ্রুপদরাজ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং পূর্বে দ্রৌপদীর যে জন্মবৃত্তান্ত পাণ্ডবগণকে বলেছিলেন, তা পুনরায় দ্রুপদকে শোনালেন। সেই স্বর্গলক্ষী পরবর্তীকালে ঋষিকন্যা হয়ে তপস্যা করে পান্ডবগণকে পতিরূপে লাভ করেন।

ব্যাসদেব বললেন—"মানুষের বিবাহে এরূপ বিধান নেই, তবে পান্ডবগণ দেবতার অবতার দ্রৌপদী স্বর্ণলক্ষীর অবতার; সুতরাং, পূর্বসুকৃতিবশত এবং মহাদেবের অনুগ্রহে এক দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের পত্নী হবেন।" দ্রৌপদীর বিবাহ নিয়ে প্রশ্ন, বিবাহ অনুষ্ঠিত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়।

যদি শোনেন, বর্তমানে কোনো মেয়ে একসাথে পাঁচ ভাইকে বিয়ে করে দিব্যি সংসার করছে আপনি হয়তো চমকে যাবেন। এটা শুনে নিশ্চয় প্রথমে অবাক হবেন আর তারপর ভাববেন ভারতের মত জায়গায় যেখানে নারীবাদীরা পান থেকে চুন খসলেই অবরোধে নামেন। সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল জুড়ে লেখালেখি করে ছয়লাপ করেন তারা এবিষয়ে নিশ্চুপ কেন?

অনেক আলোচনা হল দ্রৌপদীকে নিয়ে এবার আলোচনায় আসছি 'দ্রৌপদী প্রথা' নিয়ে। এই প্রথার জন্য আমাদের যেতে হবে দেবভূমিতে।

চলুন যাওয়া যাক উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে। সেখানে মেয়েদের সাথে এমন ঘটনায় ঘটে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। দ্রৌপদীর মতোই এখানকার অনেককেই একই পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের সাথে বিয়ে করতে হয়। আসুন আপনাদের সাথে কলিযুগের দ্রৌপদীদের পরিচয় করিয়ে দিই এবং জেনে নিই কী কারণে তাদের এমন কাজ করতে হয়।

কিছু ব্যক্তিগত কারণের জন্য উত্তরাখণ্ডের এই দ্রৌপদীদের নাম গোপন রেখে পরিবর্তে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করা হল।

উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা দিপ্তীর বয়স ১৯-এর আশেপাশে। তাকে বিয়ে করতে হয়। একই

পরিবারের পাঁচ ভাইকে। শুনলে অবাক লাগতে পারে যে দিপ্তীকে কিন্তু সব ভাইয়ের সাথে একইরকম ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ সামাজিকভাবে স্ত্রী হওয়ার কারণে পাঁচ ভাইয়ের সাথেই শারীরিক সম্বন্ধ করতে হয়। এটা ভেবেই অনেকে ভয়ে বিয়ের আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তা না হলে আত্মহত্যা করে।

দিপ্তী এভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতে করতে স্বাভাবিকভাবেই একদিন গর্ভবতী হয়ে পড়ল। দিপ্তীর গর্ভে জন্ম নিল এক পুত্রসন্তান। দিপ্তী সন্তানের জন্ম দিল ঠিকই কিন্তু সে নিজেও জানে না তার সন্তানের আসল বাবা কে। দীপ্তির পাঁচ স্বামীর এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রথমদিকে খারাপ লাগলেও এখন আর কোনো সমস্যা নেই। দিপ্তী আর তার সন্তানকে নিয়ে বেশ সুখেই সংসার করছে।

এবার আরেক মেয়ে তিতলির পাঁচ স্বামীকে নিয়ে ঘর সংসার করার গল্প। বছর সাত আগে তিতলির হিন্দু রীতি-রেওয়াজ মেনে বিয়ে হয়, সুধীরের সাথে। তারপরই তিতলিকে তার স্বামীর অন্য চার ভাইয়ের সাথেও বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তিতলির কথায়, "আমার এধরণের সম্পর্কে কোনো আপত্তি নেই, বরং আমি নিজেকে বেশ সৌভাগ্যবতী মনে করি কারণ আমি পাঁচ স্বামীর ভালোবাসা পায়। আমার পাঁচ স্বামীই আমাকে ভীষণ ভালোবাসে এবং সবাই আমার খেয়াল রাখে ও যত্ন করে।

পাঁচ স্বামীই ভালোবাসে তিতলিকে। তিতলি নিজেও জানে যে, আমাদের দেশে এরকমভাবে একাধিক বিয়ে করা বেআইনি, কিন্তু সে নিজের অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়ে বলে, "আমাদের এখানে মেয়ের সংখ্যা খুবই কম, তাই বাধ্য হয়েই আমাদের এই কাজ করতে হয়। এমতাবস্থায় এই জায়গায় এরকমই রীতি রয়েছে যে, বাড়ির এক ভাইয়ের সাথে যে মেয়ের বিয়ে হবে, সেই মেয়েটিকে তার স্বামীর বাকি ভাইদের অর্থাৎ দেওরদের বিয়ে করতে হবে।

নির্দিষ্ট প্রথা মেনেই হয় বিয়ে। এই প্রথা আমাদের অঞ্চলের বেশিরভাগ পরিবারেই পালন করে। পাঁচ ভাইয়ের সাথে বিয়ে করে তাদের সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করার জন্য আমাকে অনেকেই কলিযুগের দ্রৌপদী নামে অভিহিত করে।"

পাহাড়ের আরেক দ্রৌপদী বলছেন, "শৈশব শেষে মাত্র কৈশরে পা দিলাম ঠিক তখনি আমার বিয়ে হয়ে যায়। জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে সংসার করতে হয় একই পরিবারের তিন ছেলের সঙ্গে এবং আমাকে বাধ্য করা হয় প্রতিটি ছেলের সংসারে অন্তত একটি করে ছেলে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। আমি পারিনি।" সে বলে এলাকার বৃদ্ধরা বলে, "এই প্রথার ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে না, আবার সম্পত্তি, জায়গা-জমি ভাগ বাটোওয়ারার ঝামেলাও থাকে না।"

এক সরকারি সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে জানা যায় দ্রৌপদী প্রথা অনেকের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। বিশেষ করে কিশোরী এবং তরুণীদের কাছে। উত্তরাখণ্ড ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু গ্রামে গেলে দেখা মেলে একজন করে দ্রৌপদীর। অর্থাৎ, একই পরিবারের একাধিক ছেলের জন্য একজন স্ত্রী রয়েছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে এ প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে—"অনন্তর দেবগণ প্রজাসকলের উপকার করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম তেজোভাগ দ্বারা স্বর্গ হতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম ইন্দ্রদেহজাত সেই তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। পবনদেব ইন্দ্রসম্বন্ধীয় যে তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাতে ভীমসেনের জন্ম হয় এবং কুন্তীগর্ভেই ইন্দ্রের বলার্ধ দ্বারা অর্জুনের জন্ম হয়। আর ইন্দ্রের লাবণ্যধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা মাদ্রীগর্ভে নকুল ও সহদেব নামে যমজ কুমারের জন্ম হয়। সুতরাং ইন্দ্রই এই পাঁচ অংশে অবতীর্ণ হন।" মার্কন্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে একই কথা। দ্রৌপদী হল ইন্দ্রপত্নী শচী। তাই এখানে দ্রৌপদীর বিবাহ পঞ্চপান্ডবরূপী ইন্দ্রের সঙ্গেই হয়েছে।

অনেক মহাভারত বিশ্লেষক এই প্রশ্ন হামেশাই করেন কুন্তী কেন তাঁর বাক্য ফিরিয়ে

নিলেন না। মাতা কুন্তী তাঁর বাক্য ফিরিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা নেননি, কারণ সে-সময় কথার অনেক মূল্য ছিল। ধার্মিকগণ তাঁদের সত্যতা, বচন রক্ষা করতেন। দশরথ কৈকেয়ীকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাকে দুটি বর দেবেন যখন কৈকেয়ী বরস্বরূপ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীরামকে চাইলেন, তখন দশরথ তাঁর কথা ফিরিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ বহির্গত হওয়ার উপক্রম হলেও তিনি তা করেননি। আবার, প্রভু শ্রীরামও পিতৃসত্য পালন করেছিলেন। এমনকি মাতা কৈকেয়ী যখন তার ভুল বুঝতে পেরে শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, তখনও শ্রীরাম প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। আবার, পিতামহ ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে আসীন রাজার প্রতি তাঁর আনুগত্য রাখার বচন হেতু দুর্যোধনের অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন, অর্থাৎ সে সময় বাক্যের অনেক মর্যাদা ছিল। তাই কুন্তীদেবী দ্রৌপদীর প্রতি কোনো অবিচার না করেই তার বাক্য রক্ষা করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন।

পান্ডবরা মায়ের আদেশ মেনে নিয়েছিলেন কারণ মা গুরুসম। তাই, মায়ের আদেশ সন্তানের উলঙঘন করা উচিত নয়। কুন্তী ভুল করে বলে ফেললেও তা পঞ্চপান্ডবদের প্রতি ছিল আদেশস্বরূপ।

অনেকেরই প্রশ্ন, দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন? এই প্রশ্ন শুধু আমাদেরই নয়। মহাভারতে পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় নিজেই এ প্রশ্ন করেছেন-“একা দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের ধর্মপত্নী হয়ে কীভাবে ধর্ম রক্ষা করে চলতেন?” উত্তরে বৈশম্পায়ন সবিস্তারে পাণ্ডবগণের সাথে দ্রৌপদীর আচরণ বর্ণনা করেন। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর পান্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন। নারদ মুনি সেখানে হাজির। অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর নারদ মুনি পান্ডবদেরকে বললেন—“ দ্রৌপদী তোমাদের ধর্মপত্নী, তাই দ্রৌপদীকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে যেন বিবাদ উপস্থিত না হয়, তেমন নিয়ম করো। কারণ, পুরাকালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভাইয়ের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিলোত্তমা নামে এক স্ত্রীর জন্য পরস্পরকে বধ করে।” তারপর নারদ মুনি তাদের সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী সবিস্তারে বললেন। নারদ মুনির কথা শোনার পর পান্ডবরা দেবর্ষি নারদের সমক্ষে একটি নিয়ম করলেন যে, “ দ্রৌপদী একেক জনের ঘরে একেক বৎসর অবস্থান করবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ দ্রৌপদীর সঙ্গে বসবাসকালে, অন্য যে কেউ সেখানে প্রবেশ করলে, বারো বছর বনে বাস করবেন।” দ্রৌপদী এক বছর এক পতির গৃহে বাস করার পর যখন অন্য পতির গৃহে যেতেন, তখন অগ্নিসম্ভূতা দ্রৌপদী অগ্নিস্নান করতেন।

এবার একটু কিন্নর কৈলাসের পথে যাওয়া যাক। কারণ কিন্নর কৈলাসেও রয়েছে এই দ্রৌপদী প্রথা। হিমাচলের কিন্নর অঞ্চলে আজও এক তরুণীর সঙ্গে একই পরিবারের সব ভাইদের বিয়ে দেওয়া হয়। এখানে মহিলাদের বহুবিবাহের প্রথা চালু আছে। এখনও রয়েছেন দ্রৌপদীও।

এখানকার স্থানীয়দের বিশ্বাস, পাণ্ডবরা যখন রাজ্য থেকে ১৩ বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা এই কিন্নরেই লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই নাকি মহিলাদের বহু বিবাহের প্রচলন শুরু হয়। এই অঞ্চলের বহু কিন্নর এখনও নিজেদের পাণ্ডবদের বংশধর হিসেবে দাবি করেন। তবে এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কারণ মহাভারতে পাণ্ডবদের অনেক আগে থেকেই কিন্নরদের কথা উল্লেখ আছে। সেখানে এখনও একই পরিবারের সব ভাইদের সাথে একটি তরুণীর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পর সন্তান জন্ম দিলে পরিবারের সবচেয়ে বড় ভাইকে বাবা বলে সম্বোধন করে এবং বাকি ভাইরা কাকা।

কিছু সচেতন ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও তাদের সংখ্যা অনেক কম। রক্ষণশীল সমাজের সামনে তাদের নীতি কথা কাজে আসে না। উলটে রক্ষণশীল সমাজ এই ‘দ্রৌপদী প্রথা’র অনেক ভালো দিকও বের করেছে। তাদের মত, ছেলের বিয়ের সময় যাতে জমির ভাগাভাগি করতে না হয়, তাই এক তরুণীর সাথে পরিবারের সব ভাইদের বিয়ে দেওয়া হয়। পাহাড়ের এই রেওয়াজ পুরনো। কিন্নরের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি এখন আগের থেকে

অনেক ভাল। তাই এই প্রথার চল আগের থেকে অনেকটাই কমেছে।

কিন্তু কেন এরকম রীতি? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল আর্থিক-সামাজিক পরিস্থিতি। পাহাড়ি, দুর্গম এলাকায় কিন্নরের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। প্রতিটি পরিবার পিছু ছিল অল্প কিছু জমি। সেই জমি ভাগাভাগি করে নিলে প্রত্যেক ভাইদের ভাগে যেটুকু জমি থাকত তা দিয়ে সংসার চালান ছিল অসম্ভব।

দ্রৌপদী সম্ভবত পুরাণের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও বিতর্কিত নায়িকা। পাঁচ স্বামীর সঙ্গে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে দ্রৌপদী বাস করতে পারেন, নারদ মুনি নিয়ম করে দেন, দ্রৌপদী এক বছর এক স্বামীর সঙ্গে থাকবেন। অন্য স্বামীরা তখন অপেক্ষা করবেন। এক বছর পর অগ্নির ভেতর দিয়ে গিয়ে পুনরায় পবিত্র ও সতী হয়ে তিনি দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে থাকতে শুরু করবেন। এভাবে প্রতি স্বামীকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে এক বছর দ্রৌপদীর সঙ্গলাভের জন্যে। অর্জুন একদা এই নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে তাঁকে এক বছরের জন্যে ব্রহ্মাচর্যে যেতে হয়েছিল আরও দূরের এক বনে। সেখানে গিয়ে অবশ্য অর্জুন ব্রহ্মাচর্যের বদলে আরও তিনখানি বিয়ে করেন-চিত্রাঙ্গদা, কৃষ্ণের বোন সুভদ্রা ও উলুপীকে।

দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদেরকে শুধু শান্তিতে রাখেননি, সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে সামান্য কিছু খেয়ে সারাদিন সমস্ত কাজকর্ম শেষে সকলের পরে শুতে যেতেন। তবে দ্রৌপদী একটা নিয়ম করে দেন তাঁর স্বামীদের, যা তাঁদের মেনে চলতে হয়। দ্রৌপদী জানতেন তাঁর স্বামীদের কারো কারো আরও স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদীর নির্দেশে তাঁরা কেউ প্রাসাদে ঢুকতে পারতেন না। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে হলে তাঁর স্বামীদের বাড়ির বাইরে গিয়ে সেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে হতো। কৃষ্ণের সহোদরা অর্জুনের স্ত্রী সুভদ্রার বেলায় শুধু এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়েছিলেন দ্রৌপদী। পাঁচ স্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকলেও কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার কাছে দ্রৌপদী স্বীকার করেছেন, পাঁচজন স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে তাঁকে কতগুলো কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হয়। দ্রৌপদী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বাস্তববাদী নারী। তিনি তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্যে প্রতিশোধ চাইতেন, মুখ বুজে সহ্য করতেন না অবিচার। প্রতি স্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর একটি করে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর পাঁচটি পুত্রকেই ঘুমন্ত অবস্থায় বধ করে অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামার মা একজন ধর্মপ্রাণ নারী ও গুরু। সেই বিবেচনায় এবং পাঁচ পুত্রকে হারিয়ে নিজের শোকাতুর অবস্থা অনুধাবন করে সকলের পরামর্শ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করে অশ্বত্থামাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। দ্রৌপদী চান না তাঁর মতো করে আর একটি মা এমন প্রচন্ড শোকে পান্ডুর হোক।

উত্তরাখণ্ড, হিমাচল, উত্তরপ্রদেশের মত পঞ্জাবের লুধিয়ানা, জলন্ধরের মত কয়েকটি এলাকায় মহাভারতেই দোহাই দিয়ে 'দ্রৌপদী প্রথা'-র নামে সাত বা আট ভাই একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে ভাগাভাগি করে নেয়। এধরনের প্রথা প্রাচীনযুগে কেরালার তিয়ান্স সম্প্রদায় এবং তিব্বতীয় উপজাতীয়দের মাঝে প্রচলিত ছিল।

এইসব 'বিয়ে' কখনোই ধর্মীয় বা সামাজিক বিধি-বিধান মেনে হয় না। তাই এ সংক্রান্ত কোনও প্রমাণপত্র বা সাক্ষী-সাবুদ একেবারেই পাওয়া যায় না। আর তাই হিন্দু বিবাহ আইন বা ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনও ধারাই একে শাস্তিযোগ্য বা অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। উত্তরাখণ্ডের এক উচভপদস্থ কর্মকর্তা লিখছেন, "এ ধরনের কোনও প্রথা প্রচলন, সমাজে যার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তা ঠেকানো কঠিন। কোনও নারী এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হয়েছে এমন ঘটনাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অপরদিকে এ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এসব গ্রামে সমাজপতি আর পরিবারগুলোর মাঝে রয়েছে মজবুত এক সমঝোতা।"

পুরাণ, বায়ু পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কারণ বর্ণিত রয়েছে।

অলৌকিক মিথে ঘেরা অমরনাথ

হিমালয়ের আলোচনা হচ্ছে অথচ অমরনাথের কথা হবে না তা কখনো হতে পারে। অমরনাথ যাত্রা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। আর তার জন্য মুখিয়ে থাকেন হিন্দু দর্শনার্থীরা। অমরনাথ হিন্দুদের প্রধান তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে একটি, যা ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে অবস্থিত। এটি একটি শৈব তীর্থ। অমরনাথের গুহাটি সমতল থেকে ৩,৮৮৮ মিটার বা ১২,৭৫৬ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

এই তীর্থ ক্ষেত্রটি হিন্দুদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত। গুহাটি পাহাড় ঘেরা আর এই পাহাড় গুলি সাদা তুষারে আবৃত থাকে বছরের অনেকটা সময় ধরে। এমনকি এই গুহার প্রবেশপথও বরফে ঢাকা থাকে।

গ্রীষ্মকালে খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই দ্বার প্রবেশের উপযোগী হয়। তখন লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী অমরনাথের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। অমরনাথের গুহাতে চুইয়ে পড়া জল জমে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করে। জুন-জুলাই মাসে শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় অমরনাথ যাত্রা। শেষ হয় জুলাই-অগস্ট মাসে গুরু পূর্ণিমার সময় ছড়ি মিছিলে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অমরনাথ যাত্রায় যোগদান করেন।

পৌরাণিক মতে, পার্বতীকে গোপনে সৃষ্টি রহস্য বোঝাতে নির্জনে পাহাড়ে গুহা নির্মাণ করেছিলেন মহাদেব। অমরনাথে কবে থেকে তীর্থ যাত্রা শুরু হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। একটি তথ্যসূত্র থেকে ধারণা করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে রাজা আরজরাজা বরফ নির্মিত এই শিবলিঙ্গে পুজো দিতেন। ধারণা করা হয় রানি সূর্যমতী ১১ শতকে অমরনাথের এই ত্রিশূল, বানলিঙ্গ ও অন্যান্য পবিত্র জিনিসগুলি উপহার দেন। এছাড়াও প্রাচীন শাস্ত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মধ্যযুগে অমরনাথের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল কিন্তু ১৫ শতকে তা আবার আবিষ্কৃত হয়। প্রচলিত আছে কাশ্মীর একসময় জলে প্লাবিত হয়ে যায় এবং কাশ্যপমুনি সে জল নদীর মাধ্যমে বের করে দেন। তারপর ভৃগুমুনি অমরনাথ বা শিবের দেখা পান। এভাবে আবার অমরনাথের প্রচার শুরু হয়। বর্তমানে প্রতি বছর কয়েক লাখ মানুষ অমরনাথ যাত্রা করেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ১৪১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই তীর্থে যেতে পহেলগাও শহর অতিক্রম করতে হয়। পহেলগাও থেকে অমরনাথ যেতে পাঁচ দিন সময় লাগে। অমরনাথে যাওয়ার জন্য আগে প্রত্যেক যাত্রীর রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। সেটি অত্যন্ত জরুরি। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড (SASB) যাত্রা শুরুর মোটামুটি মাসখানেক আগে যাত্রা শুরুর ও শেষের তারিখ ঘোষণা করা হয়। জম্মু-কাশ্মীর ব্যাংক থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে হয়। পূরণ করা ফর্মটি ২টি পাসপোর্ট ছবি ও শারীরিক সক্ষমতার ডাক্তারি শংসাপত্রসহ নিকটবর্তী জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের অফিসে জমা দিতে হয়। এছাড়া আপনি চাইলে স্থানীয় কিছু নির্দিষ্ট উল্লিখিত ব্যাংক বা সরকারি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। সেখান থেকেও আগাম পারমিশন করিয়ে অমরনাথ যাত্রা করতে পারেন।

তীর্থ যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন যাত্রাপথে বিনামূল্যে খাবার, চিকিৎসাসেবা ও বিশ্রামের জন্য তাঁবু সরবরাহ করে থাকে। মন্দিরের কাছে স্থানীয়রা শত শত তাঁবুর ব্যবস্থা করে তীর্থযাত্রীদের রাত্রি যাপনের জন্য। জম্মু থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরবর্তী কাটরা পর্যন্ত বাস ও ভাড়া গাড়ি চলে। শেষ ১৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছোতে হয় মন্দিরে। যাঁরা হাঁটতে পারবেন না তাঁদের জন্য রয়েছে ডান্ডি ও ঘোড়ার ব্যবস্থা। কাটরা শহরের ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে যাত্রা-স্লিপ অর্থাৎ 'পরচি' সংগ্রহ করতে হয়। পুজোর উপকরণ আর নগদ টাকা পয়সা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ নিষেধ। নিকটতম রেলস্টেশন জম্মু। জম্মু থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরবর্তী কাটরায় নিয়মিত বাস যায়।

শৈবতীর্থ হিসেবে অমরনাথকে এক বিশেষ গুরত্ব প্রদান করে হিন্দু ঐতিহ্য। দ্বাদশ

জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে পরিগণিত না হলেও তুষারলিঙ্গ অমরনাথের মহিমা একেবারেই স্বতন্ত্র। এখানে সন্নিবিষ্ট হল অমরনাথ-সংক্রান্ত ৮টি তথ্য, যা পুরাণ এবং শৈব ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত।

১। পুরাণ অনুসারে, শিব পার্বতীকে অমরত্ব শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে অমরনাথ গুহাকে বেছেছিলেন।

২। পহলগাম, যেখান থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়, সেই স্থানে শিব তাঁর ষাঁড় নন্দীকে রেখে গিয়েছিলেন। চন্দনওয়াড়িতে তিনি তাঁর শিরস্থ চন্দ্রকে রেখে যান এবং শেষনাগে তিনি তাঁর দেহে বিচরণরত সর্পকুলকে রাখেন। গণেশকে রাখেন মহাগণেশ পর্বতে। তার পরে বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকাকে রাখেন পঞ্জতরণী নামক স্থানে। প্রায় সব নির্মোক ত্যাগ করেই তিনি পার্বতীকে নিয়ে অমরনাথের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

৩। যখন শিব পার্বতীকে অমরত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করছিলেন, তখন সেখানে কোনো জীবিত প্রাণী ছিল না। কেবল একটি পায়রার ডিম সেখানে থেকে গিয়েছিল। কথিত আছে এই ডিম থেকে একজোড়া পায়রা জন্মায়। এবং তারা অবধারিতভাবে অমরত্ব লাভ করে। এদের নাকি আজও গুহার ভেতরে দেখা যায়।

৪। অমরনাথ গুহাটি আবিষ্কার করেন বুটা মালিক নামে এক মুসলমান মেষপালক। তিনি এখানে এক সন্ন্যাসীর দেখা পান। সন্ন্যাসী তাঁকে একটা থলিতে কিছু কয়লা দান করেন। পরে সেই কয়লা সোনায় পরিণত হয়। বুটা সেই স্থানে ফিরে যান। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পাননি। বদলে তিনি অমরনাথ লিঙ্গ দেখতে পান।

৫। অমরনাথ তুষারলিঙ্গের বৃদ্ধি চন্দ্রকলার উপরে নির্ভরশীল। শিবলিঙ্গ ছাড়াও আরও দু’টি লিঙ্গ এই গুহায় রয়েছে। এদের পার্বতী ও গণেশ মনে করা হয়।

৬। অমরনাথ গুহার বয়স আনুমানিক ৫০০০ বছর।

৭। প্রতি বছর অগণিত মানুষ অমরনাথ যাত্রা করেন। শ্রাবণে এই যাত্রা শুরু হয়।

৮। দু’টি পথে অমরনাথ যাত্রা সম্পন্ন হয়—পহলগাম রুট এবং এবং বালতাল রুট।

পাতালে প্রবেশের আশ্চর্য এক গুহা

'পাতাল' প্রায় সব সংস্কৃতির এক কমন বিষয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যেমন আকাশকে নিয়ে ভেবেছে, তেমনই ভেবেছে পাতালকে নিয়ে। মাটির নিচে কী আছে তা নিয়ে সবারই এক অপার বিস্ময় পাতালকে নিয়ে। পাতাললোকের রহস্য নিয়ে মানুষের গবেষণার অন্ত নেই। পুরাণ হোক কিংবা আধুনিক সাহিত্যে পাতাল নিয়ে নানা ব্যাখ্যা রয়েছে সর্বত্র। সাহিত্যিক জুলে ভার্নের কল্পনাতেও পাতাল এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। তিনি তাঁর নিজস্ব মহিমায় উপস্থাপিত করেছেন পাতালকে।

গ্রিক পুরাণের দেবতা হাডেসকে পাতালের অধীশ্বর বলে বলা হয়েছে। অন্যদিকে 'রামায়ণ'-এ উল্লিখিত মহীরাবণ পাতাললোকেরই বাসিন্দা। আবার বিভিন্ন হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রে পাতাল অর্থে নরককেই বোঝানো হয়েছে। অনেকের মতে স্বর্গ- মর্ত্য-পাতালের মধ্যে পাতাল পৃথিবীর একেবারে নীচের গভীর অংশে স্থিত, যেখানে সাধারণের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রকারদের মতে যমরাজ পাতাললোকের অধীশ্বর। একটু রামায়ণের কথা মনে করুন সীতার পাতালপ্রবেশের সেই অধ্যায়। যেখানে সীতা বলছেন, "হে ধরিত্রী তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও। আমি তাতে প্রবেশ করব।"

এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। পাতালের এইসব অনুষঙ্গ আমাদের একটা প্রশ্নে এনে দাঁড় করায়। সেটা এই— পাতালে প্রবেশের কোনো দ্বার কি সত্যিই রয়েছে? না, কোনো খনিগর্ভ বা মানব-সৃষ্ট গহ্বর নয়, এমন কোনো দ্বার, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিংবদন্তি-পুরাণ কিংবা কোনো রহস্য ?

পাতাল নিয়ে এত কথা কেন এল? পাতালেপ্রবেশ আদৌ সম্ভব কিনা তার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমারা পৌঁছে যাব হিমালয়ের এক গ্রামে। হিমাচলপ্রদেশের সেই গ্রামে গিয়ে অবাক হবেন এটা শুনে যে সেখানে আছে পাতালে প্রবেশের এক আশ্চর্য গুহা।

ব্যস লেগে পড়ুন গুহার খোঁজে। গুহা খুঁজতে হলে প্রথমেই পৌঁছে যান হিমালয়ের কোলে পিথোরাগড় জেলায়। হিমাচল প্রদেশের এই জেলাতেই গঙ্গোলিহাট বলে রয়েছে একটি ছোট্ট শান্ত জনপদ। তারই ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পাতাল ভুবনেশ্বর মন্দির। নামেই মন্দির, আসলে এই একটি প্রাকৃতিক গুহা। সরু গুহামুখ দিয়ে কার্যত হামাগুড়ি দিয়ে টেনে-হিচড়ে পাতালে অর্থাৎ মাটির নীচে নামতে হবে। প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় ৯০ মিটার নীচে রয়েছে এক অত্যাশ্চর্য গুহামন্দির। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ মিটার। এটাই পাতাল ভুবনেশ্বর নামে পরিচিত, যাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি।

আচ্ছা গুহার গল্পে যাওয়ার আগে কীভাবে গাঙ্গোলিহাট পৌঁছোবেন তা একটু জেনে নেওয়া যাক। কাঠগুদাম বা হলদোয়ানি থেকে যারা গঙ্গোলিহাটের উদ্দেশে যাত্রা করবেন, তাদের জন্য তিনটি পথ আছে। প্রথমটি রামগড়-মুক্তেশ্বর হয়ে, দ্বিতীয়টি ধানাচুলি-নাটাডল হয়ে, আর তৃতীয়টি ভীমতাল-আলমোড়া-বেরিনা হয়ে একটি রাস্তা। প্রতিটি পথই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ভরা। আবার কৌশানী থেকে আলমোড়া-রানিখেত হয়েও পৌঁছে যাওয়া যায় পাতাল ভুবনেশ্বর। হাওড়া থেকে সরাসরি কাঠগোদাম যাওয়ার জন্য একটি ট্রেন আছে। এছাড়া হাওড়া থেকে সপ্তাহে একদিন ছাড়ে লালকুয়া এক্সপ্রেস। সেটিও কাঠগোদামের দুটি স্টেশন আগে পর্যন্ত যায়। কাঠগোদাম, হলদোয়ানি বা লালকুয়া থেকে গাড়িতে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় পাতাল ভুবনেশ্বর।

পাতাল ভুবনেশ্বর মন্দির আসলে একটি গুহা। ১০ মিটার গভীর ১৬০ মিটার চওড়া এই গুহা। শারীরিক কারণে অনেকেই আগে থেকে গুহার ভেতরে না ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। বয়স্ক অসুস্থ মানুষরা যাতে ভেতরে প্রবেশ না করেন, এমন অনুরোধ লেখা আছে বোর্ডে। আর তা দেখে বয়স্করা ফিরে যান। কেউ বলেন অপরিসর প্রবেশপথ, তার ওপর ৮২ ধাপ সিঁড়ি নামতে হবে তা শুনে অনেকেই পিছিয়ে যান। কেউ কেউ শিকল ধরে ঝুলে নামতে হবে দেখে রিস্ক নেন না। সবমিলিয়ে একটা বয়সের পর দু-একজন বেপরোয়া রিস্ক নিয়ে পাতালপ্রবেশ করেন।

আর যারা ভেতরে ঢোকেন তারা ফেরেন নায়কের মতো। তাদের ঘিরে ছোটোখাটো ভিড় জমে যায়, অভিজ্ঞতা শোনার জন্য। আপনার দেখে মনে হবে এরা বুঝি কোনো শৃঙ্গ জয় করে ফিরলেন। আর যারা পাতালপ্রবেশ করলেন না!

কয়েক শতাব্দীর মিথ আর বিশ্বাস জড়িয়ে আছে এই মন্দির ঘিরে। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে এই গুহার কথা। এই গুহা আবিস্কার নিয়ে এক কাহিনি আছে। রাজা ঋতুপর্ণ একবার জঙ্গলের মধ্যে এক হরিণের পিছু ধাওয়া করেন কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছিলেন না। যতবার শর সন্ধান করতে যান ততবার ব্যর্থ হন। এক সময় হরিণ তার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়। তাকে অনুসরণ করতে করতে রাজা এক গুহার সামনে উপস্থিত হন। গুহার দ্বাররক্ষী শেষনাগ ঋতুপর্ণকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়। রাজা সেখানে অমরনাথ, কেদারনাথ সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির দর্শন লাভ করেন। সেখানে রাজা প্রচুর ধনরত্ন ও অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন। শেষনাগ রাজাকে গুহার কথা কাউকে বলতে নিষেধ করে দেয়। একথা কাউকে বললে রাজার মৃত্যু হবে এমন কথাও বলে দেয়। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে ঋতুপর্ণ তার রানির কাছে গুহার কথা বলে ফেলায় তৎক্ষনাৎ তার মৃত্যু হয়। এর পর রানি গুহায় আসেন এবং ভেতরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি নির্মাণ করেন।

আবার কারও মতে, স্বয়ং মহাদেব নাকি সত্যযুগে এই গুহা নির্মাণ করেছিলেন। কলিযুগে আদি শঙ্করাচার্য এই গুহায় সাধনা করেন। 'স্কন্দপুরাণ' থেকে জানা যায়, ঋতুপর্ণ মারা যাওয়ার পর গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। আদি শঙ্করাচার্য সেই গুহাটিকে খুঁজে পান ও পুনরায় পাতাল ভুবনেশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করেন।

লোকবিশ্বাস, এই গুহাটির নাকি পৃথিবীর সমান বয়স। গুহায় প্রবেশ করতে গেলে ৮২টি ধাপ বেয়ে নামতে হয়। গুহার ভেতরে অক্সিজেনের অভাবও রয়েছে। গুহার বাইরে বিজ্ঞপ্তি রয়েছে—'দুর্বলহৃদয় ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধ'। কিন্তু হৃদয় সামলে প্রবেশ করলে দেখা মিলবে আশ্চর্য সব স্ট্যালাগমাইটের। যাদের এক একটির আকৃতি কোনো না কোনো হিন্দু দেবতার মতো। সেই সঙ্গে রয়েছে 'মহাপ্রস্থান'-এ যাওয়ার পথ। যা নাকি পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাকৃতিক-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপের এক শৈল্পিক প্রকাশ এই পাতাল ভুবনেশ্বর । গুহার প্রবেশপথটি এক থেকে দেড় মিটার চওড়া। ফলে উলটো মুখে, প্রথমে শরীরের নিম্নাংশ ভেতরে ঢুকিয়ে পাতাল প্রবেশ শুরু করতে হয়। তারপর শরীরটিকে টেনে- হিচড়ে নীচের দিকে নামাতে হয়। গাইড ছাড়া এখানে প্রবেশ করবেন না। পাতালে নামতে শুরু করবেন আর আপনার কানে আসবে 'জয় পাতাল ভুবনেশ্বরের জয়' পাতাল ভুবনেশ্বরের ধ্বনিত কেঁপে ওঠে পাতালপথ।

গুহার দুপাশে লোহার রড ও শিকল ধরে ভেজা স্যাঁতসেঁতে পথেই নীচে নামতে হবে আপনাকে। কথিত আছে এটিই অনন্তনাগের পিঠ। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী শেষনাগের পেটেই হল এই পাতাল ভুবনেশ্বর গুহা। ফলে সেই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে প্রায় চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি আপনাকে নামতে হবে। যেগুলি সিঁড়ি বললেও সিঁড়ি নয়, আসলে এবড়োখেবড়ো পাথরখণ্ড। তা বেয়ে নেমেই খানিকটা খোলামেলা জায়গা। খোলামেলা মানে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় এই আর কী। আন্দাজ আপনি মূল ভূমিতল থেকে প্রায় ৩০ মিটার নীচে এসে পড়েছেন। গুহার চারপাশে আলো-আঁধারি নানান রহস্য। আপনার মনমধ্যে একটা ভয় কাজ করবে। আপনি পাতালে প্রবেশ করেছেন, চারপাশের পরিবেশ আপনাকে এক অন্য জগতে নিয়ে যাবে।

আসলে এ এক অপার রহস্যই বটে, তেত্রিশকোটি দেবতাই যেন ঠাঁই নিয়েছেন এই পাতাললোকে। কত যুগ-যুগান্ত ধরে চুনাপাথরের গুহায় জল চুইয়ে চুইয়ে বালি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হওয়া এক একটি অপার ঐশ্বর্যের স্থাপত্য গড়ে উঠেছে প্রকৃতির আপন খেয়ালে।

ভূ-রাসায়নিক স্ট্যালাগমাইট আর স্ট্যালাগমাইটের মধ্যে মিশে গেছে পৌরাণিক

গল্পগাথা। গণেশের মাথা কাটা যাওয়ার কাহিনি, সমুদ্রমন্থনের কাহিনি, পবননন্দনের পাতাল অভিযানের কাহিনি। গুহায় ঢুকেই দেখতে পাবেন মহা জটাজুটধারী মহাদেবের মূর্তি প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তারই নীচে অসংখ্য শিবলিঙ্গ। ওপর থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে দুধ। সে কোন অনন্তকাল থেকেই এই প্রক্রিয়া হয়ে চলছে। গুহার ভেতরে চারিদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পৌরাণিক মূর্তি দেখতে পাবেন। যা প্রকৃতির আপন খেয়ালেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে গুহার নীচে অক্সিজেনের অভাব থাকে। তাই বেশিক্ষণ থাকলে শ্বাসকষ্ট হবে। তাই চক্ষু সার্থক করে একইপথে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসুন। শান্ত ও স্নিগ্ধ হিমালয়ের অনুভূতি পেতে হলে একরাত থাকতেই পারেন পাতাল ভুবনেশ্বরে। এখান থেকেও পঞ্চচুল্লি শিখরের দর্শন মেলে।

অতীতের কোনো এক সময়, এই বাংলার কোনো এক গাঙ্গুলিমশাই এই অঞ্চলে এসে হাট স্থাপন করেন, তিনি একটি কালীমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানে। গাঙ্গুলিমহাশয়ের নাম অনুযায়ী, এলাকার নাম হয় গঙ্গোলিহাট। আবার স্থানীয় লোকগাথা অনুযায়ী, সরযু ও রামগঙ্গা এই এলাকায় মালার মতো শোভা পায়। স্থানীয় ভাষায় এই দুই নদী 'আওয়ালি' মানে 'মালা' র মতো শোভা পায় বলে এই এলাকার নাম হয়েছে গঙ্গোলিহাট। গঙ্গা এবং আওয়ালি মিলে 'গাঙ্গোলি'। আর ঘাট মানে বাজার।

যমরাজ আর চিত্রগুপ্তের দেখা মেলে যেখানে

হিমাচলের রহস্য খুঁজতে খুঁজতে এবার একটু অন্য ধরনের একটা মন্দিরে যাওয়া যাক। যমরাজ আর চিত্রগুপ্তের মন্দির। শুনে একটু আশ্চর্য হলেন। যমরাজ তো মৃত্যুর দেবতা, তা আপনি বেঁচে থাকতে খামোখা যমরাজের মন্দিরে যাবেন কেন? আর চিত্রগুপ্ত যিনি আপনার পাপ-পুণ্যের হিসেব রাখেন তার কাছেই বা আপনি সশরীরে হিসেব দিতে যাবেন কেন? তাই তো! আপনি কেন যমরাজের মন্দির যাবেন! চলুন দেখে নেওয়া যাক এই মন্দির ঘিরে কী রহস্য অপেক্ষা করছে।

দিল্লি থেকে প্রায় ৬00 কিলোমিটার দূরে হিমাচলপ্রদেশের চম্বা জেলায় ভারমোর এলাকায় রয়েছে যমরাজের মন্দির। ভারমোর এলাকার এই প্রাচীন মন্দিরটি ভারতের একমাত্র যমরাজের মন্দির। ধর্মেশ্বর মহাদেব মন্দির নামেই এটি পরিচিত। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে যমরাজ হলেন মৃত্যুর দেবতা। মন্দির সংলগ্ন মানুষজনের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর এই মন্দিরেই মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যমরাজের। সিমলা থেকেই ভারমোর যাওয়া ভালো। দূরত্ব কমবেশি প্রায় ১০ ঘণ্টা। যাত্রাপথের পুরোটাই পড়বে জাতীয় সড়ক ও কাংড়া লিঙ্ক রোড। নিকটবর্তী বিমানবন্দর গাগাল। এটি ভারমোর থেকে ১৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গাগাল থেকে বাস বা যে কোনো গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায় ভারমোর। নিকটবর্তী স্টেশন পাঠানকোট ক্যান্টনমেন্ট। এটিও ভারমোর থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে। পাঠানকোট স্টেশন থেকে বাসে বা যে কোনো গাড়িতে যেতে হবে ভারমোর। ভারমোর ছবির মতো সুন্দর এলাকা। হিমাচলপ্রদেশের কাংড়া উপত্যকার অন্যতম আকর্ষণ এই ভারমোর।

হিন্দু পুরাণ মতে মৃত্যুর দেবতা হলেন যমরাজ বা লোকপাল। শাস্ত্রে কথিত হয়েছে, যমরাজই ছিলেন প্রথম মানুষ, যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর এই প্রথমতার কথা মাথায় রেখে শিব তাঁকে মৃত্যুর অধিপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন। মৃত্যুর পরে স্বয়ং যম, অথবা যমদূতেরা এসে পরলোকে নিয়ে যান মৃত ব্যক্তির আত্মাকে।

জীবদ্দশায় সেই ব্যক্তির কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর পরে তার স্থান স্বর্গে হবে নাকি নরকে হবে তা স্থির করেন যমরাজ। শাস্ত্রে কথিত হয়েছে, মৃত্যুর আগেই যমরাজ কোনো মানুষকে চারটি চিঠি পাঠান, যেগুলিতে নিহিত থাকে তার আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ।

এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে পুরাণে উল্লিখিত 'যম-অমৃতে'র কাহিনি।

যমুনা তীরবর্তী একটি গ্রামে থাকতেন অমৃত নামের এক ঈশ্বরভক্ত মানুষ। তিনি ছিলেন মৃত্যুভয়ে ভীত। তার পরিকল্পনা ছিল, যমকে খুশি করে তিনি অমর হয়ে যাবেন। যমকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করেন তিনি। যম তাঁর তপস্যায় খুশি হয়ে একদিন দেখা দিলেন অমৃতকে।

যম বললেন, "শোনো, জীবদ্দশায় আমার দেখা কেউ পায় না। তুমি পেয়েছ। বলো, কী চাও?"

অমৃত বললেন, "ঠাকুর, আমি অমর হতে চাই।" যা বললেন, "মৃত্যু থেকে কারও মুক্তি নেই। যে জন্মেছে তাকে মরতে হবেই। তবে তোমার ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে আমি তোমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিলাম। তোমার মৃত্যু যে আসন্ন তা বোঝাতে তোমাকে চারটি চিঠি আমি পাঠাব। সেই চিঠিগুলি পাওয়ার পর তুমি নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করো।"

অমৃত নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্মকর্ম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বিলাসব্যসনে মত্ত জীবনযাপন শুরু করল। তার কোনো চিন্তাই রইল না মৃত্যু নিয়ে। সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত রইল যে, মৃত্যুর আগাম ইঙ্গিত যমরাজের কাছ থেকে সে নিশ্চয়ই পাবে। এদিকে তার বয়স বাড়তে থাকল। একসময় তার মাথার চুল পেকে গেল। আরও পরে দাঁত পড়ে গেল। তারপর চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে শুরু করল। একসময় বয়সের ভারে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল সে। তখনও তাঁর কাছে যমরাজের চিঠি এসে পৌঁছোল না। অমৃত নিশ্চিন্ত হয়ে দিনযাপন করতে লাগল। সে নিজেকে অমর ভাবতে শুরু করল।

একদিন রাত্রে হঠাৎ যমদূত এসে হাজির অমৃতের সামনে। অমৃত বুঝল, তাঁর মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে। যমদূতের সঙ্গে সে চলল পরলোকে। মনে তখন যমরাজের প্রতি একরাশ ক্ষোভ তাঁর। যমরাজ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, মৃত্যুর আগে চারটি চিঠি পাঠাবেন তাঁকে, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটি চিঠিও পাঠাননি। যমরাজের সামনে উপনীত হওয়ার পর অমৃত একরাশ ক্ষোভ নিয়ে যমরাজকে বললেন- "আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, মৃত্যুর আগে চারটে চিঠি পাঠাবেন। কিন্তু আপনি তা করেননি। কথা রাখেননি আপনি।" যমরাজ হেসে বললেন, "তুমি কি ভেবেছিলে, আমি কাগজের উপরে নিজে হাতে চিঠি লিখে তোমাকে পাঠাব? মূর্খ তুমি। শোনো, তোমার শরীরই ছিল আমার কাগজ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শারীরিক পরিবর্তনগুলো ছিল আমার কলম, আর সময় ছিল আমার বার্তাবাহক। আমি তোমাকে আমার কথামতো চারটি চিঠিই পাঠিয়েছিলাম। তোমার চুল পেকে যাওয়ার ঘটনা ছিল আমার প্রথম চিঠি, তোমার দাঁত পড়ে যাওয়ার ঘটনা আমার দ্বিতীয় চিঠি, যখন তোমার দৃষ্টিশক্তি কমে আসা শুরু হল তখন তুমি পেলে আমার তৃতীয় চিঠি, আর চতুর্থ চিঠিটি তুমি পেয়েছিলে যখন তুমি পঙ্গু হয়ে গেলে। কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি আমার পাঠানো একটি চিঠিরও পাঠোদ্ধার করতে পারোনি।"

হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, মৃত্যুর আগে যে কোনো মানুষই এই চারটি চিঠি পেয়ে থাকেন। এবং প্রথম চিঠিটি পাওয়ার পর থেকেই নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে। মানবদেহের বয়সোচিত ক্ষয়ই তার মৃত্যুর পূর্বাভাস।

ভারমোর এলাকার প্রাচীন মন্দিরটি ভারতের মাটিতে যমরাজের একমাত্র মন্দির। মন্দিরের নাম ধমেশ্বর মহাদেব মন্দির। মন্দিরের আশেপাশের মানুষজনের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর এই মন্দিরেই নাকি মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যমরাজের। এখানে বসেই তাদের বিচার করেন যমরাজ। কারণ স্থানীয় মানুষজন মনে করেন, স্বয়ং যম এই মন্দিরেই বাস করেন। একা যম নন, এই মন্দিরের একটি আলাদা ঘরে বসে থাকেন চিত্রগুপ্তও। তাঁর কাজ হল, জীবদ্দশায় মানুষের পাপপুণ্যের হিসাব রাখা। মন্দিরটি নাকি পাহারা দেয় দুটি চার চোখওয়ালা কুকুর, যারা আদপে যমরাজেরই পোষ্য।

মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা কাহিনি। বলা হয়, মন্দিরের ভেতর নাকি একটি শূন্য প্রকোষ্ঠ রয়েছে। সেখানে নাকি স্বয়ং যমরাজের শাসন চলে। এই প্রকোষ্ঠে একবার কেউ প্রবেশ করলে সে আর জীবিতাবস্থায় বেরিয়ে আসে না। ইতিপূর্বে কেউ কেউ নাকি সাহস করে এখানে ঢুকেছিলেন, পরের দিন তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

এইসব কাহিনির ব্যাখ্য নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি খোঁজা বৃথা, কারণ ভারতের অনেক মন্দিরে অনেক অলৌকিক কার্যকলাপ হয়, যার ব্যাখ্যা হয় না। তা বলাই বাহুল্য। ভক্তের বিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে এক জায়গায় মেলে না। কিন্তু বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে যমরাজের এই মন্দির বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ভক্তদের কাছে। প্রাচীন এই মন্দির তার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য এবং গঠনগত সৌন্দর্যের কারণে পর্যটকদের কাছেও বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছে।

যমরাজের এই ঘরের চারদিকে রয়েছে চারটি অদৃশ্য দরজা। সোনা, রুপো, তামা আর লোহায় তৈরি। যমরাজ ফয়সালা শোনানোর পরে যমদূত এসে কর্মফল অনুযায়ী এই চারটি দরজার একটি দিয়ে আত্মাকে স্বর্গ বা নরকে নিয়ে যায়। গরুড়পুরাণেও অবশ্য যমরাজের দরবারের চারদিকে এমনই চারটি দরজার কথা উল্লেখ আছে।

মহাদেবের পুনর্জন্ম হয় যে মন্দিরে

ভারতে আরও একটি এমন গ্রাম রয়েছে, যেখানে কৃপাদৃষ্টি রয়েছে স্বয়ং মহাদেবের। তিনি নাকি সর্বদাই বিরাজমান কুলুর 'বিজলি মহাদেব' মন্দিরে। কথিত, কুলান্ত নামে এক দানব একবার মাথান গ্রাম ভাসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাপের রূপ ধরে আটকে দেয় বিপাশা নদীর গতিপথ। কুলান্তের কুকীর্তি মহাদেব বুঝতে পেরে তাকে মারতে উদ্যত হন। বেশ খানিকক্ষণ যুদ্ধ হওয়ার পরে মারা যায় দানব এবং তার সাপের দেহ পরিবর্তিত হয় এক বিশালাকার পাহাড়ে, নাম হয় কুলু।

আর এই কুলুতেই এক সময়ে তৈরি হয় মহাদেবের মন্দির, যা কুলু থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার ট্রেক করলেই পৌঁছোনো যায়। মন্দিরটির ঠিক সামনের দিকেই রয়েছে ৬০ ফুট লম্বা একটি কাঠের পোল। সেখানেই অথবা শিবলিঙ্গের উপরেই বজ্রপাত হয়। তারপরই ভেঙে যায় সেই শিবলিঙ্গ। শোনা যায় স্বয়ং মহাদেবের নির্দেশেই মন্দিরের এক বিশেষ পুজোরী ওই বিচূর্ণ হওয়া শিবলিঙ্গের টুকরোগুলো অতি যত্ন সহকারে মূল শিবলিঙ্গের সঙ্গে মাখন বা ঘি ও ছাতুদিয়ে এক মিশ্রণ বানিয়ে তাকে জুড়ে দেন। আর আশ্চর্যভাবে মাসখানেকের মধ্যেই সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া মূর্তি পুনরায় আগের চেহারায় ফিরে আসে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি কে বলা হয় পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া। স্থানীয়দের বিশ্বাস, গ্রাম ও গ্রামবাসীদের বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচাতে মহাদেব নিজের ওপরেই প্রকৃতির এই কোপ বহন করেন।

বিজলি মহাদেবের মন্দির পৌঁছোতে হয় ১০০০ সিঁড়ি চড়ে। সেখান থেকে কুলু ও পার্বতী উপত্যকার সৌন্দর্য দেখা যায় সম্পূর্ণ ভাবে।

হিমাচলপ্রদেশের কুলু উপত্যকায় দেবাদিদেব শিবের এই মন্দিরে রাখা আছে লিঙ্গরূপী শিবের একটি মূর্তি। সেই লিঙ্গটিকে ঘিরেই রহস্য। বলা হয়, এখানকার শিবলিঙ্গটির মাথায় আকাশ থেকে বাজ পড়ে। ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় লিঙ্গরূপী মহাদেব। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই ঘটনা প্রতি ১২ বছর অন্তর হয়ে থাকে। তবে তাজ্জবের বিষয় হল বিচূর্ণ হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সেই ভেঙে যাওয়া শিবলিঙ্গ এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে জুড়ে গিয়ে পুনরায় আগের চেহারায় ফিরে আসে। তখন দেখলে বোঝার উপায় থাকে না যে এটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এই অদ্ভুত ঘটনাটি প্রথম কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। এই মন্দিরটির বিদ্যুৎ এবং মহাদেবের নামের সঙ্গে মিল রেখে রাখা হয়েছিল। আর বিদ্যুৎ বা বিজলীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এর নাম হয়ে যায় বিজলী মহাদেব।

বিজলি মহাদেবের প্রভাব। অনেকে আবার মন্দিরটিকে বিজলেশ্বর শিবধামও বলে থাকেন। কুল উপত্যাকার বাসিন্দারা মনে করেন, মহাদের কখনোই চান না বজ্রপাতের ফলে কুল উপত্যাকার জনবসতি পশুপাখি এবং প্রকৃতির উপর কোনরকম ক্ষতি হোক। তাই সকলের প্রাণ রক্ষা করতেই দেবাদিদেব নিজের মাথায় সমস্ত বজ্রপাত টেনে নেন। এই অঞ্চলের সমস্ত গৌরবময় কাহিনি এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে পৌরাণিক মতে কুলুর ইতিহাস পড়লে জানা যায় মহাভারতে উল্লেখিত কুলন্ত ভূমিই হল বর্তমানের কুলু। অতীতের ন্যায় কুলু এখনও 'দেবভূমি' বা 'ভ্যালি অফ গডস' নামে পরিচিত। এই এলাকার মানুষেরা আরও মনে করেন কুলন্ত ভূমিতে দেব-দেবীদের অবিরাম যাতায়াত ছিল। বিভিন্ন মুনি-ঋষিরা এখানে এসে বসবাস করতেন। অনেকেই নিজেদের সেই বিশিষ্ট মুনি ঋষিদের বংশধর বলে মনে করেন।

১২ বছর অন্তর অন্তর এই বজ্রপাতের পেছনে একটি পুরনো কাহিনি আছে যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে আপনার। পৌরাণিক কাহিনিতে বলা হয়ে থাকে প্রাচীন কুলন্ত ভূমিতে কুলাত নামক এক রাক্ষসের বসবাস ছিল। সেই রাক্ষস নিজের মৃত্যুর আগে ব্যাস নদীর উপত্যকাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। সেই মতন নিজের শক্তি বলে সে একটি দীর্ঘকায় অজগরের রূপ ধারণ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই নদীতে শুয়ে থাকে। যাতে নদীর জল চলাচল করতে না পেরে আটকে যায় এবং নদীর উপকূলীয় অঞ্চল বন্যায় ভেসে যায়।

ঘটনাচক্রে সেটাই হল, সমস্ত প্রাণীকুল বন্যার কবলে পড়ে আর্তনাদ শুরু করে। সেই সময় দেবাদিদের ধ্যানে ছিলেন। ভক্তদের হাহুতাশভরা আর্তনাদ শুনে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। তিনি কুলাত রাক্ষসের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করলে উপত্যকাটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত, তাই তিনি একটি ছলনার আশ্রয় নেন। মহাদেব প্রথমে কুলাতের বিশ্বাস অর্জন করেন। তারপর নদী বক্ষে শুয়ে থাকা অজগররূপী কুলাতের কানের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, “তোমার লেজে আগুন ধরে গিয়েছে গো অজগর। “শিবের এই কথাটি শুনামাত্রই কুলাত পেছন ফিরে নিজের লেজের দিকে তাকায়। ঠিক তখনই মহাদেব নিজের ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করেন কুলাতের মাথায়। সেই আঘাতে মৃত্যু হয়। আর তার পরেই কুলাতের সেই অজগররূপী দেহ পর্বতে পরিণত হয়।

কুলাতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে মহাদেব নিজের উপরের ক্ষুব্ধ হন। নিজেকে গ্লানিমুক্ত করতে মহাদেব ইন্দ্রদেবকে নির্দেশ দেন তিনি যেন প্রতি ১২ বছর অন্তর এই একই স্থানে তার লিঙ্গরূপী বিগ্রহের ওপর বজ্রপাত করেন। সেই থেকেই আজও ১২ বছর পর পর বিজলি মহাদেব মন্দিরের শিবলিঙ্গ বজ্রপাতের ফলে ভেঙে যায়। কুলুর বাসিন্দাদের প্রবল বিশ্বাস সমস্ত কুলু উপত্যকাটাই কুলাতের শরীর থেকে তৈরি।

পৌরাণিক কাহিনিটি বিশ্বাস করবেন কিনা তা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু বাজ পড়ার বিষয়টি একেবারেই সত্যি। আপনি নিজের চোখে দেখেও আসতে পারেন হিমাচলপ্রদেশের কুলু উপত্যকার এই মন্দিরটি ঘুরে। আর যারা ট্রেকে যান তাদেরও জন্য ভালো গন্তব্য হতে পারে এই মন্দির।

‘বারণাবত’ মৃতদের বাঁচিয়ে তোলার অলৌকিক গ্রাম

রাজকুমারী ঈশ্বরা চন্দ্রগুপ্তের মৃতদেহ নিয়ে এলেন বারণাবতে এই বিশ্বাসে যে চন্দ্রগুপ্ত বেঁচে উঠবেন কারণ এখানকার শিব মন্দিরে এমন কিছু অলৌকিক পাথর আছে, যাতে মৃতদেহকে রেখে বিশেষ পুজো করলে প্রাণ সঞ্চার হয় মৃতদেহে। চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ বেঁচেছিল কিনা তা জানা যায় না কিন্তু তাঁকে নিয়ে যে তাঁর স্ত্রী বারণাবত এসেছিলেন তার প্রমান মেলে এখানকার একটি শিলালিপি থেকে। উত্তরাখণ্ডের বারণাবত এক অদ্ভুত অলৌকিক রহস্যেঘেরা স্থান যার অনেক কার্যকলাপের ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদীরা দিতে পারেন না। হিমালয়ের এক অন্যতম অলৌকিক রহস্যেঘেরা অঞ্চল এই বারণাবত। উত্তরাখণ্ডের এই সফরে একই সঙ্গে সঙ্গী হতে পারে পর্বত, প্রকৃতি এবং পুরাণ।

আসলে উত্তরাখণ্ড জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে নানা কিংবদন্তি আর লৌকিক বিশ্বাসের গল্প। আর এর টানেই আমরা বারে বারে ছুটে যাই হিমালয়ের গড়োবালে। আধ্যাত্মিকতা আর অ্যাডভেঞ্চারের টানে।

কত পৌরাণিক আখ্যান যে জড়িয়ে আছে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর এই পর্বতচূড়ায় তা বলে শেষ করা যাবে না। কথিত আছে, এখানে বসেই ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন আঠারোটি পুরাণ। স্কন্দপুরাণে এই পর্বতের শিখরকে ‘বারণাবত’ বলা হয়েছে।

মহাভারত বলছে, এখানেই হয়েছিল জতুগৃহ কাণ্ড। বিদুরের বুদ্ধির জোরে পাণ্ডবরা এখান থেকেই বেঁচে ফিরেছিলেন। পাণ্ডবদের নদীতে পৌঁছে দেওয়া সেই সুড়ঙ্গের একটা অংশ আজও জীবিত। স্থানীয় গাড়োয়ালিরা যাকে ‘মহাতপা বিল’ বলে পুজো করে। বিশ্বাস করে, আজও ঋষি মহাতপা সূক্ষ্ম দেহে লীন হয়ে আছেন বিলের জলে। ধর্মভীরু হাজার হাজার পাহাড়ি আজও শিখরের শিবমন্দিরে পুজো দিতে আসেন। শিবঠাকুরের এমন দুর্গম দেশে যেতে হলে আপনাকে বেশ শক্তসামর্থ্য হতে হবে। কয়েক কিলোমিটার ‘ট্রেক’ করে এই পাহাড়প্রেমিকরা পৌঁছে যান বারণাবতের শিখরধামে।

হরিদ্বার থেকে যাত্রা শুরু করুন ধনৌলটি থেকে বা সরাসরি হৃষীকেশ হয়ে তেহরি, দোবাটা হয়ে পৌঁছে যান প্রায় ৪,০০০ ফুট উচ্চতার উত্তরকাশী। উত্তরকাশীর প্রাচীন নাম বারণাবত। অনেকের মতে এখানেই নাকি মহাভারতের জতুগৃহ তৈরি হয়েছিল। গঙ্গা ছাড়াও এই শহরের দু’পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বরুণা ও অসি নদী। এখানকার বিশ্বনাথ মন্দির অবশ্যই দ্রষ্টব্য। বিশ্বাস, কিরাতরূপী শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল এখানে।

জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি পথে হাঁটতে মন্দ লাগবে না। মুসৌরির কিছু পর থেকেই যমুনা আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। কিছুটা চলার পরেই পাহাড়ের কোলে অপরূপ জনপদ। নাম, লাখামণ্ডল। যার আর এক নাম মোরাগ্রাম। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা নদী। এই পথে আর একটু গেলেই যমুনোত্রী। যমুনা নদীর উৎস।

বিশালাকার মোরা শিবমন্দির চত্বরে গিয়ে থামুন। শোনা যায় একসময় এখানে অনেক মন্দির ছিল। যার অনেকগুলিই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই এলাকার মাটি খনন করে মহাভারতীয় যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

লাখামণ্ডলের প্রাচীন নাম মোরা। কারণ চন্দ্রগুপ্তের মা’র নাম ছিল মুরা। আর চন্দ্রগুপ্ত তার মায়ের নামেই নিজ রাজবংশের নামকরণ করেন চাণক্যের নির্দেশে। আর সেই সূত্রেই তাঁর রাজবংশের নাম হয় মৌর্য্য। আর মুরার নামে এই মন্দিরের নাম হয় মোরা বা মুরা শিবমন্দির।

বিশাল পরিসর জুড়ে মোরা শিবমন্দির। মন্দিরের বেদিতে বৃহদাকারের শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের সামনে দু’টি মূর্তি। যার একটি মানব ও আর অন্যটি দানব। স্থানীয় বাসিন্দারা আজও মনে করেন, মৃত্যুর পরে মানুষের মৃতদেহকে এই মন্দিরে এনে রাখা হত, মানব ও দানবমূর্তির মধ্যে থাকা একটি বিশেষ শিলার ওপরে। মন্দিরের পূজারি পুজো করার পরে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মৃত শরীরে প্রাণসঞ্চার হত।

মন্দিরের পূজারির থেকে জানা যায় অনেক অজানা ইতিহাস। পূজারি বললেন,

"উত্তরাখণ্ডের বারণাবত অতিপ্রাচীন জনপদ। এই এলাকার মোরা গ্রামে মৃত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে এই আশায় বহু মানুষ আসেন এখানে। সিংহপুরা প্রদেশের রাজকুমারী ঈশ্বরা রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের মৃতদেহ নিয়ে এসেছিলেন এখানে। রাজকুমারের দেহে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছিল কি না, তা আমাদের কারও জানা নেই কিন্তু গ্রামের একটি শিলালিপি থেকে এবিষয়ে জানা যায়। আর রাজকুমারী তাঁর স্বামীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে মোরা গ্রামে স্থাপন করেছিলেন একটি শিবমন্দির। যা আজও একইভাবে রয়েছে। এই অঞ্চলে জাকজমকপূর্ণভাবে শিববন্দনার শুরু, সেই তখন থেকেই।"

পাহাড়ি রাস্তার কিছুটা পথ হাঁটার পরে দেখতে পাবেন একটি বিশালাকার গহ্বর। শোনা যায় জতুগৃহ থেকে প্রাণ বাঁচাতে এই সুড়ঙ্গ পথই ধরেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী। আর একই পথ ধরে মনে বিশ্বাস আর সাহস নিয়ে প্রবেশ করুন সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গ বেশ গভীর। তাতে প্রচুর বাঁক। খুব বেশি দূর অবধি যাওয়া যায় না। তবে এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এখানকার কাঠের বাড়ির গুলির নির্মাণকৌশল চোখ টানে। অপূর্ব সব কাঠের কাজ। কেউ কেউ বলেন এখানকার কাঠখোদাই শিল্পের কারিগররা মহাভারতীয় যুগের। আজও বারণাবতে পাণ্ডবদের জন্য রাজপ্রাসাদ বানানো কারিগরদের বংশধরেরা জীবিত আছেন।

মন্দিরচত্বর ছাড়িয়ে একটু এগোতেই গ্রানাইট পাথরের একটি শিবলিঙ্গ দেখতে পাবেন। গাইডের কথা মতো শিবলিঙ্গে জল ঢালতে বিশেষ বিশেষ দিনে বেশ ভিড় হয়। এই শিবলিঙ্গের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এক অলৌকিক কাহিনি। একশো বছর আগের কথা, কোনো এক ব্যক্তি বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে পান এই শিবলিঙ্গের। এক সাধু পরে একে প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক সাধুর মতে এই শিবলিঙ্গ নাকি জ্ঞানগঞ্জের অলৌকিক শিবলিঙ্গ।

মোরায় তিনরাত কাটাবেন। কথায় আছে, বারণাবতে তিন রাত কাটানো পুণ্যের কাজ। পাপের থেকে মুক্তি এবং দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বারণাবতে তিনটে দিন কাটিয়ে চলুন যমুনোত্রী। তবে চাইলে অন্য পথে হরসিল হয়ে গঙ্গোত্রী ও গোমুখও ঘুরে নিতে পারেন। তারপর বারণাবত থেকে মুসৌরি, ধনৌলটি ঘুরে নিন। সেখান থেকে দেরাদুন কিংবা হরিদ্বার হয়ে ফিরে চলুন। উত্তরকাশী থেকে ট্রেকিং পথে নচিকেতা তাল ও ডোডি তাল যেতে পারেন। এখান থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব প্রায় একশো কিমির কাছাকাছি। গঙ্গোত্রীর পথে কিছুদূর গেলেই পাবেন আপেল বাগান। হরসিলের প্রকৃতি আপনাকে মুগ্ধ করবে। হরসিলের উচ্চতা প্রায় ৮,৫০০ ফুট। পাইন গাছের সবুজে মোড়া এক শান্ত নির্জন জনপদ। এখান থেকে সাততাল লেকটি ঘুরে দেখুন। হরশিল থেকে অসংখ্য ঝর্না পার হয়ে পৌঁছে যান গঙ্গোত্রীতে। গঙ্গামায়ের মন্দিরে পুজো সারুন। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপাবলি পর্যন্ত খোলা থাকে এই মন্দির। সন্ধ্যারতি দেখবেন। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের পথে যেতে পারেন। কঠিন চড়াই উতরাই পথ ধরে গঙ্গার উৎস দর্শন করে নিন। উত্তরকাশী থেকে হনুমানচটি আসতে পারেন। বাস না পেলে আর একটু এগিয়ে ধারাসু বা বারকোট থেকেও হনুমানচটি আসতে পারেন। এখান থেকে হেঁটে, ঘোড়ায় বা ডান্ডিতে যমুনোত্রী ঘুরে নিন।

উত্তরকাশী এক বিচিত্র অনুভূতির জায়গা। যেখানে পুরাণ, ইতিহাস, বাস্তব, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানেই আছে অপ্সরা পর্বত বা পরী পর্বত। পরী-রাজ্য বলেও এর পরিচিতি আছে। এর প্রাচীন নাম মন্দার পর্বত। এখানে নাকি এখনও স্বর্গের অপ্সরারা নেমে আসেন বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। এই অঞ্চলকে ঘিরে রয়েছে কেদার, বদ্রী গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী। এই চারধামের মাঝে মাথা তুলেছে ব্যাস পর্বত। এর গুরুত্ব তাই বুঝতেই পারছেন। এক অলৌকিক শক্তি এই অঞ্চলে কাজ করছে সবসময়।

কত পৌরাণিক আখ্যান যে জড়িয়ে রয়েছে উত্তরকাশীর এই পর্বতচূড়ায় তা বলে শেষ করা যাবে না। কথিত আছে, এখানে বসেই ব্যাসদেব রচনা করেছিলেন আঠারোটি পুরাণ। যুগে যুগে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝাপটা সামলে এখনও সেই ব্যাসগুফার কিছু অংশ

বেঁচে আছে। গুফা থেকে নীচের দিকে ঝুঁকলে চোখে পড়বে মহাভারতের সেই দগ্ধ জতুগৃহের অংশ।

মহাভারতের 'জতুগৃহদাহ'। একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক এই অংশটুকু। পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুর পর কুন্তী তার পাঁচ সন্তানকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। পাণ্ডব ও কৌরবরা দ্রোণাচার্যের কাছে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন করে। গুরু দ্রোণ শিষ্যদের কাছে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তার প্রতারক বন্ধু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করতে বলেন। রাজকুমারদের সঙ্গে যুদ্ধে দ্রুপদ পরাজিত হলে দ্রুপদ দ্রোণকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করতে থাকেন। এই সময় কর্ণ কৌরবদের পরম মিত্রে পরিণত হয়। এদিকে সর্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হলে কৌরবরা ঈর্ষান্বিত হয়, এমনকি 'পুত্রস্নেহে অন্ধ' ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে রাজা হিসেবে দেখতে চান।

কৌরবরা তাদের মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে ও পাণ্ডবদের গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। শকুনির নির্দেশে স্থপতি পুরোচন বারণাবত নামক স্থানে বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ দিয়ে 'জতুগৃহ' নামে এক সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে ও সেখানে পাণ্ডব ও কুন্তীকে ছুটি কাটাবার পরামর্শ দেয়। বিদুর শকুনির ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে পাণ্ডবদের সাবধান করে দেয় ও পালিয়ে যেতে বলেন। এদিকে জতুগৃহে আগুন লাগলে পাণ্ডবরা একটি সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে যান ও হস্তিনাপুরে রটে যায় আগুনে পুড়ে পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে। পাণ্ডবদের মারতে গিয়ে পুড়ে মারা যায় কৌরবদের ভৃত্য পুরন্দর। কৌরবদের চোখে ধুলো দিয়ে বিদুরের তৈরি যে সুড়ঙ্গপথে পাণ্ডবরা পালিয়ে গিয়েছিল তার শ'আটেক মিটার এখনও বর্তমান আছে বারণাবতে। বিশ্বাসীরা তাই বলে থাকেন।

মহাভারতের বারণাবত বা উত্তরকাশী শহরের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে শিখর ধাম। সমুদ্রপৃষ্ঠের হিসাব ধরলে উচ্চতা দাঁড়ায় সাড়ে আট হাজার ফুট। ব্যাস পর্বতে আছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ব্যাসগুফা। শিখরধামের ৯০০ মিটার দূরে ব্যাস পর্বত। এই শিখরধামেই হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুষাণ যুগের স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিল গাড়োয়ালিরা। পুরাণ মতে, এখানেই পাণ্ডবমাতা কুন্তী শিবের দেখা পেয়েছিলেন। সেই শিবমন্দির আজও দেখা যায়। মহাভারতের বারণাবত পর্ব তো বটেই, অনেক পুরাণেই উল্লেখ রয়েছে এই শিবমন্দির, ব্যাসপর্বতের। ব্যাস পর্বতের কাছে মন্দার পর্বত। পুরাণ মানলে, সমুদ্রমন্থনের সময় এই পর্বতকেই 'ডালের কাটা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে জ্বলজ্বল করছে শিখর বারণাবত। যার একদিকে যমুনোত্রী, ভাগীরথী পিক ১, পিক ২, নীলপর্বত। অন্যদিকে, সমুদ্রমন্থনের সেই মন্দার পর্বত! শিখর পর্বতের পাশেই ব্যাসপর্বত, ব্যাসগুহা, ব্যাসকুণ্ড। বাঘ- ভল্লুকের অভয়ারণ্য।

এখানে বসেই পাণ্ডবমাতা কুন্তী শিবের তপস্যা করেছিলেন। কুন্তীর মনোকামনা পূরণ হয়েছিল। মহাদেব এখানে তাই মনোকামেশ্বর রূপে পূজিত। পুরাণের পাতা উলটে সেই উত্তরকাশীর শিখর বারণাবত। এখনও এখানকার মানুষ অনুভব করেন জতুগৃহের সেই লেলিহান আগুন। গলে যাওয়া লাভার চিহ্ন এখনও দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে।

যে গ্রামে আজও লুকিয়ে নরবলি হয়

আমরা এবার যাব সিমলা থেকে সামান্য দূরের একটি গ্রামে। গ্রামটির নাম ধামী গ্রাম। এই গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপুজোর দিনে একে অপরকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার এক অদ্ভুত উৎসব হয়। যে উৎসবের নাম পাথর ছোড়া উৎসব বা 'Stone Throwing Festival'

আপনি শুনে হয়তো একটু অবাক হচ্ছেন। পাথর ছোড়া হচ্ছে। রক্তপাত হচ্ছে। লোকজন আহত হচ্ছে। কিন্তু তাতে লোকজনের কোনো হেলদোল নেই। কারণ হিমালয়ের কোল ঘেঁষা গ্রামটিতে এটাই নাকি দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। এটাই প্রাচীন রীতি। আর শতাব্দীপ্রাচীন এই পাথর ছোঁড়া উৎসবের ব্যতিক্রম হয় না কোনো বছরই।

চলুন এবার যাওয়া যাক হিমাচল প্রদেশের ধামী গ্রামে। যেখনে বছরে একবার হই হই করে সাধারণ মানুষজন মেতে ওঠেপাথর ছোড়া উৎসবে। প্রতিবছর এই পাথর ছোড়া উৎসবের মধ্য দিয়েই জমে ওঠে হিমাচলের কালী পুজো।

সিমলা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ধামী গ্রাম। গাড়ি ভাড়া করে গেলেই সুবিধা। এই 'পাথর ছোঁড়া উৎসব' গ্রামের অতি পুরোনো প্রথা। আর তা নিয়ে নানান মিথ ও গল্প জড়িয়ে আছে।

কালী মন্দিরের পূজারি জানালেন গ্রামের কালী পুজোর বিশেষ রীতিও নাকি এই পাথর ছোড়া উৎসব, আর যদি এই উৎসব না হয় তো দেবী রুষ্ট হন। দেবীর প্রকোপ থেকে তখন বাঁচা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই গ্রামের প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও এই উৎসবে যোগ দেন ও আনন্দে মেতে ওঠেন। প্রথম প্রথম অনেকেই অন্য চোখে দেখেন পরে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যান।

উৎসবের দিন কালীমাতার ভক্তরা দু'দলে ভাগ হয়ে যান। তারপর একে অপরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকেন। এই পাথর ছোড়া কিন্তু হয় একেবারে সিরিয়াসভাবে। আর একে অন্যকে আঘাত দেওয়ার জন্যই ছোড়া হয়। আর এর কেউ একজন যখনই এই পাথরের ঘায়ে আহত হয়ে যান ও তার রক্তপাত শুরু হয় তখনই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেন ভক্তরা।

আহত ভক্তের রক্ত দিয়েই তিলক এঁকে দেওয়া হবে দেবীমূর্তিতে। তারপর শুরু হয় বিশেষ পুজো। উৎসবের দিন প্রায় ১০ থেকে ২০ মিনিট ধরে চলে এই পাথর ছোড়াছুড়ি। কারও আহত হয়ে রক্তপাতের খবর মিললেই পাথর ছোড়ায় ইতি টানা হয়। আর আহতদের ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মহাসমারোহে নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরে। আহতদের মধ্যে হয় প্রথম যিনি আহত হয়েছেন তাঁকে কিংবা সবচেয়ে বেশি যিনি জখম হয়েছেন সেই ব্যক্তিকে প্রথমে কালীমন্দিরে দেবীমা'র সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর কেটে যাওয়া অংশের রক্ত দিয়ে দেবীর ললাটে এঁকে দেওয়া হয় রক্ততিলক। তারপর শুরু হয় বিশেষ পুজো।

ওই ব্যক্তিকে পুজো চলাকালীন অনেক নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়। দেবীর রক্তাভিষেকের জন্য অনেকেই নিজেকে প্রস্তুত রাখেন আহত হওয়ার জন্য। রক্তপাতের জন্য তৈরি থাকেন অনেকেই। তাই আগ্রহী ভক্তদেরকেই এই উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, এই প্রথা শুরু করেছিলেন গ্রামের রাজ পরিবারের সদস্যরা। এখনও রাজ পরিবারের বংশধররাই অংশ নেন এই উৎসবে। তাদের ঠিক করে দেওয়া দু'টি দল পরস্পরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে। তবে দর্শকদের লক্ষ্য করেও অনেক সময় পাথর ছোড়া হয়। স্থানীয়রা তাই কেউ কেউ এই উৎসসবকে 'পাথর কা মেলা' বলে থাকেন।

স্থানীয় গবেষকের কথায়, পাঁচশো থেকে সাতশো বছরের পুরনো এই উৎসব। এখনও কোনো বিধি নিষেধ না মেনেই এই রীতি পালন করা হয়। স্থানীয় এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন নাকি এই গ্রামেরই এক বাসিন্দা। এই গ্রামের মন্দিরে সেযুগে হত নরবলি। আর সে নরবলি বন্ধের জন্য একদিন এক ব্যাগ পাথর নিয়ে এসে পূজারিদের আক্রমণ করে। সবার মাথা ফেটে যায়। কেউ কেউ মারা যায়। মন্দির রক্তে ভেসে যায়। সেই থেকে যারা সেদিন

মারা গেছিলেন তাদের রক্তের ঋণ শোধ করতে মন্দির চত্বরে আয়োজন করা হয় এই খেলার। আবার কেউ কেউ বলেন দেবীর নির্দেশেই ওই ব্যক্তি পূজারির মাথায় ঢিল ছুড়ে মারেন। বলি বন্ধ হল। নিষ্ঠুর বলি প্রথার বিকল্প হিসেবে প্রচলিত হয়ে গেল এই পাথর ছোঁড়া উৎসব। মন্দির প্রাঙ্গণে বেশ জাঁকজমকেই পালিত হয় এই প্রথা। উৎসবকে ঘিরে ভিড়ও হয় দেখার মতো। কালীপুজোর দিন হিমাচলের পাথর কা মেলা' দেখতে দর্শকদের ঢল নামে গ্রামে।

গ্রামের বর্ষীয়ান এক ব্যক্তি অবশ্য জানালেন এক অন্য গল্প। তাঁর মতে, এই উৎসবকে ঘিরে অনেক জনশ্রুতি আছে। তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রচলিত সেটি হল প্রায় পাঁচশো বছর আগে হিমাচলের ধামীতে কালীপুজোয় নরবলি দেওয়া হত। স্থানীয় রাজ পরিবারে নতুন রাজা তাতে আপত্তি জানায়। রাজার হস্তক্ষেপে নরবলি বন্ধ হয়ে যায়।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাজার কাছে জানতে চান তিনি কেন বলি বন্ধ করে দিতে চান। রাজা জানান, রানি মানুষ হত্যার বিপক্ষে। নরবলি কোনোভাবেই মানুষের হিতের জন্য হতে পারে না। এ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য প্রথা। আর এই প্রথা রাজা ও রানি কেউই পছন্দ করতেন না। তাই রাজা ও রানির উদ্যোগে বন্ধ হয়ে যায় নরবলি।

এদিকে সেবছর নরবলি বন্ধ হওয়ায় গ্রামে দেখা দিল অন্ন সংকট। গ্রামের পুরোহিতরা দলবেঁধে গেলেন রাজার কাছে। রাজাকে বোঝালেন ও বললেন, "রাজন নরবলি বন্ধ হয়েছে কিন্তু দেবীর অভিষেক তো রক্ত ছাড়া হবে না। আর দেবী রক্ত না পেলে তুষ্ট হবেন না। উলটে রুষ্ট হবেন। গ্রামে নেমে আসবে ঘোর বিপদ তখন কী হবে। দেবীকে যেভাবে হোক রক্ত তো দিতেই হবে। আর রক্ত দিয়ে দেবীকে পুজো করার যে সনাতন রীতি রয়েছে তার কী হবে?"

তখনই এক পুরোহিত পাথর ছুঁড়লেন মন্দিরের পুরোহিতের দিকে। পুরোহিতে মাথায় পাথর লাগলো। রক্ত কপাল থেকে গাল বেয়ে পড়তে শুরু করল। তারপর পুরোহিত ও রাজা মিলে দেবীর রক্তাভিষের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে চালু করলেন পাথর ছোড়া উৎসব। 'Stone Pelting' বা পরস্পরের দিকে পাথর ছোঁড়ার রেওয়াজ। পাথরের আঘাতে কেউ না কেউ আহত হবেন আর তার রক্তেই হবে দেবীর পুজো।

আবার অন্য রকম মতও রয়েছে। শোনা যায়, হিমাচলের দু'টি গ্রাম হ্যালগ ও জ্যামগের দুই রাজ পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির হয়। কিন্তু, নানা কারণে সেই বিয়ে ভেঙে যায়। জ্যামগের রাজকুমারকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে গ্রামেরই কিছু বাসিন্দা। সেই দুঃখেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন তাঁর বাগদত্তা হ্যালগের রাজকুমারী। তাঁকে 'সতী' মনে করেই দুই গ্রামের গ্রামবাসীরা একে অপরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে সেই ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করেন। সেই থেকেই নাকি এই উৎসবের সূচনা।

স্থানীয় এক লোকগবেষক অবশ্য জানিয়েছেন এক মারাত্মক কথা। তাঁর কথায়, "হিমাচলের ধামীতে কালীপুজোয় নরবলি দেওয়া হত। রাজপরিবারের বংশধরদের মধ্যে বলি দেওয়া নিয়ে বিরোধ বাধে। রাজপরিবারের এক ছেলেকে বলি দেওয়া নিয়ে দুপরিবারে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। তারপর বন্ধ হয়। তবে আজও তন্ত্রমতে সেই প্রাচীন মন্দিরে নরবলি দেওয়া হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও বিষয়টি সত্যি। বলির পরেই দেহটি পাহাড় থেকে বস্তাবন্দী করে খাদে ফেলে দেওয়া হয় কিংবা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পাথর ছোড়া উৎসবের রক্তের সঙ্গে নরবলির রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।"

‘সিমসা মাতা’ আজও স্বপ্ন দেন সন্তানহীনাদের

হিমালয় জুড়ে অজস্র মিথ, অজস্র জানা অজানা গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। সেরকমই এক মিথ জড়িয়ে আছে হিমাচলের সিমসা মাতার মন্দিরকে নিয়ে। যে মন্দিরে গেলে নাকি দৈব কৃপায় সন্তান লাভ করেন নিঃসন্তান মহিলারা। আর সেকারণে হিমাচলেরই নয় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিঃসন্তান মহিলারা এই মন্দিরে আসেন পুজো দিতে।

এখন প্রশ্ন এই মন্দিরে এসে পুজো দিলেই কি রাতারাতি সন্তান লাভ করেন কেউ? অবশ্যই না। কারণ সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা এবং সে সম্পর্কিত বেশ কিছু নিয়ম আছে এই মন্দিরে যেগুলি মেনে চললে কিংবা দেবীর ইঙ্গিত পেলে এই অসাধ্য সাধন হতে পারে।

এখন এই মন্দিরের বিচিত্র অলৌকিক কর্মকাণ্ড জানতে হলে আমাদের যেতে হবে হিমাচলের মাণ্ডি উপত্যকায়।

হিমাচল প্রদেশের মন্ডি জেলার অন্তর্গত লাড়াভাদোতে আছে সিমসা মাতার মন্দির। এই মন্দিরটি যেখানে অবস্থিত সেই জায়গার পরিবেশ অসাধারণ। হিমাচলই নয়, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্য পঞ্জাব, হরিয়ানা এমনকি চণ্ডীগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে প্রচুর নিঃসন্তান মহিলা আসেন এই মন্দিরে পুজো দিতে। এই মন্দির সারা হিমাচল জুড়ে প্রসিদ্ধ সন্তানদাত্রী মন্দির হিসেবে। কারণ মানুষের বিশ্বাস, এই মন্দিরে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে থাকলেই নাকি দেবীর কৃপায় সন্তান লাভ করেন নিঃসন্তান মহিলারা।

মন্দিরটি অত্যন্ত সাদামাঠা। কিন্তু সিমসা মাতার প্রভাব দেখতে হলে মন্দির দর্শনে যান বিশেষ বিশেষ তিথিতে। মন্দিরে তখন তিলধারণের জায়গা থাকে না।

সত্যিই কি এই মন্দিরে গেলে সন্তানহীন নারীরা সন্তান লাভ করেন? আর কীভাবে কার্যকর হয় এই দেবীর কৃপা? যে-কোনো সন্তানহীনা মহিলা গিয়ে মানত করলেই কি তার সন্তান হয়? এমন হাজারো প্রশ্নের রহস্য লুকিয়ে আছে এই মন্দিরের অভ্যন্তরে।

নবরাত্রির সময়ে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে পালিত হয় বিশেষ উৎসব। এলাকায় উৎসবটি পরিচিত ‘সলিন্দরা’ উৎসব নামে। স্থানীয় ভাষায় ‘সলিন্দরা’ শব্দের অর্থ স্বপ্ন পাওয়া। এই উৎসবের সময়েই নিঃসন্তান দম্পতিরা আসেন এই মন্দিরে।

মন্দিরের কিছু বিশেষ রীতি রেওয়াজ সম্বন্ধে এবার জেনে নেওয়া যাক। সলিন্দরা’ উৎসব চলাকালীন মন্দিরে শুধুমাত্র সন্তানাকাঙ্ক্ষী মহিলারা প্রবেশ করেন। মন্দিরে পুরুষ প্রবেশ তখন পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। সন্তানাকাঙ্ক্ষী মহিলাদের প্রত্যেককে একটি করে শতরঞ্চি দেওয়া হয়। তারপর তাদের মন্দির চত্বরে শতরঞ্চি পেতে শুয়ে থাকতে বলা হয়। পুজো শেষে দিনরাত তারা সেখানে শুয়ে থাকেন।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাদের জানান, দু’-এক রাত্রি শুয়ে থাকার পরেই দেবী মহিলাদের স্বপ্ন দেবেন। তাদের দেবীর স্বপ্নাদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মহিলারা অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে স্বপ্নের মাধ্যমে দেবী সিমসা মাতা তাদের আশীর্বাদ করেন। সিমসা মাতার আশীর্বাদ পেয়ে তারা বাড়ি ফিরে যান। আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরে স্বপ্নপ্রাপ্ত মহিলাদের গর্ভসঞ্চার হয়।

এ বড়োই আশ্চর্যের। আর এর কোথাও কোনো ব্যাখ্যা নেই। অনেক বিজ্ঞানী, গবেষক থেকে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা বিভিন্নভাবে এই মন্দিরকে চুলচেরা নিরীক্ষণ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই কিছু জানাতে পারেননি। কারও কাছে এবিষয়ে কোনো সদুত্তর নেই।

অবশ্য এই মন্দিরে শুলেই যে দেবীর আশীর্বাদসূচক স্বপ্নদর্শন সম্ভব হবে, তা কিন্তু একেবারেই নয়। এমনকি স্বপ্ন দেখলেই যে সন্তানলাভ হবে, এমনটাও নয়।

বলা হয়, দেবী যে স্বপ্ন দেন, তা হয় প্রতীকী ইঙ্গিতবাহী। সেই প্রতীকের অর্থোদ্ধার করতে পারলেই জানা সম্ভব, কোনো মহিলা সন্তান লাভ করবেন কিনা। এমনকি আসন্ন সন্তানটি ছেলে হবে নাকি মেয়ে- তাও নাকি জেনে ফেলা সম্ভব।

কী রকম সেই ইঙ্গিত? বলা হয়, কোনো মহিলা যদি স্বপ্নে আম দেখেন, তা হলে তার পুত্রসন্তান হবে। আবার কোনো মহিলা যদি স্বপ্নে দেখেন ঢ্যাড়শ, তা হলে তিনি কন্যাসন্তানের

জননী হবেন। আর যদি স্বপ্নে কোনো পাথর, ধাতু বা কাঠের টুকরো কিংবা এই সমস্ত উপাদানে তৈরি কোনো জিনিসের দর্শন মেলে, তা হলে সেই মহিলাকে সারা জীবন নিঃসন্তানই থাকতে হবে। তাঁর সন্তান হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই বিষয়গুলির কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই কিন্তু যাদের সন্তান হয়েছে তাঁদের কীভাবে সন্তান হল, তার কোনো উত্তর কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কারও কাছেই নেই।

তবে এই নিঃসন্তানদের সন্তান হওয়ায় আলোচনা বা সমালচনার শেষ নেই, তা বলাই বাহুল্য। ভক্তেরা ব্যাখ্যার ধার ধারেন না। তাদের বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। নবরাত্রিতে গেলে আপনি মন্দির চত্বরে যেমন দেখতে পাবেন পাঞ্জাব থেকে আসা মহিলাকে তেমনি দেখবেন রাজস্থানী, গুজরাটী মহিলাদেরও। মন্দিরে শিখ মহিলা যেমন বিশ্বাসের সঙ্গে আসেন তেমনি আসেন গাড়োয়ালী মহিলারাও। কারও সন্তান নেই বলে যেমন মানত করতে আসেন কিছু মহিলা, তেমনি কেউ আসেন সন্তানহীন ননদকে, মেয়েকে, ভাবিকে নিয়ে। কেউ কেউ মন্দির চত্বরে জোর দিয়ে গর্বের সঙ্গে বলে, "দু-বছর আগে এই মন্দিরে শুয়েই আমার ছেলে হয়। এ বার তাই নিয়ে এসেছি আমার ননদকে।"

সিমসা মাতা মন্দিরে বিস্ময়ের সামগ্রী আরও রয়েছে। মন্দিরের পাশেই দেখা মেলে একটি বিশালাকার পাথরের। বলা হয়, এই পাথরটিকে দু'হাতে প্রাণপণ ঠেলে একচুল নড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু ডান হাতের কড়ে আঙুলের সাহায্যে সামান্য ঠেললেই নাকি হেলে যায় পাথরটি। স্থানীয়রা তাই পাথরটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করেন। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

সিমসা মাতার কাছে পুজো দিতে কিংবা শতরঞ্চি পেতে মন্দিরে দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়ার জন্য থাকার বিষয়টি যেমন রহস্যজনক তেমনি এই পদ্ধতির পরেই কোনো মহিলা সম্ভাবসম্ভবা হলেই মনে মনে আপনার মাথায় এই প্রশ্নটাই বারেবারে ঘুরতে থাকবে... তাহলে কি সত্যিই দেবীর কৃপা নাকি শুধুই বিশ্বাস? কোনটা ঠিক তা আজও কারও জানা নেই... ভারতের সনাতন দর্শন চিরকাল একথাই বলে এসেছে যে আপনাকে সব কিছু মানতে হবে বিশ্বাস করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। বিশ্বাসের শক্তি অনেক বড়ো তা অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করে। সন্তানহীনের কোলে তুলে দেয় সন্তান।

হিমালয়ের অদ্ভুত ‘চুম্বক পাহাড়’

লাদাখের লেহ থেকে কারগিলের দিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার গেলেই দেখা মিলবে এই রহস্যময় পাহাড়ের। কারগিলে যাওয়ার সড়কেই এই চুম্বক পাহাড়। এই পাহাড়ের আশ্চর্য এক গুণ হচ্ছে, কেউ যদি এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখেন, তারপরও সেই বন্ধ গাড়ি না থেমে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন ২০ কিলোমিটার গতিতে গাড়িকে টেনে নিয়ে যায়।

কাশ্মীর বা হিমাচলের মত লাদাখের পাহাড়ে কিন্তু সেরকম সবুজের আভাস দেখা যায় না। এখানে সেরকম বৃষ্টিপাত না হওয়ার ফলে গাছপালার সংখ্যা আশ্চর্যজনক ভাবে কম। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মরুভূমির কিছুটা মিল আছে। আর সেখানে এক পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো করে লেখা আছে ম্যাগনেটিক হিল। এটাই কি সেই ম্যাগনেটিক হিল যা শাহরুখ খানের ‘জব তক হ্যায় জান’ সিনেমায় দেখা গেছিল?

এই পথে যাওয়ার সময় ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে স্টিয়ারিং ধরে, ব্রেক থেকে পা সরাতেই দেখবেন অদ্ভুতভাবে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। প্রথমে মনে হবে ডাউন হিল তাই গাড়ি নেমে যাচ্ছে। কিন্তু না, একটু পরে আপ হিলেও দেখবেন গাড়ি আগের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। অবাক বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে থাকবেন আর ভাববেন এটা কীভাবে সম্ভব? যে কেউই আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে যায় এপথে এলে।

এই পাহাড়ের সামনে কোনো যান-বাহনের গাড়ির পেট্রোল খরচ করতে হয় না ম্যাগনেটিক হিলের সামনে চিহ্নিত করা আছে এই বিশেষ পয়েন্টেকে। যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে যে কোনো যানবাহন চুম্বক শক্তির আকর্ষণে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, বা ওই পাহাড়ের বিশেষ কোন শক্তি যে কোন বাহনকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোনটা যে সঠিক তা আজও কেউ জানে না।

লাদাখের এই পাহাড়কে চুম্বক পাহাড়’ বলে ডাকা হয়। এই পাহাড়ের চূড়ার দিকে যে সড়ক সেটা ধরে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে যদি কেউ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দেন এবং গিয়ারকে নিউট্রাল পজিশনে রাখেন, তবে দেখা যাবে সেই গাড়ি খাড়া রাস্তা বেয়ে নিজে নিজেই চলতে শুরু করেছে অদ্ভূতভাবে এবং তার গতি নেহাত মন্দ নয়। ২০ থেজে ২২ কিলোমিটার প্রতিঘণ্টা বেগে সেই গাড়ি এগিয়ে যাবে। এই মজার কারণে ‘ম্যাগনেটিক হিল’ আজ জনপ্রিয় পর্যটনক্ষেত্র।

চুম্বক পাহাড় কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, “এধরনের পাহাড়ের অস্তিত্ব নেই। ওই এলাকায় যা ঘটে, তা একেবারেই দৃষ্টিভ্রম। ওই স্থানটিতে পাহাড়, রাস্তা ইত্যাদি এমন ভাবে অবস্থিত যে, এলাকাটিকে খাড়াই বলে মনে হয়। আসলে রাস্তাটি সমান্য উৎরাই-যুক্ত। সেই ঢালু পথ বেয়েই নিউট্রাল গিয়ারে থাকা গাড়িটি গড়াতে থাকে। দৃষ্টিবিভ্রমে মনে হয়, তা খাড়াই বেয়ে উপরে উঠছে।”

এই চুম্বক পাহাড় নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নানা গল্পকথা চালু রয়েছে। কেউ কেউ এসব ঘটনার মধ্যে ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব আছে বলে মনে করে থাকেন। লেহ থেকে কারগিলের সড়ক পথে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা এড়াতে লাদাখ প্রশাসন ওই সড়কটির দুই প্রান্তে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড বসিয়েছে।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, ডাউন হিলে চলার পথে হয়তো গ্র্যাভেটির কারণে গাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু না, আপ হিলেও গাড়ি যেহেতু আপনা আপনি সমানভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলে তাই আশ্চর্য হতেই হয়।

পর্যটকরা এই পথে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করলেও বিমান উড়ে যাওয়ার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এই অঞ্চল দিয়ে উড়ে যাবার সময় পাইলটরা খুব বেশি কড়া নজর রাখেন যাতে করে তাদের বিমানের গতিপথ ভুল না হয়ে যায়।

স্থানীয়দের মাঝে এই পাহাড়টিকে ঘিরে বিভিন্ন মিথ প্রচলিত আছে। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন এখানে কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে যা এই ঘটনা ঘটায়।

তবে, আরও অবাক করা ব্যাপার হল এই ম্যাগনেটিক হিলের এই চৌম্বকীয় আকর্ষণ শুধু যে লোহার বস্তুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়, অন্যান্য যে-কোনো বস্তুর ক্ষেত্রেই এই আকর্ষণ সমানভাবে কাজ করে। এই সড়কের ধারে বা এই অঞ্চলের যে-কোনো জায়গার কিছুটা উঁচু স্থানে দাঁড়ালে তীক্ষ্ণ রকমের এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

অনেকেই এই শব্দকে ভৌতিক কোনো কিছু মনে করে। পরে বিজ্ঞানীরা জানান, পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে এমন গ্র্যাভিটি হিল আছে সেখানেই এই শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উৎপাদিত হয়। এছাড়াও এই ম্যাগনেটিক হিলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জলেও গ্র্যাভিটির সূত্র ধরে ভিন্ন দিকে বয়ে চলার চেষ্টা করে।

স্থানীয়রা ছাড়া বাহিরের মানুষজন অনেক পরে এই ম্যাগনেটিক পাহাড় সম্পর্কে জানতে পারে। তৎকালীন সময়ে কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলের চৌম্বকীয় আকর্ষণের ব্যাপার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করার প্রয়োজন মনে না করার ফলে এখানে বেশ কিছু মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

পরবর্তীতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কার্গিল যুদ্ধ হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলের সার্বিক চেহারার বেশ পরিবর্তন হয়। বর্তমানে লাদাখ কর্তৃপক্ষ এই সড়কটির দুই প্রান্তেই সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়ার পর থেকে এখানে দুর্ঘটনা কমে যায়।

এখানকার ভৌগোলিক প্রকৃতি একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ এমনভাবে তৈরি করে যে পার্বত্য রাস্তায় যে গাড়ির নীচে যাওয়ার কথা, চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে তাকে উপরে টেনে নেয়। এই নিয়ে অবশ্য অনেক মতভেদ ও আছে, কারওর মতে এটি হল দেখার ভুল – Optical Illusion.

এর কাছেই পাথর সাহিব, সেটি গুরু নানকের স্মৃতি বিজড়িত একটি সুন্দর গুরুদ্বোয়ারা আছে। গুরু নানক তিব্বত ভ্রমণ করে ফেরার পথে এই গুরুদ্বোয়ারাতেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

তথ্যঋণ

1. Srishivmahapuran- Gitapress.
2. The Mount Everest Recon- Eric Shipton
3. Annapurna: The First Ascent- Maurice Herzog
4. Blank On The Map- Eric Shipton
5. Nanda Devi- Eric Shipton-Tilman
6. White Spider- Heinrich Harrer
7. Seven Years In Tibet- Heinrich Harrer
8. I Chose To Climb- Chris Bonington
9. Everest The Hard Way- Chris Bonington
10. Everest: The Unclimbed Ridge- Chris Bonington
11. Touching the void- Joe Simpson
12. Throne room of the Mountain Gods – Galen Rowell
13. K2: Triumph & Tragedy- Jim Curran
14. Paths of Glory-Jeffrey Archer
15. Into Thin Air-Jon Krakauer
16. The Climb- Anatoli Boukreev
17. Last Hours On Everest- Graham Hoyland
18. Into The Silence- Wade Davis
19. Shining Mountain- Peter Boardman
20. Lost Horizon by James Hilton
21. The Confessions of Aleister Crowley
22. Tales of the Dervishes by Idries Shah
23. Everest: Kangshung Face by Stephen Venables
24. Lost in the Himalayas by James Scott
25. Nanda Devi by Hugh Thompson
26. Plant Hunting on the Edge of the World by F Kingdon-Ward
27. Red Shambhala by Andrei Znamenski
28. Himalaya by Michael Palin
29. The Ancient Traveler: Writings on Love by Swami Rama
30. The Himalayan Master and the Sixth Sense by Priyabhishek Sharma
31. The Himalaya Club and Other Entertainments From the Raj by John Lang
32. From Heaven Lake: Travels Through Sinkiang and Tibet by Vikram Seth
33. Walking the Himalayas by Levison Wood
34. My Quest for the Yeti: Confronting the Himalayas' Deepest Mystery by Reinhold Messner
35. The Wildest Dream: Conquest of Everest By Mark Mackenzie
36. Black Narcissus by Rumer Godden
37. Apprenticed to a Himalayan Master: A Yogi's Autobiography- Sri M
38. Tibet on Fire by Tsering Woeser

39. The High Road to China by Kate Teltscher
40. Coronation Everest by Jan Morris
41. The High Road to China by Kate Teltscher
42. Coronation Everest by Jan Morris
43. The Wayward Daughter by Shradha Ghale
44. A Rage for Rock Gardening by Nicola Shulman
45. Kathmandu by Thomas Bell
46. Thamel by Rabi Thapa
47. The King's Harvest by Chetan Raj Shrestha
48. The Waiting Land by Dervla Murphy
49. The Lotus Sutra by Tsugunari Kubo and Akira Yuyama (traslators)
50. Introduction to the History of Indian Buddhism by Eugène Burnouf
51. Bones, Stones, and Buddhist Monks by Gregory Schopen
52. Words of My Perfect Teacher by Patrul Rinpoche
53. Monkey King: Journey to the West Wu Cheng'en and Julia Lovell (translator)
54. The Holy Himalayas- Shantha N. Nair,
55. Creation and Completion: Essential Points of Tantric Meditation – Jamgon Kongtrul
56. The Buddgist Religion: A Historical introduction- Richard H. Robinson
57. Autobiography of a yogi- Paramhasha Yogananda
58. Yogirajadhiraj Swami Vishuddhananda Paramhanshadeva his life and philosophy- Nanda Lal Gupta
59. Tibbetan yoga and secret doctrine-W.Y.Evans Wentz
60. The mystic yoga of Tibbet and the surreal Gayanganj- Srimat Shankar Swami
61. Yeti: The Ecology of a Mystery-Daniel C. Taylor
62. Himalaya: A Human History, by Ed Douglas
63. Wild Himalaya: A Natural History of theGreatest Mountain Range on Earth, by Stephen Alter.
64. Into the Heart of the Himalayas. by Jono Lineen
65. Wild Himalaya- A Natural History of the Greatest Mountain Range on Earth- Stephen Alter
66. The Sarasvati Civilisation – Maj. Gen. G.D. Bakshi
67. জ্ঞানগঞ্জ গোপীনাথ কবিরাজ
68. তিব্বতের রহস্যময় যোগ ও অলৌকিক জ্ঞানগঞ্জ —শ্রী মৎ শঙ্কর স্বামী

News paper & Magazines with Archive: আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়। ABP group, The times group, The Times of India, Indian Express, The Hindu, The Teligraph, India Today, Asianet News, Decan Herald, National Geographic magazine, Huffpost, New York Times

২০১৩ সালে কেদার বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন লেখক। ‘কেদার থেকে বেঁচে’ ফেরার পর দ্বিতীয় জীবনে লেখকের লক্ষ্য ছিল হিমালয় ও শিবের এক নিরন্তর অনুসন্ধান। লেখকের উপলব্ধিতে শিব মানে ধ্যানমগ্ন হিমালয়।

হিমালয় আজও ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান। এক অনন্ত বিশ্বাসের প্রতীক। আর এক অদ্ভুত রহস্যের হাতছানি। হিমালয় এক অনন্ত রহস্য যার খোঁজও অনন্ত অসীম।